শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

ফিকহি মাকালাত

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

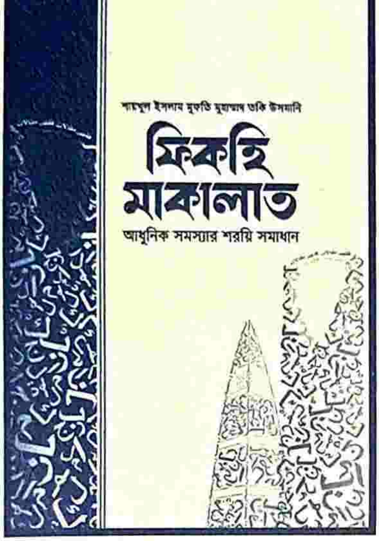

গ্রন্থ সম্পর্কে

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। আধুনিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে তার রচনা-বক্তৃতা পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ বিতরণ করছে। 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের সেসব রচনার সংকলন-সমষ্টি। এসব রচনার অধিকাংশ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, ফলে মুদ্রাব্যবস্থা, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পবিত্রতা অর্জন, কাজা নামাজ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, মাতৃদুগ্ধ পান, আমদানি-রপ্তানি, মুদারাবা, জাকাত, জিহাদ, ভোট-নির্বাচন, পশু জবাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, মানব-অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

২

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-২

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

ভাষা সম্পাদনা : আহমাদ গালিব

বিষয় সম্পাদনা : মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান

বানান ও ভাষারীতি : মাকতাবাতুল ইসলাম

সম্পাদক মণ্ডলী

১. মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান। ২. মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ। ৩. মুফতি রাওয়াহা। ৪. মুফতি সাইফ আকরামি। ৫. মাওলানা আহমাদ গালিব। ৬. মাওলানা ফরিদ মাসউদ। ৭. মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুজাহিদ। ৮. মাওলানা হাসান আহমাদ।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

২

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

MAKTABATUL ISLAM

মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-২

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি
তরজমা : মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ
সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দিন ইবনু আশ-শায়খ মুহিউদ্দিন আহমাদ

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ইসলাম

মূল্য : BD ৳ ৬২০, US $ 13, UK £ 9

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৬১৫, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

ISBN : 978-984-91049-1-9
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatul-islam.com

FIQHI MAKALAT 2.ND
Writer : Shaikhul Islam Mufti Mohammad Taqi Osmani
Translatet by : Mufti Abdul Qayyum Shakh

একমাত্র পরিবেশক : অর্পণ প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com, wafilife.com, boibiswa.com

উৎসর্গ

পরপারে চলে-যাওয়া আমার নানুজানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়! হে আল্লাহ! তার পুরো জীবনের ইবাদত ও বন্দেগিগুলো কবুল করে তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

—অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

কুরআন, হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রের আলোকে আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে চলেছেন শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)। ফিকহি মাকালাত তারই অন্যতম কীর্তি! ছয় খণ্ডের এ গ্রন্থটি উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি ইলমি পাঠাগারে স্থান করে নিয়েছে এবং মুফতি, আলেম ও তালিবে ইলমদের উৎকৃষ্ট পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর দেওয়া তাওফিকে অধম এর দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছি। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাচ্ছে ভেবে আনন্দ অনুভব করছি এবং মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মানুষের স্বভাবজাত একটি দুর্বলতা হলো আজ লিখে কাল নিরীক্ষণ করলেও ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে। সুতরাং দীর্ঘ পাঁচ বছর পর যখন পুনর্বার নিরীক্ষণ করেছি তখন অবশ্য পরিবর্তনীয় বেশ কিছু ভুল নজরে এসেছে এবং সংশোধন করা হয়েছে। এতে বইটির মান আগের চেয়ে যেমন উন্নত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অধিকতর সহজবোধ্যও হয়েছে। পাঠক বইটি পাঠ করে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাবেন এবং উদ্ভূত সমস্যার শরয়ি সমাধান পেতে তার সামনে একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাকতাবাতুল ইসলামের স্বত্বাধিকারী মাওলানা আহমাদ গালিব ভাই-এর প্রতি। তিনি দায়িত্ব না দিলে হয়তো আমি কখনো এ গ্রন্থটি তরজমা করার কল্পনাও করতাম না। মহান আল্লাহ তার সকল দীনি খেদমত কবুল করুন ও উত্তম বিনিময় দান করুন এবং গ্রন্থটিকে মূলের মতোই উপকারী করুন!

—আবদুল কাইয়ুম শেখ

১২-১১-২০২০ খ্রি.

সংকলকের আরজ

মহান আল্লাহ শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-কে দীন ও ইলমের প্রতিটি ময়দানে—বিশেষত, ফিকহশাস্ত্রের ময়দানে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ফিকহশাস্ত্রের যে-কোনো সূক্ষ্ম বিষয়েই কলম ধরেছেন—আলহামদুলিল্লাহ—সে বিষয়েই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সুন্দর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি যেসব ফিকহি মাকালা (ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কিত প্রবন্ধ) রচনা করেছেন সেগুলোর সিংহভাগই আরবি ভাষায় ছিলো। এ কারণে 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থে কেবল সেসব প্রবন্ধই সন্নিবেশিত হয়েছিলো যেগুলো মূলত আরবি ভাষায় প্রণীত হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে অধম সেগুলোর উর্দু অনুবাদ করেছি।

কিন্তু 'ফিকহি মাকালাত' প্রথম খণ্ড যখন আলেমদের কাছে পৌঁছলো তখন তাদের কেউ কেউ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর সেসব ফিকহি বিষয় যেগুলো তিনি নিজে নিত্য-নতুন আধুনিক সমস্যার সমাধানে উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলোও যদি এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করা হয়, তাহলে এই মূল্যবান ইলমি ধন-ভাণ্ডার থেকে উপকার লাভ করা সহজ হবে। তাদের এ পরামর্শের প্রেক্ষিতে

অধম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর উর্দু ভাষায় রচিত প্রবন্ধসমূহের অনুসন্ধান শুরু করি এবং কিছু প্রবন্ধ সংকলন করার মাধ্যমে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করি। সেসব প্রবন্ধের সমষ্টিকেই 'ফিকহি মাকালাত' দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে আজ আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে!

অবশ্য এ খণ্ডে এমন দুটি প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলো লেখক আরবি ভাষায় রচনা করেছিলেন। আমি সেই দুটি প্রবন্ধের উর্দু অনুবাদ করে দিয়েছি। দুটি প্রবন্ধের নাম হলো—

১. ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়;
২. হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি।

মহান আল্লাহ গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে এর মাধ্যমে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন!

—আবদুল্লাহ মায়মান
দারুল উলুম করাচি
১৯ রমজান, ১৪১৭ হি.

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচি

প্রচলিত মোজার ওপর মাসেহ্ করার শরয়ি বিধান-১৯

এক রোকন বিলম্বিত করার পরিমাণ কতটুকু যার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?-৩৭

রমজানে জামাতের সাথে নফল নামাজ আদায়-৪৭

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান-৭৩

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান-৯৭

ইসলামে খুলা তালাকের বাস্তবতা-১৩৯

ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-১৮৯

হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি-২০৯

সুদমুক্ত কাউন্টার-পিএলএস অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা-২৩৩

ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান-২৫১

নির্বাচন ও ভোটের শরয়ি অবস্থান-২৬৫

মামলার শুনানিকাল আইনের শরয়ি অবস্থান-২৮১

কাক খাওয়া জায়েজ-নাজায়েজের ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন-২৮৯

বিস্তারিত সূচি

প্রচলিত মোজার ওপর মাসেহ্ করার শরয়ি বিধান ২১

এক রোকন বিলম্বিত করার পরিমাণ কতটুকু
যার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়? ৩৯
মুফতি তকি উসমানি-এর অনুসন্ধানী উত্তর ৪০
ফতোয়াটিকে যারা সঠিক বলেছেন ৪৬

রমজানে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় ৪৯
মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর উত্তর ৫০
মাওলানা মুফতি শফি রহ.-এর পক্ষ থেকে পত্রের জবাব ৫৪
মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর উত্তর ৫৪
কিয়ামে রামাদান বলতে যা বুঝায় ৬৩
একটি বিনীত নিবেদন ৭২
মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান মুফতি শফি রহ.-এর সত্যায়ন ৭২
প্রথম অনুচ্ছেদ ৭৫

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
থেকে জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান ৭৫
জাকাতের নিসাব ৭৭
এক বছর অতিবাহিত হওয়া ৭৮
ঋণের মাসআলা ৭৯
দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদ ৮১
জাকাত আদায়ের নিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা ৮৭
ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ঋণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ ৮৮

সতর্কতামূলক পদ্ধতি ৮৮
সুদি অ্যাকাউন্ট ও জাকাত ৮৯
নাবালেগ শিশুর জাকাত ৯০
ত্যাজ্য সম্পদ ৯০
কোম্পানি এবং শেয়ার ৯১
নগদ অর্থে উশর আদায় ৯১
উৎপন্ন ফসলাদির এক চতুর্থাংশ উশর থেকে বাদ দেওয়া ৯২
জাকাত আদায়ের তারিখ ৯২
মূল্যবান পাথর ও মৎস্য সম্পদের জাকাত ৯৩
জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ ৯৩
প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ ৯৩
যারা এ মাসআলা সত্যায়ন করেছেন ৯৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ৯৮

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের জাকাত উসুল করার ৯৮

শরয়ি বিধান ৯৮
দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদ ১০৩
ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ঋণ হওয়ার মাসআলা ১২০

জাকাতে নিয়তের মাসআলা ১৩৪
এই মাসআলা যারা সত্যায়ন করেছেন ১৩৭

ইসলামে খুলা তালাকের বাস্তবতা ১৪১
আলোচ্য মাসআলার বিশদ বিবরণ ১৪৫
নারী পুরুষের সমান অধিকার ১৪৭
খুলা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ১৫০
আয়াতের বর্ণনাপ্রসঙ্গ ১৫৩

খুলা বিয়ে-বিচ্ছেদ না তালাক ১৫৮
জামিলা রা.-এর ঘটনা ১৭০
উমর রা.-এর বর্ণনা ১৭৩
প্রামাণ্য দলিলসমূহ ১৭৭
ফকিহগণের অভিমত ১৮০
খুলা শব্দের ফিকহি মর্ম ১৮৪
কাজি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো ১৮৬

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ১৯১
প্রথমত : ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে লেনদেনের কাঠামো ও পরিচয় ১৯১
দ্বিতীয়ত : এ সকল চুক্তির প্রয়োগ-পদ্ধতির বিবরণ ১৯৩
তৃতীয়ত : ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার শরয়ি বিধান ১৯৮

হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি ২১১
بيع مؤجل বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় ২১৪
شركت متناقصة বা ক্রম হ্রাসমান শরিকানা লেনদেন ২১৯

সুদমুক্ত কাউন্টার — পিএলএস অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা ২৩৫

ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান ২৫৩
কয়েকটি সন্দেহের অবসান ২৫৬
মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর জবাব ২৬০

নির্বাচন ও ভোটের শরয়ি অবস্থান ২৬৬
শরয়ি দৃষ্টিকোণে ভোট দেওয়া জরুরি ২৬৬
ভোট না দেওয়া হারাম ২৬৮

নির্বাচন কেবল ইহলৌকিক বিষয় নয় ২৬৯
অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া মারাত্মক গুনাহ ২৭১
নির্বাচনী কার্যক্রমে বর্জনীয় দশটি বিষয় ২৭৩

মামলার শুনানিকাল আইনের শরয়ি অবস্থান ২৮৩
মুফতি তকি উসমানি-এর জবাবি পত্র ২৮৪

কাক খাওয়া জায়েজ-নাজায়েজের ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন ২৯১
উল্লিখিত ফতোয়াটি যারা সত্যায়ন করেছেন ২৯৭
উল্লিখিত মাসআলার প্রমাণে আরও কিছু উদ্ধৃতি ২৯৮
মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর জবাব ২৯৯
প্রথম ভূমিকা ৩০১
দ্বিতীয় ভূমিকা ৩০৩
তৃতীয় ভূমিকা ৩০৪
আল্লামা কাসানি রহ.-এর অভিমত ৩০৮
শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ.-এর অভিমত ৩০৮
ফতোওয়ায়ে আলমগিরির বিবরণ ৩০৯
অতিরিক্ত উদ্ধৃতিসমূহের উত্তর ৩১২
আলোচনার সারমর্ম ৩১৪
মাওলানা রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি রহ.-এর অভিমত ও সত্যায়ন ৩১৫
মুফতি শফি রহ.-এর সত্যায়ন ৩২০

প্রচলিত মোজার ওপর মাসেহ করার শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার ব্যাপারে সব আলেম একমত। কিন্তু সাম্প্রতিককালের এক প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদের ধারণা হলো সুতি, পশমি ও নাইলনের মোজার ওপরও মাসেহ করা জায়েজ। এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর কাছে একটি প্রশ্ন পাঠান। তিনি এর বিস্তারিত জবাব লিপিবদ্ধ করেন যা মাসিক আল-বালাগ জুমাদাল উলা ১৩৯৭ হিজরি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখন আমরা একে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মহান আল্লাহ এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এর প্রতিদান আমাদের সবাইকে দান করুন।

—মুহাম্মাদ মাশহুদ হক

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

প্রচলিত মোজার ওপর মাসেহ করার শরয়ি বিধান

প্রশ্ন : আলেমগণের মতে কোন কোন মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ আছে জানিয়ে বাধিত করবেন।

ক. চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকল আলেম একমত। অবশ্য সুতি, নাইলন ও এ জাতীয় অন্যান্য মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ আলেম সুতি ও নাইলনের মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেন।

কিন্তু সাম্প্রতিককালের একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ বলেন—কোনো প্রকার শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়াই সর্বপ্রকার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ!

খ. মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার জন্য ফকিহগণ যেসব শর্ত আরোপ করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ এই চিন্তাবিদ বলেন—

'আমি এসব শর্তের উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি ও চেষ্টা চালিয়েছি, কিন্তু হাদিসে নববিতে এসব শর্তের কোনো উৎস খুঁজে পাইনি। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে যা প্রমাণিত হয় তা হলো : আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জাওরাব[১] এবং জুতোর ওপর মাসেহ করেছেন। নাসায়ি শরিফ ছাড়া হাদিসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ কিতাবে এবং মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এ মুগিরা ইবনু শুবা রা.-এর এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করেছেন এবং জাওরাব ও উভয় জুতোর ওপর মাসেহ করেছেন। সুনানে আবু দাউদের বিবরণ হলো আলি, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, বারা ইবনু আজেব, আনাস ইবনু মালিক, আবু ওমামা, সুহাইল ইবনু সাদ এবং আমর ইবনু হুরাইস রা. জাওরাবের ওপর মাসেহ করেছেন। তাছাড়া উমর ও আব্বাস রা. থেকেও এ আমলটি বর্ণিত আছে। ইমাম বায়হাকি রহ. ইবনু আব্বাস রা. ও আনাস রা. থেকে এবং ইমাম তহাবি রহ. উওয়াইস ইবনু আওস রা. থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল জুতোর ওপর মাসেহ করেছেন। এই বর্ণনায় জাওরাবের উল্লেখ নেই। এ আমল আলি রা. থেকেও বর্ণিত আছে।

এসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, জাওরাব পরিহিত থাকা অবস্থায় জুতোর ওপর মাসেহ করা জায়েজ। ঠিক তেমনিভাবে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করাও জায়েজ। এসব রেওয়ায়েতের কোথাও পাওয়া যায় না যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফকিহগণের আরোপিত শর্তের কোনো একটি বর্ণনা করেছেন। কোথাও এ কথারও উল্লেখ নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ যেসব মোজা পরতেন সেগুলো কিসের ছিলো।

এসব কারণে আমি এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ফকিহগণের আরোপিত শর্তাবলির কোনো উৎস ও ভিত্তি নেই। আর ফকিহগণ যেহেতু শরিয়ত প্রবর্তক নন তাই তাদের আরোপিত শর্তাবলির ওপর আমল না করলে কোনো গুনাহ হবে না। আমার গবেষণার সারমর্ম হলো, সর্বপ্রকার মোজার ওপর নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে মাসেহ করা যেতে পারে—চাই সেই মোজা পশমি, সুতি, নাইলন, চামড়া, ওয়াল ক্লথ কিংবা রেক্সিনেরই হোক না কেনো। এমনকি পায়ে কাপড় পেচিয়ে যদি তার ওপর মাসেহ করা হয় তাহলেও তা জায়েজ আছে।

এই চিন্তাবিদ ছাড়াও আল্লামা ইবনু তাইমিয়া তার ফতোয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে

---

[১] চামড়া ছাড়া কাপড় কিংবা অন্যকিছু দিয়ে তৈরি মোজাকে জাওরাব বলা হয়।

এই ফতোয়া দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু কইয়্যিম ও ইবনু হাজম জাহেরি রহ.-এর অভিমতও তাই যে, কোনো শর্ত আরোপ করা ছাড়াই সর্বপ্রকার মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ আছে।

পরিশেষে আমি বিনীতভাবে আরজ করছি, নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এ মাসআলার প্রমাণ-সমৃদ্ধ সবিস্তার উত্তর লিখে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর প্রত্যাশী
—মুহাম্মাদ তাহের ঘুরি, মারেফাত
মাদরাসা তালিমুন নিসা,
চিশতিয়া, ভাওয়ালনগর, পাকিস্তান।

উত্তর : সুতি, পশমি অথবা নাইলনের যেসব মোজা আজকাল প্রচলিত আছে সেগুলোর ওপর মাসেহ করা মুজতাহিদ ইমামগণের কারও মতেই জায়েজ নেই। আপনার এ ধারণা ভুল যে, এ মাসআলায় ফকিহগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। বরং বাস্তবতা হলো এমন পাতলা মোজার ব্যাপারে সকল মুজতাহিদ ইমাম একমত যে, এসব মোজার ওপর মাসেহ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। আলেমকুল শিরোমণি আল্লামা কাসানি রহ. লেখেন—

فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ، لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ.

'যদি মোজাদ্বয় এত পাতলা হয় যে, পানি চোষণ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলোর ওপর মাসেহ করা জায়েজ হবে না।'[২]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. লেখেন—

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ الرَّقِيقِ مِنْ غَزْلٍ أَوْ شَعْرٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ كَانَ ثَخِينًا يَمْشِي مَعَهُ فَرْسَخًا فَصَاعِدًا كَجَوْرَبِ أَهْلِ مَرْوَ فَعَلَى الْخِلَافِ.

'পাতলা পশমি অথবা সুতি মোজার ওপর মাসেহ করা কারও মতেই জায়েজ নেই। আর মোজাটি যদি এমন মোটা হয় যা পরিধান করে এক ক্রোশ (দুই মাইলের কিছু বেশি বা ৮০০০ হাত পরিমাণ) কিংবা তার

[২] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০।

চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করা যায়, তাহলে এর ওপর মাসেহ্ করা জায়েজ হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।'[৩]

এ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যেসব মোজার ক্ষেত্রে মোটা হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় না অর্থাৎ, সেগুলো পানি চোষণ করে নেয় অথবা কোনো বস্তু দ্বারা বাঁধা ছাড়াই নিজের পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে সংযুক্ত থাকতে পারে না কিংবা এটি পরিধান করে এক ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রম করা যায় না, সেসব মোজার ওপর মাসেহ্ করা কোনো মুজতাহিদের মাজহাব মতেই জায়েজ হবে না। হ্যাঁ! যেসব মোজায় এ তিন শর্ত পাওয়া যায় সেগুলোর ওপর মাসেহ্ করা জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা জনাব সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদি বহু মাসআলায় উম্মতের অধিকাংশ আলেমের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। মোজার মাসআলার ব্যাপারেও তিনি অধিকাংশ ফকিহ্গণের মতের বিপরীতে অবস্থান করে মারাত্মক ভুল করেছেন। আপনি তার যেসব প্রমাণ পেশ করেছেন সেগুলোর নিরিখে অনুমিত হয়, মাওলানা মওদুদি এ মাসআলার তাহ্কিক, মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতাকে ভালোভাবে বুঝার ন্যূনতম চেষ্টাটুকুও করেননি! আপনি এবং পাঠকসমাজের চিত্তপ্রশান্তি ও অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে মাসআলাটির তাহ্কিক ও মূলতত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

বাস্তবতা হলো পবিত্র কুরআন সুরায়ে মায়েদায় অজু করার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছে তার মধ্যে স্পষ্টভাবে পা ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; মাসেহ করার জন্য বলা হয়নি। এজন্য পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের দাবি হলো অজু করার সময় দুই পা ধৌত করতে হবে এবং কোনো অবস্থায়ই এগুলোর ওপর মাসেহ্ করা জায়েজ হবে না। এমনকি যখন কোনো ব্যক্তি পায়ে চামড়ার মোজা পরিহিত থাকে তখনো তার জন্য মাসেহ্ করা জায়েজ হবে না। কিন্তু উম্মাহর সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ্ করার অনুমতি দেওয়ার কারণ এই যে, এমন মোজার ওপর মাসেহ্ করা এবং এর অনুমতি দেওয়া মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন পরম্পরাসূত্রে বর্ণিত যে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। মোজার ওপর মাসেহ্ করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে যদি কেবল দু তিনটি হাদিস থাকতো, তাহলে এগুলোর ওপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনে আলোচিত স্পষ্ট বিধানটিতে কোনো শর্ত আরোপ করা জায়েজ হতো না। কেননা, খবরে ওয়াহিদ বা একক ব্যক্তির সংবাদের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনের কোনো

বিধানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রহিতকরণ ও শর্ত সংযোজন জায়েজ নেই। কিন্তু মোজার ওপর মাসেহ করার হাদিসগুলো যেহেতু অর্থগতভাবে পরম্পরাসূত্রে বর্ণিত তাই এসব হাদিসের আলোকে এর ওপর উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতে পা ধোয়ার হুকুম ওই সময়ের সঙ্গে বিশেষিত যখন ব্যক্তির পায়ে চামড়ার মোজা পরিহিত না থাকে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন—

مَا قُلْت بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي فِيهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ.

'দিবালোকের মতো স্পষ্ট হওয়ার আগে আমি মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার প্রবক্তা হইনি!'[৪]

মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার বিষয়ে আশি জন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. সহিহ বুখারির ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারিতে লেখেন—

وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُتَوَاتِرٌ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ رُوَاتَهُ فَجَاوَزُوا الثَّمَانِينَ مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ.

'হাফেজে হাদিসগণের একটি বড়ো দল স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। তাদের কেউ কেউ এ বিষয়ক হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা আশি জন পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন সাহাবিও রয়েছেন।'[৫]

হাসান বসরি রহ. বলেন—

أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ بَدْرِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

'আমি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এমন সত্তর জন সাহাবি পেয়েছি যারা সকলেই মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ মনে করতেন।'[৬]

যদি মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত না হতো, তাহলে পবিত্র কুরআন পা ধোয়ার যে বিধান প্রবর্তন করেছে তার মধ্যে কোনো ধরনের

---

[৪] আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৩।

[৫] নাইলুল আওতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৬।

[৬] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭।

সীমাবদ্ধতা ও শর্তারোপ করার অবকাশ ছিলো না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন—

> إِنَّمَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ إِذَا وَرَدَتْ كَوُرُودِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الاستفاضة.
>
> 'পবিত্র কুরআনের কোনো বিধানকে সুন্নতের মাধ্যমে তখনই রহিত কিংবা সীমাবদ্ধ করা যায় যখন, কোনো বিষয়ে এত ব্যাপকভাবে হাদিস বর্ণিত হয়, মোজার ওপর মাসেহ করার ব্যাপারে যত ব্যাপকভাবে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।'

আলোচনার সারমর্ম হলো, অজুর মধ্যে পা ধোয়ার কুরআনি বিধানটি এমন বিষয় নয় যাকে দু-তিনটি রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে বিশেষিত কিংবা সীমাবদ্ধ করা যায়। এর জন্য এমন মুতাওয়াতির বর্ণনা প্রয়োজন যেমনটি মোজার মাসেহের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এখন চামড়ার মোজার ব্যাপারে এই তাওয়াতুর বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এগুলোর ওপর মাসেহ করেছেন এবং অন্যদেরকেও এর অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু চামড়ার মোজা ছাড়া অন্য কোনো মোজার ব্যাপারে এমন তাওয়াতুর বর্ণনা নেই। আর আরবি ভাষায় خفين যেহেতু কেবল চামড়ার মোজাকেই বলা হয়; কাপড়ের মোজাকে خف বলা হয় না, তাই মাসেহ করার অনুমতি কেবল চামড়ার মোজার সঙ্গেই বিশেষিত থাকবে। অন্যান্য মোজার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের মূল নির্দেশনা ধৌত করাই বলবৎ থাকবে। অবশ্য কাপড়ের মোজা যদি এত পরিমাণ মোটা হয় যে, তা আপন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিতে চামড়ার মোজার সমস্তরের হয়ে যায়, অর্থাৎ, তা পানি চোষণ করে না এবং পায়ে আটকে রাখার জন্য অন্য কোনো সুতো বা রশির বন্ধনের প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজনে তা পায়ে পরিধান করে এক বা দুই মাইল হেঁটে অতিক্রম করা যায়, তাহলে এমন মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণ মতানৈক্য করেছেন। কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন—যেহেতু এমন মোজা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চামড়ার মোজার অনুরূপ হয়ে গিয়েছে তাই এগুলোর ওপরও মাসেহ জায়েজ হওয়া উচিত। আবার অন্য একদল ফকিহ বলেছেন—মাসেহ করার বিষয়টি যেহেতু পরম্পরাসূত্রে কেবল চামড়ার মোজার জন্যই প্রমাণিত তাই চামড়ার মোজা ভিন্ন অন্য কোনো মোজায় মাসেহ করা জায়েজ নেই। তাদের বিবরণ দ্বারা বোঝা যায়, মোজা তিন প্রকার—

১. এমন চামড়ার মোজা আরবি ভাষায় যেগুলোকে خف বলা হয়। এ জাতীয় মোজার ওপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

২. এমন পাতলা মোজা যা চামড়ার নয় এবং চামড়ার মোজার গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে নেই। আজকালকার সুতি, পশমি ও নাইলনের মোজাসমূহ এই প্রকৃতির। এসব মোজার ব্যাপারে সর্বসম্মত অভিমত হলো এগুলোর ওপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। কেননা, এ জাতীয় মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়া এমন শক্তিশালী প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত নয় যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে দুই পা ধোয়ার কুরআনি আদেশটি বর্জন করা যায়।

৩. এমন মোজা যেগুলো চামড়ার না হলেও মোটা হওয়ার কারণে চামড়ার মোজার গুণাবলি সেগুলোতে বিদ্যমান। এসব মোজায় মাসেহ করা জায়েজ হবে কি না সে ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

আলোচনার সার নির্যাস হলো—যেসব মোজা চামড়ার মোজার মতো নয় সেগুলোর ওপর মাসেহ জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। এর কারণ হলো, দুই পা ধোয়ার কুরআনি নির্দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাসেহ করার বিধান এমন পরম্পরাসূত্রে প্রমাণিত না হবে যেমন পরম্পরাসূত্রে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ জায়েজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। এজন্য ফকিহগণ কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ জায়েজ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তারা সেগুলো নিজেদের পক্ষ থেকে আরোপ করেননি, বরং তারা এসব মোজার মধ্যে চামড়ার গুণাবলি থাকার কারণেই আরোপ করেছেন। আর এর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে যে, এ শর্তগুলো পাওয়া যাওয়ার পরও সেগুলোর ওপর মাসেহ করা জায়েজ হবে কি না?

মাসআলার এ বাস্তবতা স্পষ্ট হওয়ার পর এখন আপনি সেসব রেওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ্ করুন, যেগুলোর মধ্যে জাওরাবের ওপর মাসেহ জায়েজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাদিসের সুবিশাল ভান্ডারে এ ব্যাপারে কেবল তিনটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটি বেলাল রা. থেকে এবং অন্যটি আবু মুসা আশআরি রা. থেকে এবং আরেকটি মুগিরা ইবনু শোবা রা. থেকে বর্ণিত। বেলাল রা.-এর বর্ণিত হাদিসটি 'মুজামে সগির তাবারানি' গ্রন্থে রয়েছে। আর আবু মুসা আশআরি রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি ইবনু মাজাহ ও বায়হাকি শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু

হাফেজ জাইলায়ি রহ. এ দুটি হাদিসের ব্যাপারে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, হাদিস দুটি সনদের বিবেচনায় দুর্বল।[৭]

আবু মুসা আশআরি রা.-এর হাদিসের ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ রহ. লেখেন—

ليس بالمتصل ولا بالقوى.

হাদিসটির বর্ণনাসূত্র অবিচ্ছিন্ন ও শক্তিশালী নয়। অতএব, এ দুটি রেওয়ায়েতের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেলো।

রইলো মুগিরা ইবনু শোবা রা.-এর হাদিস। এ হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম তিরমিজি রহ. যদিও 'হাসান সহিহ' বলেছেন, কিন্তু অন্য বড়ো বড়ো মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিজি রহ.-এর এ কথার কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি উল্লেখ করার পর লেখেন—

> وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
>
> 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদি জাওরাব সংক্রান্ত এ হাদিসটি বর্ণনা করতেন না। কেননা, মুগিরা ইবনু শোবা রা. থেকে বর্ণিত আছে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করেছেন।'

ইমাম নাসায়ি রহ. সুনানে কুবরাতে লেখেন—

> لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ عليه السلام مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
>
> 'আমাদের জানামতে আবু কুবাইস ছাড়া এ হাদিসটি আর কেউ বর্ণনা করেননি। মুগিরা ইবনু শোবা রা. থেকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চামড়ার মোজায় মাসেহ করার বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।'[৮]

তাছাড়া ইমাম মুসলিম, ইমাম বায়হাকি, সুফিয়ান ছাওরি, ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাইন, আলি ইবনু মাদিনি রহ. প্রমুখ আবু কুবাইস এবং হুজাইল

---

[৭] নাসবুর রায়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৩-১৮৪।

[৮] নাসবুর রায়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৩।

ইবনু শোরাহবিলের দুর্বলতার ভিত্তিতে এ রেওয়ায়েতটিকে দুর্বল বলেছেন। সহিহ মুসলিমের ভাষ্যকার আল্লামা নববি রহ. লেখেন—

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ انْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، مَعَ أَنَّ الْجَرْحَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ، قَالَ: وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: إِنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

'যেসব মহান ব্যক্তি এ হাদিসটিকে 'জইফ' বলে অভিমত দিয়েছেন তারা এককভাবেও ইমাম তিরমিজি রহ. থেকে অগ্রগণ্য। তাছাড়া হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মূলনীতি হলো, কোনো হাদিসের সমালোচনা সেটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার অভিমতের চেয়ে অধিক গ্রহণীয়। আর হাদিসের হাফেজগণ সকলেই এ হাদিসটি 'জইফ' হওয়ার ব্যাপারে একমত। এজন্য এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি রহ.-এর উক্তি 'হাসান সহিহ' গ্রহণযোগ্য নয়।'[৯]

এই হলো ওই হাদিসের সনদগত মর্যাদা যাকে মাওলানা মওদুদি তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। পাঠক দেখতে পেয়েছেন, প্রথমত, এই হাদিসটি হাদিসের অধিকাংশ হাফেজের কাছেই জইফ হওয়ায় তা প্রমাণ হিসেবে পেশ করার অযোগ্য। আর দ্বিতীয়ত, ইমাম তিরমিজি রহ.-এর কথা অনুযায়ী যদি এ হাদিসটিকে 'হাসান সহিহ' বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও হাদিসের বিশাল ভান্ডারে এটি হবে কেবল একটি হাদিস যার মধ্যে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জাওরাবের ওপর মাসেহ করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

পাঠক, চিন্তা করে দেখুন! পবিত্র কুরআন দুই পা ধোয়ার যে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট হুকুম দিয়েছে তাকে এই একটি মাত্র হাদিসের ওপর ভিত্তি করে কীভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়, যখন হাদিসবেত্তাগণ এর কঠোর সমালোচনাও করেছেন? আপনি ইতোপূর্বে অবগত হয়েছেন যে, চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার নির্দেশটি ওই সময় প্রমাণিত হয়েছে যখন এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ তাওয়াতুর পরম্পরাসূত্রে বর্ণিত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন—চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার হাদিসসমূহ যদি তাওয়াতুর পর্যন্ত না পৌঁছতো, তাহলে দুই পা ধোয়ার কুরআনি নির্দেশটি বর্জন করার অবকাশ থাকতো না। কিন্তু জাওরাবের ওপর মাসেহ করার বিষয়টি পরম্পরাসূত্রে বর্ণিত হওয়া তো দূরের

---

[৯] নাসবুর রায়াহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৩।

কথা হাদিসের বিশাল ভান্ডারে এর মাত্র তিনটি রেওয়ায়েত আছে। এ তিনটির দুটি সর্বসম্মতিক্রমে 'জইফ' ও দুর্বল। আর অপরটিকে ইমাম তিরমিজি রহ. ছাড়া বাকি অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিজি রহ. একে 'সহিহ' বলেছেন। এমন রেওয়ায়েতসমূহের ওপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনের কোনো বিধানের মধ্যে কোনো ধরনের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যায় না। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. লেখেন—

> وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ مُرَادَ الْآيَةِ الْغَسْلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فَلَوْ لَمْ تَرِدْ الْآثَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَمَا أَجَزْنَا الْمَسْحَ..... وَلَمَّا لَمْ تَرِدْ الْآثَارُ في جواز المسح على الجوربين فِي وَزْنِ وُرُودِهَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَقَّيْنَا حُكْمَ الْغَسْلِ عَلَى مُرَادِ الْآيَةِ.
>
> 'এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো আমাদের পূর্ব বর্ণিত কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো দুই পা ধৌত করা। সুতরাং মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি যদি অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত না হতো, তাহলে আমরা একে বৈধ বলে অভিমত প্রদান করতাম না। জাওরাবের ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার বিষয়টি যেহেতু চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টির মতো অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত নয় তাই আমরা জাওরাব পরিহিত অবস্থায় আয়াতের বিধান দুই পা ধোয়ার বিষয়টিই বহাল রাখলাম।'[১০]

এখন কেবল এ প্রশ্নটি থেকে যায়, যেসব সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে তারা জাওরাবের ওপর মাসেহ করেছেন কিংবা এর অনুমতি দিয়েছেন তাদের এ আমলের কারণ কী ছিলো? উত্তর হলো সাহাবিগণের এসব উক্তির কোথাও স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ নেই যে, জাওরাব কাপড়ের পাতলা মোজা ছিলো। আর যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে এটি জানা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এসব উক্তি ও আসারের আলোকে পাতলা মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়া কীভাবে সাব্যস্ত হতে পারে? এ কারণেই প্রসিদ্ধ আহলে হাদিস আল্লামা শামসুল হক আজিম আবাদি লেখেন—

> أَنَّ الْجَوْرَبَ يُتَّخَذُ مِنَ الْأَدِيمِ وَكَذَا مِنَ الصُّوفِ وَكَذَا مِنَ الْقُطْنِ وَيُقَالُ

---

[১০] আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২৮।

لِكُلٍّ مِنْ هَذَا إِنَّهُ جَوْرَبٌ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ الرُّخْصَةَ بِهَذَا الْعُمُومِ الَّتِي ذَهَبَتْ إِلَيْهَا تِلْكَ الْجَمَاعَةُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يثبت أَنَّ الْجَوْرَبَيْنِ الَّذِينَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا مِنْ صُوفٍ

'জাওরাব চামড়া, পশম এবং তুলোর মাধ্যমেও তৈরি করা হয় এবং এগুলোর প্রত্যেকটিকেই জাওরাব বলে অভিহিত করা হয়। আর এটি জানা কথা যে, সর্বপ্রকার মোজার ওপর মাসেহ করার অনুমতি ওই সময় পর্যন্ত সাব্যস্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রমাণিত না হবে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমের মোজার ওপর মাসেহ করেছেন।'[১১]

এসব সাহাবি যেসব জাওরাবের ওপর মাসেহ করেছেন, সেগুলো হয়তো চামড়ার ছিলো কিংবা পুরুত্বের কারণে গুণ ও বৈশিষ্ট্যে চামড়ার মোজার অনুরূপ ছিলো। মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবায় এসেছে—

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَشُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا صَفِيقَيْنِ»

'সাইদ ইবনু মুসাইয়িব এবং হাসান রহ. বলেন—কাপড়ের মোজা যখন মোটা হয় তখন তার ওপর মাসেহ করা জায়েজ আছে।'[১২]

উল্লেখ্য যে, ثوب صفيق বা মোটা কাপড় বলতে যা বুঝায় তা হলো এমন কাপড় যা শক্ত ও মজবুত হয়ে থাকে। কামুস এবং মুখতারুস সিহাহ অভিধানগ্রন্থে এমনটিই লেখা আছে।

হাসান বসরি রহ. এবং সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রহ. শীর্ষস্থানীয় তাবিয়িগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা সাহাবিগণের আমল দেখেই এ ফতোয়া দেন।

অতএব, এসব মহান ব্যক্তির আমল ও ফতোয়ার মাধ্যমে যা প্রমাণিত হয় তা হলো—যে মোজা মোটা হওয়ার ভিত্তিতে চামড়ার মোজার গুণাবলির ধারক হয় সেগুলোর ওপর মাসেহ করা জায়েজ। মোটা হওয়ার বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্যই তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে—

১. এগুলো পানি চোষণ করতে পারবে না;

---

[১১] আওনুল মাবুদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬২।

[১২] মুসান্নাফে আবি শাইবা, হাদিস : ১৯৭৬।

২. কোনো সুতো কিংবা ফিতার মাধ্যমে বাঁধা ছাড়াই মোটা হওয়ার কারণে তা দুই পা'তে আটকে থাকতে হবে;

৩. এই মোজা পরিধান করে জুতো ছাড়াই এক বা দুই মাইল হাঁটা সম্ভব হবে।

এজন্য জাওরাবকেও অধিকাংশ ফকিহ চামড়ার মোজায় মাসেহ করার হাদিসগুলোর ইঙ্গিতের আলোকে এবং আলোচিত সাহাবিগণের উক্তির নিরিখে চামড়ার মোজার হুকুমে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. লেখেন—

> لَا شَكَّ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يَصْلُحُ إِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَاهُ، وَمَعْنَاهُ السَّاتِرُ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ
>
> 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি খেলাফে কিয়াস বা সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত। তাই এর সঙ্গে অন্য কোনো মোজাকে সংযুক্ত করা যাবে না। তবে হাদিসগুলোর ইঙ্গিতের আলোকে যদি তা চামড়ার মোজার সম-স্তরের হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। আর সমস্তরের হওয়ার অর্থ হলো পায়ের ফরজ অংশটুকু ঢেকে রাখা এবং এগুলো পরিধান করে জুতো ছাড়া ক্রমাগতভাবে এক দুই মাইল হাঁটতে সক্ষম হওয়া।'[১৩]

এজন্য ফকিহগণ কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার জন্য যেসব শর্ত নির্ধারণ করেছেন সেগুলোর এই অপব্যাখ্যা দেওয়া চরম ভুল ও বাস্তবতা পরিপন্থি যে, হাদিসের মধ্যে সর্বপ্রকার মোজার ওপর ব্যাপকভাবে মাসেহ করার অনুমতি ছিলো; কিন্তু ফকিহগণ নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু শর্ত আরোপ করে এই ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। বাস্তব সত্য হলো মূলনীতির আলোকে পা ধোয়ার ফরজটিকে ছেড়ে দিয়ে মাসেহ করার বিধান ওই সময় পর্যন্ত সাব্যস্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাওয়াতুর হাদিস না থাকবে। আর চামড়ার মোজার ব্যাপারে যেহেতু এ জাতীয় হাদিস ছিলো তাই এগুলোর ওপর মাসেহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি এমন কোনো হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয় যা সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ। এজন্য এগুলোর ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত মাসেহ করার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছিলো

---

[১৩] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৯।

না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো গুণ ও বৈশিষ্ট্যে চামড়ার মোজার অনুরূপ হয়। আর কতক সাহাবি এবং তাবিয়ি যেহেতু এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মোজাই পরিধান করতেন তাই অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদ এগুলোর ওপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং চামড়ার মোজার মৌলিক গুণগুলোকে তিনটি শর্ত বর্ণনা করার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর এর ওপর সকল মুজতাহিদ ইমামের ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে।

আর আল্লামা ইবনু তাইমিয়া, ইবনু হাজম জাহেরি ও ইবনু কইয়্যিম জাওজি রহ. যদিও আপন আপন স্থানে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী; কিন্তু তারা বহু মাসআলায় উম্মতের অধিকাংশ আলেমের মতের বিপরীতে এমন মত অবলম্বন করেছেন, উম্মাহ সামষ্টিকভাবে যেগুলোকে গ্রহণ করেনি। মজার কথা হলো—এ মাসআলায় তারা নিজেদের মতের সমর্থনে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। এজন্য মুসলিম উম্মাহর সকল ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের মোকাবিলায় কেবল এই তিনজন ব্যক্তির মতের ওপর ভিত্তি করে দুই পা ধোয়ার কুরআনি নির্দেশ অমান্য করা চরম ধৃষ্টতার শামিল। আর এই ইজতিহাদের কোনো ভিত্তি নেই যে, 'কোনো ব্যক্তি যদি নিজের পায়ে কাপড় পেচিয়ে তার ওপর মাসেহ করে নেয়, তাহলেও তা জায়েজ' পুরো মুসলিম জাতির ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের ওপর এটি একটি অপবাদ যে, তাদের উক্তির কোনো ভিত্তি ও উৎসস্থল নেই। অথচ পাঠক ইতোমধ্যেই অবহিত হয়েছেন, এ ব্যাপারে কত অনস্বীকার্য প্রমাণ রয়েছে। আর নিজের পক্ষ থেকে এই ইজতিহাদের কী গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে যে, 'অকারণে পায়ে কাপড় পেচিয়েও যদি কেউ মাসেহ করে নেয়, তাহলেও তা জায়েজ।' এমন নিরর্থক কর্মতৎপরতার কারণেও কি দুই পা ধোয়ার কুরআনি বিধানকে বর্জন করা যায়?

প্রশ্নকর্তা যেহেতু সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদির অভিমত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে জুতোর ওপর মাসেহ করার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন, এজন্য পরিশেষে এ বিষয়েও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি। কাপড়ের মোজা যদি মোটা হয়, তাহলে কোনো কোনো ফকিহ এর ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু জুতোর ওপর মাসেহ করা কোনো ইমামের মাজহাব মতেই জায়েজ নেই। মাআরিফুস সুনানে আছে—

لم يذهب أحد من الأئمة إلى جواز المسح على النعلين.

‘ইমামগণের কেউই জুতোর ওপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার প্রবক্তা নন।’[১৪]

এর কারণ এই যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জুতোর ওপর মাসেহ করা ওই সময় প্রমাণিত যখন তিনি আগে থেকেই অজু অবস্থায় থাকতেন এবং নতুন নামাজের জন্য পুনরায় অজু করতেন। এ অবস্থায় যেহেতু অজু আগে থেকেই থাকতো এজন্য মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই পা ধোয়ার পরিবর্তে জুতোর ওপর হাত টেনে নিতেন। সহিহ ইবনু খুজাইমায় এসেছে—

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ «، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ»

‘আলি রা. একপাত্র অজুর পানি আনতে বললেন, পানি আনা হলে তিনি হালকা অজু সেরে নিলেন এবং উভয় জুতোর ওপর মাসেহ করলেন। এরপর বললেন, পবিত্র অবস্থায় অজু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজু এমনই ছিলো।’[১৫]

এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর জুতোর ওপর মাসেহ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের নিরিখে অজুহীন ব্যক্তির জন্য জুতোর ওপর মাসেহ করার কোনো অবকাশ বাকি থাকে না।

অতএব, উম্মতের নির্ভরযোগ্য সকল ফকিহ ও মুজতাহিদ এর ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সেসব পাতলা মোজা যেগুলো পানি চোষণ করে নেয় অথবা কোনো সুতো ও ফিতা দিয়ে বাঁধা ছাড়াই নিজের পুরুত্বের বলে পায়ের সঙ্গে তা আটকে থাকে না কিংবা জুতো পরিধান না করেই এটি পায়ে দিয়ে এক দুই মাইল হাঁটা যায় না, এমন মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে জুতোর ওপর মাসেহ করাও বৈধ হবে না। আজকাল যে সুতি, পশমি ও নাইলনের মোজা প্রচলিত আছে সেগুলো যেহেতু পাতলা হয়ে থাকে এবং এগুলোর মধ্যে চামড়ার মোজার গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না তাই এগুলোর ওপর মাসেহ করা কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি এমন মোজার ওপর মাসেহ করে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালিক এবং ইমাম

---

[১৪] মাআরিফুস সুনান, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৭।

[১৫] সহিহ ইবনু খুজাইমা, হাদিস : ২০০।

আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মতো মহান ইমামগণের কারও মতেই তার অজু জায়েজ হবে না। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

(সৌজন্যে : মাসিক আল বালাগ,জুমাদাল উলা, ১৩৯৭ হি.)

এক রোকন বিলম্বিত করার পরিমাণ কতটুকু যার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ . لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا
اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছো, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।'

সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৫।

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

এক রোকন বিলম্বিত করার পরিমাণ কতটুকু যার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?

প্রশ্ন : ‘মুনইয়াতুল মুসল্লি’ নামক গ্রন্থে আছে, প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে শুধু বসার দ্বারাই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষ্য হলো—

ويجب سجدة السهو بمجرد الجلوس

‘কেবল বসার মাধ্যমেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়।’ আর ‘মিফতাহুস সালাত’ গ্রন্থকার সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক তাসবিহ পরিমাণ উপবেশনকে শর্ত করেছেন। আল্লামা শামি রহ. লেখেন—কেবল বসার মাধ্যমেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। কেননা, হানাফি ও শাফিয়ি মতাবলম্বীদের মধ্যে আরামের জন্য বসা সুন্নত কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি جلسة استراحة[১৬] পরিমাণ সময় উপবেশন করলো সে ভুলক্রমে সুন্নত বর্জন করলো। আর সিজদায়ে সাহু কোনো ওয়াজিব বর্জন করার কারণে অপরিহার্য হয়ে থাকে; সুন্নত বর্জন করার কারণে নয়। একবার আমারও এমন হলে আল্লামা শামি রহ.-এর অভিমতটিকে অগ্রগণ্য মনে করে এর ওপর আমল করি। কিন্তু

[১৬] দুই সিজদার মাঝখানে আরাম করার জন্য যে উপবেশন করা হয় তাকে পরিভাষায় (جلسة استراحة) বলা হয়।

এরপরও আন্তরিকভাবে এ মাসআলার ব্যাপারে আস্থাশীল হতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার অবগতির জন্য আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর এ সংক্রান্ত একটি জবাব তুলে ধরছি। তাতেও চিন্তা করার অনুরোধ রইলো। তিনি এ জাতীয় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

'সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমিও সংশয়ে আছি। তবে এর ওপর আমল করে যাচ্ছি যে, কেবল বসলেও সিজদায়ে সাহু করে নিই। এটি সুন্নত বর্জন করার কারণে নয়, বরং দাঁড়ানোর ফরজকে বিলম্বিত করার কারণে। আর সাধারণত শুধু বসলেই এক তাসবিহ পরিমাণ সময় লেগে যায়।'[১৭]

মুফতি তকি উসমানি-এর অনুসন্ধানী উত্তর

আল্লাহর সাহায্যে বলছি, নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ বিজ্ঞ পাঠকদের জন্য চিন্তার যথেষ্ট খোরাক যোগাবে—

- وَيجب إِن قَرَأَ فِي رُكُوع أَو قعُود أَو قدم ركنا أَو أَخّرهُ أَو كَرَّرَه أَو غَيَّرَ وَاجِبا أَو تَركه كركوع قبل.... واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام المصنف يشير إلى هذا وقال بعضهم : بقدر ركن وهو الصحيح كما في أكثر الكتب.

  'মুলতাকাল আবহুর গ্রন্থকার বলেন—যদি রুকু অথবা বৈঠকে কেরাত পড়ে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি একটি রোকনকে অগ্রবর্তী করে অথবা পশ্চাদবর্তী করে কিংবা একাধিকবার করে অথবা কোনো ওয়াজিব পরিবর্তন করে দেয় কিংবা বর্জন করে, তাহলেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। যেমন : কেরাতের আগে কেউ রুকু করলো অথবা তাশাহহুদের পর অতিরিক্ত কিছু পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে বিলম্ব করলো।'

আলোচ্য উদ্ধৃতির ব্যাখ্যাকার শায়খজাদা রহ. বলেন—

'কতটুকু পরিমাণ বিলম্ব করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে সে ব্যাপারে ফকিহগণের

[১৭] এমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫১।

মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফকিহ্ বলেছেন—তাশাহহুদের পর এক অক্ষর বাড়ালেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। মুসান্নিফ রহ.-এর কথাও সেদিকেই ইঙ্গিত করে। আবার অন্য একদল ফিকহশাস্ত্রবিদ বলেছেন—এক রোকন পরিমাণ বিলম্ব করলেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ কিতাবের বিবরণ অনুযায়ী এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।'[১৮]

- وقال تحته شارحه العلامة ابن عابدين بقدر ركن.

  'এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—এক রোকন পরিমাণ সময় বিলম্ব করলেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়।' প্রাগুক্ত

- قال الإمام ظهير الدين المرغيناني لا يجب بقوله اللَّهُمَّ صل على محمد وإنما المعتبر مقدار ما يؤدى فيه ركنا كذا في الظهيرية.

  'ইমাম জহিরুদ্দিন মারগিনানি রহ. বলেন—বসা অবস্থায় اللَّهُمَّ صل على محمد বললেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না, বরং গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো এতটুকু পরিমাণ সময় বিলম্ব করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় যার মধ্যে এক রোকন আদায় করা যায়। জাহিরিয়্যাহ গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ আছে।'[১৯]

- قال ابن البزاز الكَرْدَارِي : سها في صلاته إنها الظهر أو العصر أو غير ذلك أن تفكر قدر ما يؤدى فيه ركن كالركوع لزم إن قليلا فإن شك في صلاته صلاها.

  'ইবনু বাজ্জাজ কারদারি রহ. বলেন—যদি কোনো নামাজি ভুলে যায় তার নামাজটি জোহর, আসর নাকি অন্য কোনো ওয়াক্ত? আর এ ব্যাপারে যদি সে এক রোকন তথা রুকু আদায় পরিমাণ সময় চিন্তা করে, তাহলে তার জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে; যদি এমনটি তার কম ঘটে থাকে। আর যদি সে তার নামাজেই সন্দিহান হয়ে পড়ে, তাহলে নামাজটি পুনরায় পড়ে নেবে।'[২০]

উল্লিখিত এসব উদ্ধৃতির সমন্বিত ফলাফল এই দাঁড়ায়, কোনো ওয়াজিব বিলম্ব

---

[১৮] মাজমাউল আনহুর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

[১৯] বুরজুন্দি, শরহু বেকায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৯।

[২০] আল জামিউল ওয়াজিজ, ফাতাওয়া হিন্দিয়ার টীকা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭০।

করার পরিমাণ যদি এতটুকু হয়, এর মধ্যে একটি রোকন তথা রুকু বা সিজদা আদায় করা যায়, তাহলে অধিকাংশ ফকিহের মতে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। আর سبحان ربي العظيم তিনবার পড়া যায় পরিমাণ সময়ে এক রোকন আদায় করা যায়। 'মারাকিল ফালাহ' গ্রন্থের হাশিয়াতে আল্লামা তাহতাবি রহ. এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات.

'এক রোকনের পরিমাণ কতটুকু ফকিহগণ তা স্পষ্ট করেননি। পূর্ববর্ণিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সুন্নত পরিমাণ রোকন যার মধ্যে তিন তাসবিহ আদায় করা যায়।'[২১]

এছাড়াও আরও অনেক উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর কোনো কোনোটি তো অগ্রহণযোগ্য আবার কোনো কোনোটির ফলাফল আমরা যা আলোচনা করেছি তাই বের হয়েছে।

'তানবিরুল আবসার' গ্রন্থকার এ মাসআলাটি দুই জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আর বাহ্যিকভাবে উভয়টিকে বিরোধপূর্ণ মনে হয়। باب صفة الصلاة এর মধ্যে তিনি লেখে—

(فَإِنْ زَادَ عَامِدًا كُرِهَ) فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ (أَوْ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) فَقَطْ (عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لَا لِخُصُوصِ الصَّلَاةِ بَلْ لِتَأْخِيرِ الْقِيَامِ.

'যদি নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বাড়ায়, তাহলে তা মাকরুহে তাহরিমি হবে এবং সে নামাজকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি ভুলক্রমে বাড়ায়, তাহলে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে অর্থাৎ, মুসল্লি যদি ভুলক্রমে اللَّهُمَّ صل على محمد বলে, তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক উক্তি অনুযায়ী তার ওপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কেননা, সে কিয়ামের রোকনকে বিলম্বিত করেছে।'[২২]

আলোচ্যাংশটুকুর অধীনে আল্লামা শামি রহ. কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করে 'বাহরুর

---

[২১] হাশিয়াতুত তাহতাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৮।
[২২] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৭।

রায়েক', 'জাইলায়ি', 'শরহু মুনিয়াহ', 'কাবিরি' ও অন্যান্য কিতাব থেকে এই অভিমতকেই সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। আর আল্লামা রমলিও শরহু মুনিয়াহ ছগিরি থেকে وعلى آل محمد পর্যন্ত পড়া হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিকে অগ্রগণ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

আর সিজদায়ে সাহুর অধ্যায়ে 'তানবিরুল আবসার' গ্রন্থকার বলেন—

وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن.

'তাশাহহুদের পর এক রোকন পরিমাণ সময় তৃতীয় রাকাতে দাঁড়াতে বিলম্বিত করা সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ।'

আর 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থকার লিখেছেন, তাশাহহুদের পর এক অক্ষর বাড়ালেও সাহু সিজদা ওয়াজিব। আর আল্লামা জাইলায়ি রহ.-এর মতে اللّٰهُمَّ صل على محمد পড়লেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। এসব বাহ্যত বিরোধী উক্তি উল্লেখ করার পর আল্লামা শামি রহ. বলেন—

جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَتْنِهِ فِي فَصْلِ إِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ وَقَالَ إِنَّهُ الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ فِي الْبَحْرِ تَبَعًا لِلْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِقَدْرِ رُكْنٍ

'إذا أراد الشروع পরিচ্ছেদের মূলপাঠে মুসান্নিফ রহ. এ ব্যাপারে সুদৃঢ় অভিমত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত। 'খুলাসা' ও 'খানিয়া'র অনুসরণে 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকারও এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতেও এটি গ্রন্থকারের এই উক্তির বিরোধী নয় যে, এক রোকন পরিমাণ দেরি করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।'[২৩]

আল্লামা শামির এই বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, اللّٰهُمَّ صل على محمد এবং এক রোকন পরিমাণ হওয়া—উক্তির ফলাফল একই। অতএব, যেসব ব্যক্তি اللّٰهُمَّ صل على محمد এই পর্যন্ত পড়াকে বিলম্বের পরিমাণ বলে উল্লেখ করেছেন তারা এক রোকন পরিমাণ সময়ের কথার ব্যতিক্রম কিছু বলেননি।

রইলো 'মুনইয়াতুল মুসল্লি' গ্রন্থের বিবরণ। তাতে উল্লেখ আছে— যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম অথবা তৃতীয় রাকাতের শেষে বসে পড়ে, তাহলে বসে পড়ার কারণেই

[২৩] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯৪।

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে—চাই সে এক রোকন পরিমাণ সময় বসুক অথবা না বসুক। অনুরূপভাবে এর মধ্যে এটিও যেন বলা হচ্ছে যে, আরামের উপবেশন (جلسة استراحة) দ্বারাও সিজদায়ে সাহু অপরিহার্য হবে। অতএব, এ ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধানী গবেষণা এটিই যা 'রদ্দুল মুহতার' ও 'দুররুল মুখতারে' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তা হলো—

১. আল্লামা হাসকাফি রহ. নামাজের ওয়াজিবসমূহের বিবরণে বলেন—

وَتَرْكُ قُعُودٍ قَبْلَ ثَانِيَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ وَكُلِّ زِيَادَةٍ تَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ..... وَكَذَا الْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ فَيَجِبُ تَرْكُهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ فِعْلِهَا أَيْضًا تَأْخِيرُ الْقِيَامِ إِلَى الثَّانِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الْقَعْدَةُ طَوِيلَةً، أَمَّا الْجِلْسَةُ الْخَفِيفَةُ الَّتِي اسْتَحَبَّهَا الشَّافِعِيُّ فَتَرْكُهَا غَيْرُ وَاجِبٍ عِنْدَنَا، بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ

'দ্বিতীয় রাকাত কিংবা চতুর্থ রাকাতের আগে বসা বর্জন করা এবং প্রত্যেক এমন অতিরিক্ত কাজ যা দুই ফরজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। (এরপর) আল্লামা শামি রহ. বলেন—প্রথম কিংবা তৃতীয় রাকাতের শেষে বসা বর্জন করা ওয়াজিব। তাছাড়া এ সময় বসার কারণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়ানোকে যথাস্থান থেকে বিলম্বিত করতে হয়। এ বিধানটি সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন বৈঠক দীর্ঘ হয়। আর যে বৈঠক দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হয়—যাকে ইমাম শাফিয়ি রহ. মুস্তাহাব বলেছেন—তা বর্জন করা আমাদের মতে ওয়াজিব নয় বরং তা বর্জন করা আমাদের মতে উত্তম।'[২৪]

২. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার কিতাবে আছে—

وَيُكَبِّرُ لِلنُّهُوضِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ (بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودِ) اسْتِرَاحَةٍ وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ ....قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَلَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اهـ قَالَ فِي الْحِلْبَةِ: وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ، فَيُكْرَهُ فِعْلُهُ تَنْزِيهًا لِمَنْ لَيْسَ بِهِ عُذْرٌ. اهـ وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ أَقُولُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي

[২৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৮।

الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ ذَكَرَ مِنْهَا تَرْكَ قُعُودٍ قَبْلَ ثَانِيَةٍ وَرَابِعَةٍ لِأَنَّ ذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقُعُودِ الطَّوِيلِ ·

> 'কোনো ঠেক দেওয়া ও আরামের বসা ছাড়া পায়ের পাতায় ভর করে ওঠার জন্য তাকবির বলবে। অবশ্য যদি ভর দেয় কিংবা আরামের বসা বসে তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই।' আলোচ্য এবারতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শামি রহ. বলেন—শামসুল আয়িম্মাহ্ হালওয়ানি বলেছেন—মতভেদ উত্তম ও অনুত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে। অতএব, যদি কেউ আমাদের মাজহাব মতে এমনটি করে ফেলে, তাহলেও শাফিয়ি রহ.-এর মতে কোনো ক্ষতি নেই। আর ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব মতেও যদি কেউ এমনটি করে ফেলে, তাহলে আমাদের মাজহাব মতে কোনো ক্ষতি নেই। 'আল মুহিত' গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ আছে। 'হালবাতুল মুজাল্লি' গ্রন্থকার বলেন—ওজর না থাকা অবস্থায় কোন কিছুতে ভর না দেওয়া বা আরামের জন্য না বসা সুন্নত অথবা মুস্তাহাব হওয়াই সংগত। অতএব, যদি কারও ওজর না থাকে, তাহলে এভাবে ভর দিয়ে ওঠা বা বসা তার জন্য মাকরুহে তানজিহি হবে। আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থে 'হালবাতুল মুজাল্লি' গ্রন্থকারের অনুসরণ করা হয়েছে। নামাজের ওয়াজিবসমূহের বিবরণে ব্যাখ্যাকার যা বর্ণনা করেছেন আমাদের মত এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা, তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের আগে বসা বর্জন করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেটা দীর্ঘ সময়ের বসার ওপর প্রযোজ্য।' (স্বল্প সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)[২৫]

অতএব, এসব উদ্ধৃতি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, দুই রাকাতের মাঝখানে হালকা সময় বসা জায়েজ আছে। আর আল্লামা শামি রহ.-এর স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ের বৈঠক বর্জন করা ওয়াজিব; সংক্ষিপ্ত সময়ের নয়। আর যুক্তির দাবিও তাই। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে বসাই যখন জায়েজ তখন ভুলক্রমে বসা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে না। তাছাড়া এ উক্তিটি যেহেতু এক রোকন পরিমাণ সময়ের অভিমতের অনুরূপ তাই এটি অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। আর এ যুক্তির সঙ্গে যেহেতু আল্লামা শামি রহ.-এর অভিমতও মিলে গেছে তাই এ দাবি অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে গেছে। আর তাছাড়া আল্লামা ইবরাহিম হালাবি রহ.

---

[২৫] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭২।

থেকে আল্লামা শামি রহ. এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তিভিত্তিক প্রমাণিত কোনো মাসআলা থেকে সরে যাওয়া সমীচীন নয় যখন তা বর্ণনার অনুকূল হয়।

জবাবের সার সংক্ষেপ এই যে, আরামের বৈঠক (جلسة استراحة) পরিমাণ বসা শাফিয়ি মতাবলম্বীদের মতে সুন্নত। এতটুকু পরিমাণ সময় বসার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি
পয়লা মুহাররম, ১৩৮০ হিজরি।

ফতোয়াটিকে যারা সঠিক বলেছেন

'উত্তর সঠিক হয়েছে।' —বান্দা রশিদ আহমাদ
'উত্তর সঠিক হয়েছে।'—বান্দা মুহাম্মাদ শফি

রমজানে জামাতের সাথে নফল নামাজ আদায়

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ হাসান নামে জনৈক ব্যক্তি মাওলানা মুফতি শফি রহ.-এর খেদমতে রমজানে জামাতের সাথে নফল নামাজ আদায়ের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন পাঠান। এই মাসআলার সঙ্গে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর এ সংক্রান্ত একটি জবাবও পাঠান। মাওলানা মুফতি শফি রহ. এ প্রশ্নের জবাব লেখার জন্য তার সুযোগ্য সন্তান মুফতি তকি উসমানিকে দায়িত্ব দেন। অথচ তিনি তখন দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন! যদিও তখন পর্যন্ত তিনি নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শেষ করেননি; তারপরও মাওলানা শফি রহ.-এর নির্দেশক্রমে এ প্রশ্নের অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী ও অনুসন্ধানী জবাব দেন। এটিই এখন আপনাদের সামনে!

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

রমজানে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায়

মুফতি শফি-এর খেদমতে

প্রশ্ন : মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর একটি ফতোয়া 'আল জমিয়ত' শায়খুল ইসলাম সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। সেই ফতোয়ায় তিনি লিখেছেন, রমজান মাসে একে অপরকে ডাকাডাকির মাধ্যমে নফল ও তাহাজ্জুদ নামাজের জামাত আদায় করা উত্তম। আর মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. ফতোয়া রশিদিয়াতে লিখেছেন, রমজান মাসে একে অপরকে ডাকাডাকির মাধ্যমে নফল ও তাহাজ্জুদ নামাজের জামাত আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি। এ ফতোয়াকে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. অগ্রহণযোগ্য মতের ওপর নির্ভর করে বলা হয়েছে বলে আখ্যায়িত করেছেন। (প্রশ্নকর্তা বলেন) আমি এ ব্যাপারে বহু মুফতি ও আলেমের নিকট পত্র পাঠিয়েছি কিন্তু চিত্তপ্রশান্তিমূলক কোনো উত্তর আজ পর্যন্ত আমার হস্তগত হয়নি। এ মুহূর্তে আপনি ছাড়া আর কারও কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশাও করতে পারছি না! বড়ো বড় কীর্তিমান ও কর্মবীর আলেমগণ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। মাসআলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণে এক নতুন বিদাতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আমি নিজেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। গত রমজানে এখানে ষাট অথবা সত্তরজন আবার কখনো কখনো শতাধিক ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেছে। এর গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়ে গেছে। আমি সেই জামাতে শরিক হইনি এবং

কাউকে শরিক হতেও বলিনি। আবার কাউকে নিষেধও করিনি। অবশ্য কোনো কোনো বন্ধু এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করলে তাদের বলে দিতাম ফকিহগণ সাধারণভাবে জামাতের সঙ্গে নফল আদায়কে মাকরুহ বলেছেন। আমাদের কোনো আকাবিরকেও জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করতে শুনিনি। আমি মহোদয়ের কাছে আশা করছি মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর এ সংক্রান্ত প্রমাণসমূহের ব্যাপারে কলম ধরবেন। যদিও মহোদয়ের কষ্ট হবে; কিন্তু কোথাও এর চিত্তপ্রশান্তিকর জবাব না পেয়ে আপনার দ্বারস্থ হলাম।

প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর ফতোয়াটি সংযুক্ত করে দেওয়া হলো।

—মাহমুদ হাসান
করাচি।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর উত্তর[২৬]

'ফাতহুল কাদির' প্রথম খণ্ডের باب الاستسقاء অধ্যায়ের ৪৩৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

> وَقَدْ صَرَّحَ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ الْكَافِي بِقَوْلِهِ وَيُكْرَهُ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ جَمَاعَةً مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
>
> 'হাকেম রহ. কাফি গ্রন্থের সূর্যগ্রহণের নামাজের অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, রমজানের কিয়াম ও সূর্যগ্রহণের—নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা মাকরুহ। এটি শায়খুল ইসলাম যা বলেছেন তার বিপরীত মত।'

আর 'রদ্দুল মুহতার' প্রথম খণ্ডের ৫২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে

> وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ: إنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ اهـ وَالنَّفَلُ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لِأَنَّهُ لَمْ تَفْعَلْهُ الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.

---

[২৬] সৌজন্যে, আল জমিয়ত শায়খুল ইসলাম সংখ্যা।

'আমি বলি, 'বাদায়েউস সানায়ে' এর মধ্যে যা আছে তা এ মতটিকে শক্তিশালী করে। তাতে আছে, রমজানের কিয়াম ছাড়া অন্য সময় জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা সুন্নত নয়। জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় পছন্দনীয় নয়। কেননা, সাহাবিগণ রমজান মাস ছাড়া অন্য সময় জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করেননি।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে রমজানের কিয়াম সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এসব উদ্ধৃতির মধ্যে রমজানের কিয়ামকে কেবল তারাবির নামাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়নি। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং সাহাবিগণ থেকে রাতের শেষভাগ পর্যন্ত জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করার কথা উল্লেখ আছে। মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এ এ সংক্রান্ত বেশ কিছু রেওয়ায়েত আছে। তাই রমজান মাসে যত প্রকার নফল নামাজ পড়া হয়—চাই তা তারাবি হোক বা তাহাজ্জুদ হোক, রাতের শেষভাগে হোক আর শুরুভাগে হোক—সবগুলোকেই জামাতের সঙ্গে পড়ার অনুমতি দেওয়া হবে। 'মুয়াত্তা' ইমাম মুহাম্মাদ এ আছে—

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ تَطَوُّعًا بِإِمَامٍ، لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ.

'ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন—আমরা এই অভিমতই গ্রহণ করেছি যে, রমজানে ইমামের পেছনে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মুসলিমগণ এর ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।'[২৭]

ফাতহুল বারি চতুর্থ খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় فضل من قام فی رمضان অধ্যায়ে আছে—

قَامَ لَيَالِيَهُ مُصَلِّيًا وَالْمُرَادُ مَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ مُطْلَقُ الْقِيَامِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي التَّهَجُّدِ سَوَاءٌ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقِيَامِ لِأَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهَا وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِيُّ فَقَالَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ولكن اتفاق من أين أخذه بل المراد من قيام ما يحصل به مطلق القيام سواء كان قليلا أو كثيرا.

[২৭] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ।

'রমজানের রাতসমূহে নামাজে কিয়াম করা। কিয়ামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার মাধ্যমে সাধারণভাবে কিয়াম অর্জিত হয়। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছি; চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক না কেনো। আল্লামা নববি রহ. উল্লেখ করেছেন, রমজানের কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবির নামাজ। অর্থাৎ, এর দ্বারাই উদ্দিষ্ট কিয়ামে রমজান অর্জিত হবে। কেননা, তারাবির নামাজ ছাড়া রমজানের কিয়াম অর্জিত হতে পারে না। আর কিরমানি রহ. আশ্চর্য এক অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেন—ইসলামি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কিয়ামে রমজান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবির নামাজ। আল্লামা নববি রহ. উল্লেখ করেছেন, রমজানের কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবির নামাজ। কিন্তু ইসলামি বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য তিনি কোত্থেকে গ্রহণ করেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়, বরং কিয়ামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার মাধ্যমে সাধারণভাবে কিয়াম অর্জিত হয়; চাই সেটা পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক!

আল্লামা আইনি রহ. 'উমদাতুল কারি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৮১ পৃষ্ঠায় লেখেন—

> وَمعنى من قَامَ رَمَضَان: من قَامَ بِالطَّاعَةِ فِي ليَالِي رَمَضَان، وَيُقَال: يُرِيد صَلَاة التَّرَاوِيح، وَقَالَ بَعضهم: لَا يخْتَص ذَلِك بِصَلَاة التَّرَاوِيح بل فِي أَي وَقت صلى تَطَوّعا حصل لَهُ ذَلِك الْفضل.
>
> 'من قام رمضان' এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি রমজানের রাতসমূহে নফলে দাঁড়ায়। অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তারাবির নামাজ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন—কিয়াম তারাবির নামাজের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে-কোনো সময় নফল নামাজ পড়লে তার জন্য কিয়ামের ফজিলত অর্জিত হবে।'

'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ', 'ফাতহুল বারি' ও 'উমদাতুল কারি'র উদ্ধৃতির আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

১. জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় নিঃশর্তভাবে মাকরুহ নয়, বরং কিছু কিছু নামাজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

২. রমজানের কিয়াম ও সূর্যগ্রহণের নামাজ এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ রহ., হাকেম রহ. ও 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থকারসহ

পূর্ববর্তীদের অনেকেই রমজানের কিয়ামকে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামে রামাদান কেবল তারাবির সঙ্গে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ নয়।

৪. রমজানের কিয়ামকে তারাবির সঙ্গে বিশেষিত করার মতটি অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বল। এটি আল্লামা কিরমানি ও নববি রহ.-এর মতামত। তাদের এ মতের বিপরীতে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানি ও আল্লামা আইনি রহ. বলেছেন—রমজানের কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বপ্রকার নফল আমল, চাই সেটা তারাবি, তাহাজ্জুদ কিংবা অন্য কোনো নফল হোক না কেনো। তারা ইমাম নববি রহ.-এর উক্তিকে মূল বলে উল্লেখ করে তাকে নিজেদের উক্তির অনুকূলে আনার চেষ্টা করেছেন। তারা কিরমানির উক্তিকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। আর এটিই যুক্তির সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, 'ফতোওয়ায়ে রশিদিয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠা এবং প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রমজানের কিয়ামকে তারাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য অভিমতের ওপর ভিত্তিশীল। সুতরাং রমজান মাসে সর্বপ্রকার নফল নামাজের জামাত—চাই সেটা ডাকাডাকির মাধ্যমে হোক কিংবা ডাকাডাকি ছাড়া হোক—সবগুলোই অনুমোদিত ও মুস্তাহাব হবে এবং من قام رمضان এর মধ্যে গণ্য হবে। একে অস্বীকার করা সমীচীন হবে না। সর্বপ্রকার নফল ইবাদত, নফল তওয়াফ ও ওমরাহ এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আল্লামা আইনি রহ. এমনটিই উল্লেখ করেছেন।

আমরা কুতুবুল আলম হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-কে এমন আমল করতে দেখেছি। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহ.-কেও এভাবে আমল করতে দেখেছি। আর হারামাইন শরিফাইনের প্রাচীন আমল দশ দিনে কুরআনের খতম এর ওপরই ভিত্তিশীল। এটি শাফিয়ি মাজহাবের অভিমত অনুযায়ী হয়। আর মালিকি মাজহাব মতে চল্লিশ রাকাত নফল নামাজের আমলও এরই ওপর ভিত্তিশীল। আর মক্কাবাসীদের প্রাচীন আমল প্রতি চার রাকাত নামাজ আদায়ের পর সাত চক্কর তওয়াফ করার বিষয়টিও একই বার্তা বহন করে।

—হুসাইন আহমাদ মাদানি
দারুল উলুম দেওবন্দ।
১৯ জিলহজ্ব ১৩৭২ হি.

মাওলানা মুফতি শফি রহ.-এর পক্ষ থেকে পত্রের জবাব

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

শ্রদ্ধেয় জনাব,

আপনি যে বিষয়ে জানতে চেয়েছেন তা মাসআলাগত দিক থেকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর ফতোয়ার ওপর সমালোচনা একে এত গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে যে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন ছাড়া কলম ধরা অত্যন্ত মুশকিল ছিলো এবং রমজানে আমার দ্বারা এ কাজ হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিলো। এজন্য আমি এ কাজের দায়িত্ব আমার ছোটো ছেলে তকি উসমানির ওপর অর্পণ করি। সে এ বছর দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হবে। ধারণা ছিলো এতে তার অনুশীলন হবে এবং বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি বের করে দিলে আমি এ বিষয়ে কিছু লিখে দেবো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, ছেলে অত্যন্ত ধী শক্তির অধিকারী। সে আমার কোনো দিক নির্দেশনা ছাড়াই বহু কিতাবের উদ্ধৃতি বের করেছে এবং সেগুলোর আলোকে নিজেই একটি উত্তর লিখে দিয়েছে। আমি যখন তার প্রস্তুতকৃত জবাবটি নিরীক্ষণ করেছি তখন তা পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট পেয়েছি। তাই সত্যায়ন করে একেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ওয়াস্সালাম

—বান্দা মুহাম্মাদ শফি
৪ শাওয়াল, ৩১৭৮ হি.

মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর উত্তর

তারাবি, ইস্তেসকা ও সূর্য গ্রহণের নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজের জামাত যদি একে অপরকে ডাকাডাকির মাধ্যমে আদায় করা হয়, তাহলে সর্বাবস্থায় তা মাকরুহে তাহরিমি। চাই সেই নফলসমূহ রমজানে পড়া হোক কিংবা রমজান-ভিন্ন অন্য কোনো মাসে পড়া হোক। এটিই অধিকাংশ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের অভিমত। সালাফে সালিহিনের ফতোয়া এবং তাদের আমল এমনই ছিলো। এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

এক. 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থে আছে—

إِذَا صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى لَا بِجَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ، وَالتَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ بِجَمَاعَةٍ مَكْرُوهٌ

'লোকজন যদি তারাবি পড়ে, এরপর আবার তারাবি পড়ার ইচ্ছা করে, তাহলে তারা জামাতে না পড়ে একাকী পড়বে। কেননা, দ্বিতীয়বার পড়া হলো সাধারণ নফল। আর সাধারণ কোনো নফল জামাতের সঙ্গে আদায় করা মাকরুহ।'[২৮]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. বলেন—

وَلَوْ صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى.

'তারাবি নামাজ পড়ার পর যদি তারা একে দ্বিতীয়বার পড়ার ইচ্ছা করে, তাহলে একাকী পড়বে।'[২৯]

ফাতাওয়া আলমগিরিতে আছে—

ولو صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوها ثانيا يصلون فرادى كذا في التاتارخانية.

'তারাবি নামাজ পড়ার পর তারা যদি দ্বিতীয়বার একে পড়তে চায়, তাহলে একাকী পড়বে। ফাতাওয়া তাতারখানিয়ায় এমনটিই বর্ণিত আছে।'[৩০]

ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়ায় আছে—

صلوا بجماعة ثم أرادوا اعادتها بالجماعة يكره لأن النفل بجماعة على التداعى يكره إلا بالنص.

'লোকেরা জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করার পর যদি তারা পুনরায় একে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে চায়, তাহলে তা মাকরুহ হবে। কেননা, একে অপরকে ডাকাডাকি করার মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ। তবে কোনো নফলের ব্যাপারে যদি

[২৮] বাদায়েইস সানায়ে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯০।

[২৯] আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৪।

[৩০] আলমগিরি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১২৩।

শরিয়তের ভাষ্য ও স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে তাহলে একে জামাতের সঙ্গে আদায় করা যাবে।'[৩১]

আলোচ্য উদ্ধৃতিসমূহের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, জামাতের সঙ্গে তারাবির নামাজ পুনরায় পড়া জায়েজ নেই। আর 'বাদায়েউস সানায়ে' ও 'ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া'য় স্পষ্টভাবে এর কারণ বলে দেওয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয়বার আদায়কৃত তারাবির নামাজ এমন সাধারণ নফল যাকে জামাতের সঙ্গে আদায় করার কোনো প্রমাণ শরিয়তে নেই। আর যে নফলকে জামাতের সঙ্গে আদায় করার বিষয়টি প্রমাণিত নয় তা জামাতের সঙ্গে আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি। এর দ্বারা বুঝা গেলো, ফকিহগণের মতে একে অপরকে ডাকাডাকি করার মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা সর্বাবস্থায় মাকরুহ। চাই সেই নামাজ রমজান মাসে হোক কিংবা অন্য কোনো মাসে হোক। কেননা, রমজানের নফলসমূহ যদি সাধারণভাবে মাকরুহ হওয়ার নিয়মের ব্যতিক্রম হতো, তাহলে জামাতের সঙ্গে পুনরায় তারাবির নামাজ আদায় করা মাকরুহ হতো না।

দুই. আল্লামা তাহের ইবনু আবদুর রশিদ বুখারি রহ. 'খুলাসাতুল ফাতাওয়ায়' লেখেন—

ولو زاد على العشرين بالجماعة يكره عندنا بناء على أن صلاة التطوع بالجماعة مكروه.

'যদি জামাতের সঙ্গে তারাবির বিশ রাকাত নামাজের চেয়ে আরও বাড়িয়ে পড়া হয়, তাহলে আমাদের মতে মাকরুহ হবে। কেননা, জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ।'[৩২]

তিন. দুররুল মুখতারে আছে—

(وَلَا يُصَلِّي الْوِتْرَ وَ) لَا (التَّطَوُّعَ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي، بِأَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كَمَا فِي الدُّرَرِ.

'রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে বিতর ও তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করবে না। একে অপরকে ডাকাডাকির মাধ্যমে যদি এমনটি

[৩১] ফাতাওয়া আলমগিরির টীকায় ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়াহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১।
[৩২] খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩।

করা হয়, তাহলে মাকরুহ হবে। যেমন : চারজন ব্যক্তি একজনের এক্তেদা করলো। 'দুরার' নামক গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ আছে।'[৩৩]

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

وَالنَّفْلُ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لِأَنَّهُ لَمْ تَفْعَلْهُ الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.

'জামাতের সঙ্গে নফল আদায় পছন্দনীয় নয়। কেননা, সাহাবিগণ রমজান ছাড়া অন্য কোনো সময় জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করেননি।'[৩৪]

আল্লামা কাসানি রহ. লেখেন—

أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إِلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَفِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

'রমজানের কিয়াম ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা সুন্নত নয়। আর ফরজ নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা হয়তো ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।'[৩৫]

প্রখ্যাত মুহাক্কিক ইবনু হুমাম রহ. বলেন—

وَقَدْ صَرَّحَ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ الْكَافِي بِقَوْلِهِ وَيُكْرَهُ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ جَمَاعَةً مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ.

'হাকেম রহ. কাফি গ্রন্থের সূর্যগ্রহণের নামাজের অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, রমজানের কিয়াম ও সূর্যগ্রহণের নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা মাকরুহ।'[৩৬]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ হওয়ার হুকুম থেকে রমজানের কিয়ামকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তারাবি শব্দের পরিবর্তে قيام رمضان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যাপকতার কারণে সন্দেহ হতে পারে যে, এ বিধানটি কেবল রমজান ভিন্ন অন্য সময়ের

[৩৩] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৬৩।
[৩৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৬৪।
[৩৫] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৮।
[৩৬] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৮।

জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফকিহগণের পরিভাষায় قيام رمضان শব্দটি ব্যাপক নয়, বরং এটি কেবল তারাবির নামাজের সঙ্গে বিশেষিত। আমরা পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

চার. 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিক রহ.-এর ব্যাখ্যাকার শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহ. লেখেন—

قال الزرقانی رحمه الله ظاهره (أی حديث أفضل صلاتكم فی بيوتكم إلا المكتوبة) يشمل كل نفل لكنه محمول علی ما لا يشرع له التجميع كالتراويح والعيدين.

'আল্লামা জুরকানি রহ. বলেন—'ফরজ নামাজ ছাড়া শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো যা তোমাদের ঘরে আদায় করা হয়।' এই হাদিসটি সর্বপ্রকার নফল নামাজকে শামিল করে। কিন্তু এ বিষয়টি সেসব নফল নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শরিয়তে যেগুলোর জন্য জামাতের বিধান দেওয়া হয়নি।' যেমন : তারাবি ও দুই ইদের নামাজ।[৩৭]

শায়খ খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ. সুনানে আবু দাউদের ভাষ্যগ্রন্থে লেখেন—

فإن خير صلاة المرء وهذا عام لجميع النوافل والسنة إلا النوافل التی من شعائر الإسلام كالعيدين والكسوف والإستسقاء قلت وهذا يدل علی أن صلاة التراويح فی البيت أفضل والجواب عن الذين قالوا بأفضليتها فی المسجد جماعة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ذلك لخوف الإفتراض فإذا زال الخوف بوفاته عليه السلام ارتفع المانع وصار فعله فی المسجد أفضل فأشبه صلاة العيد.

'মুসল্লির শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো যা সে নিজের ঘরে আদায় করে। এ নির্দেশনাটি সকল নামাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; তবে সেসব নফল নামাজ ছাড়া যেগুলো ইসলামের প্রতীক। যেমন : দুই ইদ, সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ। এই কথাটা ওপর ইঙ্গিত বহন করে যে, তারাবির নামাজ ঘরে পড়া উত্তম। যারা তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে পড়া উত্তম বলে, তাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো,

[৩৭] আওজাজুল মাসালিক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে পড়া উত্তম এজন্য বলেছেন যে, তার জীবদ্দশায় মসজিদে পড়তে থাকলে হয়তো একে ফরজ করে দেওয়ার আশঙ্কা ছিলো। সুতরাং তার ইন্তিকালের মাধ্যমে যখন এ আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছে তখন প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়ে গিয়েছে যার ফলে একে মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা উত্তম বলে গণ্য হচ্ছে।' যেমন : ইদের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয়।[৩৮]

উল্লিখিত আলোচনাসমূহে তারাবি শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে; 'কিয়ামে রামাদান' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এর ব্যাপকতার কারণে বিধানটিও ব্যাপক হওয়ার সন্দেহ হবে।

পাঁচ. 'আল হিদায়া' গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ 'ইনায়া'য় আছে—

(فصل فى قيام شهر رمضان) ذكر التراويح فى فصل على حدة لإختصاصها بما ليس لمطلق النوافل

'রমজান মাসে কিয়ামের পরিচ্ছেদ' তারাবির নামাজের বিবরণ আলাদা একটি অধ্যায়ে এ কারণে লেখা হয়েছে যে, তা অন্যান্য সাধারণ নফল নামাজের মতো নয়।'[৩৯]

'আল বাহরুর রায়েকে' আছে—

وَسُنَّ فِي رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيَانٌ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا مَعَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ قَبْلَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ لِكَثْرَةِ شُعَبِهَا وَلِاخْتِصَاصِهَا بِحُكْمٍ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ وَهُوَ الْأَدَاءُ بِجَمَاعَةٍ

'তারাবির নামাজের বিবরণ' সাধারণ নফলসমূহের অধ্যায়ের আগে তারাবির নামাজকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাসমূহের সঙ্গে এজন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, এর শাখা-প্রশাখা অনেক। তাছাড়া তা অন্যান্য সুন্নত ও নফলের চেয়ে ভিন্ন একটি হুকুমের সঙ্গে বিশেষিত ও সম্পৃক্ত। সেই হুকুমটি হলো জামাতের সঙ্গে আদায় করা।'[৪০]

এর মাধ্যমে জানা গেলো, অন্যান্য সুন্নত ও নফল নামাজের মোকাবিলায়

---

[৩৮] বজলুল মাজহুদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৬।

[৩৯] ফাতহুল কাদির সংযুক্ত ইনায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৩।

[৪০] আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭১।

জামাতের সঙ্গে তারাবির নামাজ আদায় করা এ নামাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ছয়. 'ফাতাওয়া কাজিখানে' আছে—

ويستحب أدائها بالجماعة وقال مالك رحمه الله والشافعى رحمه الله فى القديم الإنفراد أفضل كسائر السنن وفيه بعد ذلك والصحيح أن أدائها بالجماعة فى المسجد أفضل لأن فيه تكثير الجماعة وكذالك فى المكتوبات

'জামাতের সঙ্গে তারাবির নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। ইমাম মালিক রহ. ও শাফিয়ি রহ. প্রথম দিকের উক্তিতে বলেন—অন্যান্য সুন্নতের মতো তারাবির নামাজও একাকী পড়া উত্তম। এরপর এতে আরও রয়েছে যে, বিশুদ্ধ কথা হলো তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করা উত্তম। কেননা, এতে জামাতে লোকদের অংশগ্রহণ বাড়ে। অনুরূপভাবে ফরজ নামাজ সমূহের মধ্যেও একই হুকুম।'

প্রথম উদ্ধৃতিতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তারাবি এবং জামাতের সঙ্গে আদায় করার জন্য শরিয়তের নির্দেশনা আছে এমন নফল ছাড়া অন্যান্য সকল নফলের ক্ষেত্রে আমরাও শাফিয়ি মাজহাবের প্রাচীন অভিমতের সঙ্গে একমত যে, এসব নফল একাকী পড়া উত্তম। আর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, জামাতের সঙ্গে আদায় করার বিধানে তারাবি ফরজ নামাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি রমজানের অন্য নফলসমূহকেও জামাতের সঙ্গে আদায় করা জায়েজ হতো, তাহলে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হতো।

সাত. মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. লেখেন—হাদিসে যেসব নফল নামাজের জামাত প্রমাণিত সেগুলো ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি। ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে আছে, যদি একে অপরকে ডাকাডাকির মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা হয়, তাহলে মাকরুহ হবে। আর ডাকাডাকি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কমপক্ষে চারজন ব্যক্তি হওয়া। সুতরাং সূর্যগ্রহণ, ইস্তেসকা ও তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা জায়েজ আছে। এগুলো ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজের জামাত জায়েজ নেই। ফিকহের গ্রন্থসমূহে এমনটিই লিপিবদ্ধ আছে।

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. শবিনার অনিষ্ট বর্ণনা করে লেখেন—যদি তারাবির পর এই আমল করা হয়, তাহলে বহু মানুষ মিলে জামাতের সঙ্গে নফল আদায় করার কারণে তা মাকরুহ হবে।'[৪১]

এসব মহান ব্যক্তি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তারাবির নামাজ ছাড়া রমজান মাসেও জামাতের সঙ্গে অন্য নফল নামাজ আদায় করা এমনই নাজায়েজ যেমন রমজান ছাড়া অন্য মাসে নাজায়েজ।

আট. এসব বিবরণ ছাড়া যুক্তিও এই দাবি করে যে, রমজান মাসেও জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। কেননা, তারাবির নামাজ নিয়ম-বহির্ভূত ও খেলাফে কিয়াস। কেননা, তারাবি নফল নামাজসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বপ্রকার নফল গোপনে পড়া উত্তম। ফরজসমূহের বিষয়টি ভিন্ন। এজন্য নফলসমূহকে কেবল জামাত ছাড়াই নয়, বরং ঘরে পড়া উত্তম। যেমন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন :

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هذا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

'কোনো ব্যক্তির জন্য ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজ আমার মসজিদে পড়ার চেয়ে ঘরে পড়া উত্তম।'[৪২]

এই আলোচনার মাধ্যমে বুঝা গেলো, তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা খেলাফে কিয়াস ও নিয়ম-বহির্ভূত। আর স্বীকৃত মূলনীতি হলো 'যে বিষয়টি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্রমাণিত হয় তা আপন উৎসেই সীমাবদ্ধ থাকে।' এর ওপর ভিত্তি করে অন্য কোনো মাসআলাকে এর হুকুমে অন্তর্ভুক্ত করা জায়েজ নেই। এখন দেখার বিষয় হলো নফল নামাজসমূহ জামাতের সঙ্গে আদায় করার ব্যাপারে প্রামাণ্য উৎস কী কী? শরিয়তের আলোকে নফল নামাজের জামাত যেসব নফলের ক্ষেত্রে প্রমাণিত সেগুলো হলো সূর্যগ্রহণের নামাজ, তারাবির নামাজ, ইস্তেসকার নামাজ ও দুই ইদের নামাজ। (যারা বলে ইদের নামাজ নফল তাদের মতে) রমজানের অন্য কোনো নফল নামাজ যেমন : তাহাজ্জুদ বা অন্য নামাজের ব্যাপারে কোথাও জামাতের সঙ্গে আদায় করার বিষয়টি বর্ণিত নেই। অবশ্য এ প্রকারের

[৪১] ইমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০০।

[৪২] আল মুজামুল কাবির-তাবারানি, হাদিস : ৪৮৯৩।

দু একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যেখানে একে অপরকে ডাকাডাকি না করেই জামাত সম্পন্ন হয়েছে। আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে সর্বাবস্থায়ই জায়েজ। ইবনু আব্বাস রা.-এর পসিদ্ধ ঘটনা যাতে ইবনু আব্বাস রা. বলেন—মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নফল নামাজে মশগুল ছিলেন। তখন আমি তার বাম দিকে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি আমাকে ধরে ডান দিকে নিয়ে এলেন। এ ঘটনায় মুক্তাদি কেবল ইবনু আব্বাস রা. ছিলেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. প্রণীত তিরমিজি শরিফের ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ আছে—

وبين التراويح والتهجد فى عهده عليه السلام لم يكن فرق فى الركعات بل فى الوقت والصفة أى التراويح تكون بالجماعة فى المسجد بخلاف التهجد.

'তারাবি ও তাহাজ্জুদের রাকাতে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোনো পার্থক্য ছিলো না। বরং পার্থক্য ছিলো সময় ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ, তারাবির নামাজ মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করা হতো। তবে তাহাজ্জুদ নামাজকে জামাতের সঙ্গে আদায় করা হতো না।'[৪৩]

মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. লেখেন—মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় তাহাজ্জুদের নামাজ একাকী পড়তেন। তিনি কখনো অন্যকে ডাকাডাকি করে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করেননি। তবে কোনো ব্যক্তি যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। যেমন : ইবনু আব্বাস রা. একবার নিজে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নফল নামাজে দাঁড়িয়েছেন। তবে তারাবির নামাজকে তিনি বেশ কয়েকবার অন্যদের ডেকে এনেও জামাতের সঙ্গে আদায় করেছেন।'[৪৪]

যখন আমরা জানতে পারলাম, নফল নামাজের জামাত কেবল তারাবি, সূর্যগ্রহণ, বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ ও দুই ইদের নামাজে শরিয়তে অনুমোদিত তখন এ হুকুমটি অন্য কোনো নফল নামাজে স্থানান্তরিত করা ঠিক হবে না।

---

[৪৩] আল আরফুশ শাজি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩০।

[৪৪] ফাতাওয়ায় রাশিদিয়া, পৃষ্ঠা : ৩০৭।

কেননা, সেগুলোর ব্যাপারে জামাতের সঙ্গে আদায় করার বিষয়টি বর্ণিত নয়। এজন্য শরিয়তে বর্ণিত কেবল এই কয়েক প্রকার নফল ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ একে অপরকে ডাকাডাকি করার মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে আদায় করা—চাই তা রমজানে হোক কিংবা অন্য কোনো মাসে—মাকরুহে তাহরিমি হবে।

কিয়ামে রামাদান বলতে যা বুঝায়

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. নিজ মতের সমর্থনে সেই উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করেছেন, যেগুলো তৃতীয় নম্বরে আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া তিনি 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিক রহ.-এর একটি উদ্ধৃতিও পেশ করেছেন। এসব উদ্ধৃতিতে জামাতের সঙ্গে আদায় করা যায় যেসব নফল সেগুলোর মধ্যে 'কিয়ামে রামাদান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর তিনি আল্লামা আইনি ও আল্লামা আসকালানি রহ.-এর উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তার উল্লেখকৃত উদ্ধৃতিসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, কিয়ামে রামাদান দ্বারা কেবল তারাবির নামাজ উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণভাবে প্রত্যেক নফল নামাজ যার মাধ্যমে কিয়াম অর্জিত হয়। এরপর তিনি উভয়টির ফলাফল এই বের করেছেন, ফকিহগণ 'কিয়ামে রামাদান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর আল্লামা আইনি ও আসকালানি রহ.-এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, 'কিয়ামে রামাদান' শব্দটি সকল নফল নামাজের জন্যই ব্যাপক। সুতরাং রমজানের প্রতিটি নফল নামাজই জামাতের সঙ্গে পড়া জায়েজ। কিন্তু 'কিয়ামে রামাদান' শব্দটি শাব্দিক বিবেচনায় যদিও ব্যাপক মনে হয় কিন্তু অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিসের পরিভাষায় এটি কেবল তারাবির নামাজের জন্য নির্দিষ্ট। তারাবি শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'কিয়ামে রামাদান' শব্দ ব্যবহার করার কারণ সম্পর্কে 'আল হিদায়া' গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা বাবিরতি রহ. বলেন—

وترجم بقيام رمضان إتباعا للفظ الحديث ، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه.

'কিয়ামে রামাদান' শব্দের মাধ্যমে শিরোনাম লেখা হয়েছে এই হাদিসের অনুসরণে যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য রমজানের রোজা ফরজ

করেছেন, আর আমি তোমাদের জন্য রমজানের কিয়াম সুন্নত করেছি।’[৪৫]

১. ‘রমজানের কিয়াম ছাড়া অন্যান্য নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা মাকরূহ।’ ফকিহগণের এই উক্তির উদ্দেশ্য ‘উমদাতুল কারি’ ও ‘ফাতহুল বারি’ থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে খোদ ফকিহগণের উক্তি থেকে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা, তাদের উক্তি আলোচ্য মাসআলায় শরয়ি ভাষ্যের মর্যাদা রাখে। কিন্তু ‘উমদাতুল কারি’ ও ‘ফাতহুল বারি’র বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য— من قام رمضان -এর ব্যাখ্যাদান। এজন্য আমরা এখানে ফকিহগণের এমন কিছু উদ্ধৃতি পেশ করবো যেগুলো জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করার মাসআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর ফকিহগণের এসব উদ্ধৃতি ও বিবরণ দ্বারা জানা যায়, তাদের কাছে জামাত সংক্রান্ত মাসআলায় ‘কিয়ামে রামাদান’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবির নামাজ। উদ্ধৃতিসমূহ নিম্নরূপ—

ক. আল্লামা মারগিনানি রহ. ‘আল হিদায়া’ গ্রন্থে فصل في التراويح বলার পরিবর্তে فصل في قيام رمضان শিরোনাম নির্ধারণ করে তারাবির নামাজের মাসআলা আলোচনা করেছেন। আর ‘আল হিদায়া’ গ্রন্থের ভাষ্যকারগণ যেমন : মুহাক্কিক ইবনু হুমাম রহ. এই শিরোনামের অধীনে কিয়ামে রামাদানের ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তারাবির নামাজের বিশদ ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছেন। ফাতহুল কাদিরে আছে—

(فصل في قيام رمضان) التراويح جمع ترويحة.

‘রমজানে কিয়ামের অধ্যায়’ তারাবি শব্দটি তারবিহাতুন-এর বহুবচন। আর আল্লামা বাবিরতি রহ. এ শিরোনাম উল্লেখ করেই তারাবির নামাজকে অন্যান্য সুন্নত ও নফল থেকে আলাদা উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করা শুরু করে দিয়েছেন।

খ. আলেমকুল শিরোমণি আল্লামা কাসানি রহ. ‘বাদায়েউস সানায়ে’ গ্রন্থে যেখানে ‘কিয়ামে রামাদান’ শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে কিছুদূর এগিয়ে ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তারাবি বলে। তিনি ফরজ ও

---

[৪৫] ফাতহুল কাদির টীকা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৩, নাসায়ি : ৫৫১০।

নফলসমূহের পার্থক্য বর্ণনা করে লেখেন—

وَمِنها أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إِلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَفِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

'পার্থক্যসমূহের একটি হলো 'কিয়ামে রামাদান' ছাড়া অন্যান্য নফল নামাজে জামাত সুন্নত নয়। আর জামাতের সঙ্গে ফরজ নামাজ আদায় করা ওয়াজিব অথবা সুন্নতে মুআক্কাদা।'

উপরিউক্ত আলোচনা উল্লেখ করার দুই লাইন পরই এই পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন—

وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الْجَمَاعَةَ سُنَّةً فِي التَّرَاوِيحِ بِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও সাহাবিগণের ঐকমত্য দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি, তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা সুন্নত।'[৪৬]

তাছাড়া তারাবির নামাজ জামাতের সঙ্গে পুনরায় আদায় করা জায়েজ না হওয়ার মাসআলা দ্বারাও প্রমাণিত হয়, 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থকার 'কিয়ামে রামাদান' দ্বারা তারাবির নামাজ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তিনি নফল নামাজের জামাতকে রমজান এবং রমজান ছাড়া অন্য মাসেও নাজায়েজ বলেছেন।

গ. আল্লামা শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. বলেন—

الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي كَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ : وَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَالصَّحِيحُ أَنْ يَنْوِيَ التَّرَاوِيحَ أَوْ قِيَامَ اللَّيْلِ.

'পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নিয়তের ধরন সম্পর্কে। ফকিহগণ এতে মতানৈক্য করেছেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো তারাবি কিংবা কিয়ামুল লাইল এর নিয়ত করবে।'[৪৭]

ঘ. ফাতাওয়া কাজিখানে আছে—

---

[৪৬] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৮।

[৪৭] মাবসুত-সারাখসি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৫।

إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز.

'যদি রমজানে তারাবি, ওয়াক্তি সুন্নত কিংবা কিয়ামুল লাইলের নিয়ত করে, তাহলে তা জায়েজ আছে।'[৪৮]

এসব আলোচনার মাধ্যমে মনে হয় 'তারাবি' ও 'কিয়ামে রামাদান' শব্দ দুটি সমার্থক। তারাবি নামাজের নিয়ত করার সময় 'তারাবি' কিংবা 'কিয়ামে রামাদান' শব্দ ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে।

২. বিভিন্ন হাদিস ও সাহাবিগণের উক্তিসমূহের মধ্যে যেখানে 'কিয়ামে রামাদান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও এর দ্বারা তারাবির নামাজই উদ্দেশ্য হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হতে পারে না। যেমন—

عن سلمان قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا.

'সালমান ফারসি রা. বলেন—আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শাবান মাসের শেষ দিবসে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন—লোকসকল, আজ তোমাদের কাছে একটি মহান ও বরকতপূর্ণ মাস সমাগত। এটি এমন এক মাস যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। মহান আল্লাহ এর রোজাগুলোকে ফরজ ও কিয়ামকে সুন্নত করেছেন।'[৪৯]

তা ছাড়া সুনানে নাসায়ির এক রেওয়ায়েতে এসেছে—

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ.

'মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর রমজানের রোজা ফরজ করেছেন, আর আমি তোমাদের জন্য এর কিয়ামকে সুন্নত করেছি।'[৫০] এই হাদিসেও কিয়াম দ্বারা তারাবির নামাজ ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য হতে পারে না।

---

[৪৮] ফাতাওয়া আলমগিরির পার্শ্বটীকা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৬।

[৪৯] কানজুল উম্মাল, হাদিস : ২৩৭১৪।

[৫০] সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২২১০।

কেননা, কিয়াম দ্বারা যদি তাহাজ্জুদ নামাজ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে পুনরায় قيامه تطوعا বলাটাই নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ তাহাজ্জুদ নফল হওয়ার ব্যাপারে রমজানের কী সম্পর্ক? নফল নামাজ রমজান এবং অন্য মাসেও হয়ে থাকে। অতএব, বুঝা গেলো এখানে কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবির নামাজ। এখানে কিয়াম দ্বারা তারাবির নামাজ উদ্দেশ্য নেওয়া এভাবেও শক্তিশালী হয় যে, ফকিহগণ এ হাদিসকে তারাবির নামাজের প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।[৫১]

عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مثله.

'সাহাবি সায়েব ইবনু ইয়াজিদ রা. বলেন—উমর, আলি, ও উসমান রা.-এর যুগে সাহাবিগণ তারাবির বিশ রাকাত নামাজ আদায় করতেন।'[৫২]

এই হাদিসের অগ্র-পশ্চাৎ প্রমাণ বহন করে যে, এর মধ্যকার কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবির নামাজ। আর হানাফি মাজহাবের অনুসারীগণ এই হাদিস দ্বারাই তারাবির নামাজ বিশ রাকাত হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন।

৩. হাদিসের ভাষ্যকারগণ সাধারণত 'কিয়ামে রামাদান' দ্বারা তারাবির নামাজই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। যেমন—

সহিহ মুসলিমে[৫৩] কিয়ামে রামাদানের ব্যাপারে এভাবে শিরোনাম[৫৪] লেখা হয়েছে—

باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح.

'কিয়ামে রামাদানের ব্যাপারে উৎসাহদানের অধ্যায়।' আর তা হলো তারাবি।'

---

[৫১] 'ফাতহুল কাদির' (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৩), 'বাজ্জাজিয়া' (পৃষ্ঠা : ৩১), 'মারাকিল ফালাহ' ও 'তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ (পৃষ্ঠা : ২৩৪)' গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ রয়েছে।

[৫২] বাইহাকি শরিফ, হাদিস : ৮৩৩, উমদাতুল কারি খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

[৫৩] হামাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৯।

[৫৪] যদিও সহিহ সহিহ মুসলিমের শিরোনাম লেখক নিজে লিপিবদ্ধ করেননি, কিন্তুএসব শিরোনাম নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি রহ. তিরমিজি শরিফের ভাষ্যগ্রন্থে লেখেন—

باب ما جاء فى قيام شهر رمضان أى التراويح

‘কিয়ামে রামাদান তথা তারাবির ব্যাপারে যেসব হাদিস এসেছে।’

শায়খ মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. তিরমিজি শরিফের তাকরিরে লেখেন—

باب فى قيام شهر رمضان هذا القيام كان عاما ثم اختص بالتراويح فمطلقه يراد به التراويح.

‘রমজান মাসের কিয়াম সম্পর্কে। এ কিয়াম ব্যাপক ছিলো, এরপর তারাবির নামাজের সঙ্গে বিশেষিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন স্বাভাবিকভাবে ‘কিয়ামে রামাদান’ শব্দটি উল্লেখ করলেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তারাবির নামাজ।

‘মুয়াত্তা’ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর সেই উদ্ধৃতি যা মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. তার জবাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তার অগ্র-পশ্চাতের মাধ্যমেও এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ‘কিয়ামে রামাদান’ শব্দ ব্যবহার করে মূলত তারাবির নামাজই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তার উক্তি হলো—

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ تَطَوُّعًا إِمَامٍ، لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ.

‘ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন—আমরা এ মতই গ্রহণ করি যে, রমজান মাসে ইমামের সঙ্গে নফল নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, মুসলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।’[৫৫]

এখানে জামাতের সঙ্গে নফল নামাজ আদায় করার ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হওয়ার যে দলিল পেশ করা হয়েছে তা কেবল তারাবির নামাজের মধ্যেই প্রয়োগ হতে পারে। তারাবির নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজের ওপর নয়। কেননা, তারাবির নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হওয়া

[৫৫] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, হাদিস : ২৪১।

তো দূরের কথা জামাতের সঙ্গে নফল আদায় করা হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণই বর্ণিত নেয়। কেননা, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণের সোনালি যুগসমূহে একে অপরকে ডাকাডাকির মাধ্যমে নফল নামাজের জামাত সংঘটিত হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মোটকথা, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তার মাধ্যমে সর্বাবস্থায় এ কথা প্রমাণ হয়ে যায়, ফকিহগণ যেখানে জামাতের সঙ্গে কিয়ামে রামাদানকে জায়েজ বলেছেন, এর মাধ্যমে মূলত তারা তারাবির নামাজই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যদিও হাদিসের মধ্যকার 'কিয়ামে রামাদান' তথা من قام رمضان-এর মধ্যে সর্বপ্রকার নামাজ ও ইবাদত ব্যাপকভাবে শামিল রয়েছে।

আলোচ্য মাসআলায় আল্লামা আইনি রহ.-এর অভিমত

উল্লিখিত আলোচনা ছিলো 'قيام الليل فى رمضان' বা রমজান মাসে রাতের বেলা কিয়াম সম্পর্কে। এ আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, জামাতের সঙ্গে রমজানের কিয়াম জায়েজ। এর দ্বারা তারাবির নামাজই উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনো কোনো হাদিস-বিশারদ কিয়ামে রামাদানকে ব্যাপক বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ.-এর উদ্ধৃতি শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে জানা যায়, আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ.-এর মাজহাব হলো রমজানে রাতের বেলা কিয়ামের বিষয়টি সকল ইবাদত-বন্দেগির জন্যই ব্যাপক। তারাবি এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগিও কিয়ামে রামাদানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি চিন্তা করা হয় তাহলে স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ.-এর এই উক্তি মূলত মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিস من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له -এর অধীনে এসেছে। এজন্য এর সারমর্ম হলো কিয়ামে রমজানের ভিত্তিতে যে সওয়াবের কথা এ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে তা কেবল তারাবির ওপরই নয়, বরং রমজানের প্রতিটি নামাজের ওপর যা এ মাসের রাতে আদায় করা হয়। এর সঙ্গে এই আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই যে, এ কিয়াম জামাতের সঙ্গে আদায় করা হবে না কি একাকী আদায় করা হবে। এ কারণেই আল্লামা আইনি রহ. এখানে জামাতের সঙ্গে আদায় সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই করেননি। তিনি এ

মাসআলার আলোচনা 'باب صلاة الليل' এ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—

صلوا أَيهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة.

'হে মানবসকল, তোমরা নিজেদের ঘরে নামাজ পড়ো। কেননা, ফরজ নামাজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ ঘরে পড়া সবচেয়ে উত্তম।'

এরপর তিনি লেখেন—

وَاسْتثنى من عُمُوم الحَدِيث عدَّة من النَّوَافِل، ففعلها فِي غير الْبَيْت أكمل، وَهِي: مَا تشرع فِيهَا الْجَمَاعَة: كالعيدين وَالِاسْتِسْقَاء والكسوف.

'হাদিসের ব্যাপকতা থেকে বেশ কিছু নফল বাদ দেওয়া হয়েছে যেগুলো ঘরের বাইরে পড়াই উত্তম। আর সেগুলো হলো শরিয়ত যেগুলোর ব্যাপারে জামাতকে অনুমোদন দিয়েছে। যেমন : দুই ইদের নামাজ, ইস্তেসকা ও সূর্যগ্রহণের নামাজ।' এর কয়েক লাইন সামনে গিয়ে তিনি লেখেন—

فَقَالَ الإِمَام حميد الدّين الضَّرِير: نفس التَّرَاوِيح سنة، أما أَدَاؤُهَا بِالْجَمَاعَة فمستحب.

'ইমাম হামিদুদ্দিন আজজরির বলেন—মূলত তারাবির নামাজ সুন্নত; কিন্তু একে জামাতের সঙ্গে আদায় করা মুস্তাহাব।'

আরও কয়েক লাইন সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন—

وَفِي (جَوَامِع الْفِقْه) : التَّرَاوِيح سنة مُؤَكدَة، وَالْجَمَاعَة فِيهَا وَاجِبَة، وَفِي (الرَّوْضَة) لِأَصْحَابِنَا: إِن الْجَمَاعَة فَضِيلَة. وَفِي (الذَّخِيرَة) لِأَصْحَابِنَا عَن أَكثر الْمَشَايِخ: إِن إِقَامَتهَا بِالْجَمَاعَة سنة على الْكِفَايَة.

'জাওয়ামিউল ফিকহে আছে, তারাবির নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। একে জামাতের সঙ্গে আদায় করা ওয়াজিব। আমাদের সঙ্গীগণ কর্তৃক প্রণীত 'আররওজা' গ্রন্থে আছে, জামাতের সঙ্গে তারাবির নামাজ আদায় করার মধ্যে ফজিলত রয়েছে। সঙ্গীগণ কর্তৃক সংকলিত 'আজজাখিরাহ' গ্রন্থে আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখের সূত্রে লিখিত আছে, জামাতের সঙ্গে তারাবির নামাজ আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া।'

আলোচনার সারমর্ম হলো, আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. যেখানে কিয়ামে রামাদানের ব্যাপকতার আলোচনা করেছেন, সেখানে জামাতের সঙ্গে আদায় করার আলোচনা করেননি। আর যেখানে জামাতের সঙ্গে আদায় করার আলোচনা করেছেন সেখানে যেসব নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করলে মাকরুহ হবে না সেসব নামাজের মধ্যে কিয়ামে রামাদানের আলোচনা করেননি, বরং তারাবি শব্দ উল্লেখ করেছেন। এজন্য তার উক্তির মাধ্যমে রমজান মাসের কিয়ামকে ব্যাপক বলে তারাবির নামাজ ছাড়া রমজানের অন্যান্য নফল নামাজের জামাত জায়েজ হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

আমাদের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এ ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। সকলের মতেই তারাবির নামাজের মধ্যেই কেবল জামাত জায়েজ। অবশ্য এখন প্রশ্ন হলো হাদিসের মধ্যে যে ফজিলতের কথা বলা হয়েছে তা কেবল তারাবির নামাজের জন্যই বিশেষিত নাকি অন্যান্য নামাজ পড়ার মাধ্যমেও এ সওয়াব অর্জিত হবে? এ ক্ষেত্রে আল্লামা আইনি রহ. ব্যাপকতার মতটি অবলম্বন করেছেন। আর আইনি রহ. কর্তৃক উল্লিখিত আল্লামা নববি এবং আল্লামা কিরমানি রহ.-এর দ্বিতীয় অভিমতের বিশদ বিবরণ দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ.—যিনি ওলামায়ে দেওবন্দের মাঝে বর্তমান যুগের আবু হানিফা হিসেবে খ্যাত—তার ফতোয়া অধিকাংশ ফকিহ, মুহাদ্দিস ও আলেমের তাহকিক এবং গবেষণার অনুকূলে। তার উক্তিকে অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করা আমাদের বোধগম্য নয়। রইলো হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ এবং শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহ.-এর আমল। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর আমল আমাদের জানা নেই। অবশ্য শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহ.-এর ব্যাপারে ভালোভাবে জানা আছে যে, তিনি প্রথমদিকে তাহাজ্জুদের নামাজ কাউকে ডাকাডাকি না করে এক দুইজনে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লোকজন যখন বেড়ে যেতে থাকে তখন মাকরুহ হওয়ার কারণে সারারাত তারাবি নামাজকেই প্রলম্বিত করতেন। প্রতিদিন আট দশ পারা তারাবির নামাজে জামাতের সঙ্গে পড়া হতো এবং তারাবির নামাজকে সেহরির সময় শেষ করা হতো। এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দেওবন্দে অনেক পাওয়া যাবে!

একটি বিনীত নিবেদন

পরিশেষে বিনীতভাবে নিবেদন করছি, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর মতো বড়ো ব্যক্তিত্ব, আমল ও আখলাকের ময়দানে সমুন্নত মর্যাদা ও ইলমের বিবেচনায় অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী মহান ব্যক্তিসত্তার বিষয়টিকে সামনে রাখলে এ মাসআলায় কলম ধরার দুঃসাহস করা বড়ো কোনো আলেমের জন্যও সমীচীন নয়। আমার মতো 'মক্তবের শিশু' এ বিষয়ে কলম ধরার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্। দেওবন্দি জামাতের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের শিক্ষা আমাদেরকে এই সরল পথ দেখিয়েছে যে, শরয়ি মাসআলাসমূহের মধ্যে মুক্তভাবে মত প্রকাশ করা শিষ্টাচার-বহির্ভূত নয়। তাছাড়া ছাত্রদের মতপ্রকাশ মূলত তাদের বুজুর্গ উস্তাজগণের অভ্যন্তরীণ ফয়েজ ও বরকতেরই ফল। এজন্য আমার তাহকিক ও তদন্তে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা আল্লাহর নামে লিখে দিয়েছি এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তিনি যেন আমাকে মহান পূর্বসুরী ও বুজুর্গদের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ বে-আদবি এবং অশিষ্টাচার থেকেও হেফাজত করেন। আমিন!

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

শিক্ষার্থী : দারুল উলুম করাচি-১

৩ শাওয়াল, ১৩৭৮ হি. ১৩ এপ্রিল ১৯৫৯ খ্রি.

মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান মুফতি শফি রহ.-এর সত্যায়ন

لله در المجيب حيث أصاب فيما أجاب وأجاد فيما افاد مع ملاحظة أدب الأكابر وفقه الله تعالى ليحب ويرضى.

'জবাবদাতার জবাব দানের শৈলীতে আমি আনন্দিত। সে আকাবির-আসলাফের আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ রেখে অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিক জবাব দিয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে তার মর্জি মোতাবেক আরও বহু কর্ম ও কীর্তি আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন।'

—বান্দা মুহাম্মাদ শফি

সদর, দারুল উলুম করাচি-১

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

সরকার যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত ও উশর আদায় করার অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলো এবং এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো তার ওপর চিন্তাভাবনা করার জন্য 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেসব অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন—

১. মাওলানা মুফতি রশিদ আহমাদ,
মুফতি ও মুহতামিম : দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ নাজেমাবাদ, করাচি।

২. মাওলানা মুফতি ওলি হাসান,
মুফতি : জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরি টাউন, করাচি।

৩. মাওলানা মুফতি তকি উসমানি,
মুফতি : দারুল উলুম, করাচি।

৪. মাওলানা ডাক্তার আবদুর রাজ্জাক ইস্কান্দর,
উস্তাজ ও নাজেমে তালিমাত : জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরি টাউন, করাচি।

৫. মাওলানা মুফতি সাবহান মাহমুদ,
মুফতি ও শায়খুল হাদিস : দারুল উলুম, করাচি।

৬. মাওলানা মুফতি আবদুর রাউফ,
মুইনে মুফতি : দারুল উলুম, করাচি।

এ 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যা লেখা হয়েছিলো তাই এখন আপনাদের সামনে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

প্রথম অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান

পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত ও উশর উসুল করা এবং এগুলোকে বণ্টন করার জন্য এমন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলো যার মাধ্যমে মুসলিমদের আদায়যোগ্য জাকাতের একটি অংশ রাষ্ট্র উসুল করে তা বণ্টন করার ব্যবস্থা করবে।

জাকাত উসুল করে তা বণ্টন করার ব্যবস্থা করা ইসলামি রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাষ্ট্র যদি এ ব্যবস্থাপনা শরয়ি বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সফল হয়, তাহলে তা শরয়ি বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি উত্তম ও ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের মুসলিমগণ এর ইহ ও পরকালীন বরকত লাভে ধন্য হতে পারবে। কিন্তু এ ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করার সময় সরকারকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাকাতের বিধান কার্যকর করা যতটা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই নাজুক ও স্পর্শকাতর। জাকাত অন্যান্য কর ট্যাক্সের মতো কোনো ট্যাক্স নয়, বরং এটি এমন এক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত যাকে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য এর মধ্যে মহান আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগির সব ধরনের দাবির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

জাকাত উসুল করা এবং তা বণ্টন করার ব্যবস্থাপনার ভার রাষ্ট্র নিজের জিম্মায় নিয়ে এমন এক গুরুভার আপন মাথায় তুলে নিচ্ছে যা তাকে দীনি উদ্দীপনা, নিষ্ঠা ও সুব্যবস্থাপনার জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে একদিকে এ বিষয়ের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখতে হবে যে, জাকাত উসুল করার সময় যেন কোনো মুসলিমের সঙ্গে বে-ইনসাফি না হয়ে যায় এবং যত টাকা তার জিম্মায় আদায় করা ওয়াজিব তার চেয়ে এক পয়সাও যেন অতিরিক্ত উসুল করা না হয়। কেননা, হাদিস শরিফে এসেছে—

المعتدى فى الصدقة كمانعها.

> 'জাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর মতোই।'[৫৬]

আর অপরদিকে এ বিষয়েও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আদায়কৃত জাকাতের এ পবিত্র টাকা যেন শতভাগ শরিয়া মোতাবেক তার প্রকৃত হকদারদের কাছে পৌঁছে এবং তাতে কোনো ধরনের খেয়ানত, কাটছাঁট, অনৈতিকতা ও আত্মসাৎ হতে না পারে। জাকাত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি এর মাধ্যমেও অনুমান করা যায় যে, মহান আল্লাহ এর ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করার দায়িত্ব আলেমগণের ওপর ছেড়ে দেননি, বরং তিনি নিজেই পবিত্র কুরআনে এ খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত জাকাতকে তার সঠিক খাতে ব্যয় করার চিত্ত প্রশান্তিকর ব্যবস্থা না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাকাতের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে না। অতএব, রাষ্ট্র যদি জাকাত উসুল করে তা সঠিকভাবে বণ্টনে সফল হয়, তাহলে তা তার অন্যতম কীর্তি ও কর্ম বলে গণ্য হবে; যার সুফল ও বরকত খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করা যাবে।

কিন্তু জাকাতের এ পবিত্র টাকা-পয়সা যদি প্রকৃত হকদারদের কাছে পৌঁছানোর শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে হাজারও মুসলিমের ইবাদত-বন্দেগি নষ্ট হওয়ার ক্ষতি ইহ ও পরকালে সরকারের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আমরা দোয়া করি, মহান আল্লাহ সরকারকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার পথ সহজ করে দিন।

এ উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ এই হওয়া উচিত যে, জাকাত

---

[৫৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৫৮৫।

ও উশরের যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে তা যেন সঠিক হয় এবং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোনো ধরনের দুর্বলতা বাকি না থাকে। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ এই হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, এ আইন অনুযায়ী কর্মও যেন সঠিক হয়। এ আইনটির ব্যাপারে 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর অধিবেশনে বর্তমান জাকাত ও উশরের অর্ডিন্যান্সের ওপর গবেষণা করা হয় এবং শরয়ি নীতিমালার আলোকে তা যাচাই বাছাই করার পর অধিবেশনের সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। তারই সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ—

জাকাতের নিসাব

পাকিস্তান সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সটির সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হলো এর মধ্যে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ওপর জাকাত দেওয়া অবধারিত করা হয়েছে জাকাত বিয়োগ করার দিন যার ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকার চেয়ে বেশি টাকা সঞ্চিত থাকে। আর ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই এক হাজার টাকার শর্তও আরোপ করা হয়নি, বরং আসবাবপত্রের মালিক ব্যক্তিদের তাদের আসবাবপত্রের মূল্যমানের প্রতি লক্ষ না করে আবশ্যকীয়ভাবে জাকাত প্রদানের যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শরয়ি দৃষ্টিকোণে এ এক চরম ভুল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উক্ত আইনের মাধ্যমে বহু লোকের সঙ্গে এই বাড়াবাড়ি হতে পারে যে, তাদের ওপর শরয়ি দৃষ্টিকোণে জাকাত ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে জাকাত কেবল ওই ব্যক্তির ওপর ফরজ, যে ব্যক্তি জাকাতের নিসাব তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা এর মূল্যের সমপরিমাণ নগদ টাকা বা স্বর্ণ অথবা ব্যবসায়িক পণ্যের মালিক হয়। এই চার বস্তুর কোনো একটি কিংবা সবগুলোর সমষ্টির মূল্যও যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্যের হয়, তাহলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর জাকাত দেওয়া ফরজ। অবশ্য কোনো ব্যক্তির কাছে যদি স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো জিনিস না থাকে, তাহলে তার নিসাব হবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ। জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে যদিও এটি জরুরি নয় যে, প্রতিটি সম্পদের ওপর পৃথক পৃথকভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে; কিন্তু এটি অবশ্যই জরুরি যে, সেই ব্যক্তি বছরের শুরু এবং শেষে নিসাব পরিমাণ

সম্পদের মালিক থাকতে হবে। কিন্তু সরকারি অর্ডিন্যান্সে এসব মৌলিক শর্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি।

এজন্য জাকাতের এ বিধান ও ব্যবস্থাপনাকে যদি শরয়ি নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে অর্ডিন্যান্সে এমন কিছু সংশোধনী আনা আবশ্যক হবে যার ভিত্তিতে জাকাত কেবল সেসব লোকের কাছ থেকেই আদায় করা যাবে প্রকৃতপক্ষেই যাদের দায়িত্বে জাকাত দেওয়া ফরজ। এর প্রায়োগিক পদ্ধতি এই হবে যে, দ্বিতীয় দফার ২৩ নং অনুচ্ছেদে 'নিসাবের মালিক'-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাতে সংশোধনী আনতে হবে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'নিসাবের মালিক' হলো ওই ব্যক্তি যার দায়িত্বে এ অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতা বলে জাকাত আদায় করা আবশ্যক হয়।' এ সংজ্ঞা পরিবর্তন করে তাতে সংস্থাপন করতে হবে, 'নিসাবের মালিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমমূল্যের নগদ টাকা বা স্বর্ণ অথবা ব্যবসায়িক পণ্য থাকে। অথবা এই চার বস্তুর থেকে কোনো একটি অথবা সবগুলোর সমষ্টি মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যমানের বরাবর হয়।'

এরপর প্রতিবছর জাকাত আদায়ের তারিখের আগে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের যে মূল্য হবে তা ঘোষণা করে এর মূল্যকে জাকাত উসুলের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। কেবল সেসব লোক থেকেই জাকাত আদায় করা যাবে যাদের কাছে সংজ্ঞায় উল্লিখিত পরিমাণ সম্পদ ব্যাংক কিংবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত থাকবে।

এক বছর অতিবাহিত হওয়া

জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য জরুরি হলো নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার অর্থ হলো যখন কোনো ব্যক্তি একবার নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং বছর শেষ হওয়ার পরও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে (বছরের মাঝখানে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো একেবারে নিঃশেষ না হওয়া) তাহলে বছর শেষে সেই ব্যক্তি যত পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকবে তার সমুদয় সম্পদের ওপর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। সেই সম্পদের কোনো একটি অংশ একদিন আগেও যদি তার

জিম্মায় আসে, তাহলেও বিধানে কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং জাকাতযোগ্য প্রত্যেক সম্পদের ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরি নয়।

জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের অধীনে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব যে, যে তারিখে কোনো ব্যক্তির ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত কেটে নেওয়া হবে সে এর মাত্র কয়েকদিন আগেই জাকাতের নিসাবের মালিক হয়েছে। এই অবস্থায় এ বছর এই ব্যক্তি থেকে জোরপূর্বকভাবে জাকাত কেটে নেওয়া শরয়ি দৃষ্টিকোণে সঠিক নয়।

সুতরাং এ অর্ডিন্যান্সে এমন অবকাশ থাকা জরুরি যে, যদি কোনো ব্যক্তি এ কথা প্রমাণ করতে পারে যে, সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর থেকে এখনো এক বছর পুরো হয়নি; তাহলে তার ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত কেটে নেওয়া হবে না।

ঋণের মাসআলা

সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সে ঋণজাত সম্পদকে জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। এ ব্যাপারে ফকিহগণের মাজহাবসমূহের সারমর্ম এই যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে সর্বপ্রকার ঋণ বিয়োগ করার পর কেবল অবশিষ্ট সম্পদের জাকাত দেওয়া ফরজ। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এরও একটি মত অনুরূপ। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে ঋণ اموال باطنه বা অভ্যন্তরীণ সম্পদের (সোনা-রুপা ইত্যাদি) জাকাতের ক্ষেত্রে অন্তরায়; কিন্তু اموال ظاهرة বা বাহ্যিক সম্পদের (যেমন : পশু, ক্ষেতের শস্য, গরু, উট) পশু অন্তরায় নয়। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর পরবর্তী মত হলো জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে কোনো প্রকার ঋণই বিয়োগ করা হবে না।

সাম্প্রতিক অবস্থা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জীবনোপকরণের আবশ্যিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে তার ঋণ বিয়োগ না করলে ওই ব্যক্তির ওপর জুলুম হবে। অবশ্য এ মাসআলা সবসময়ই আলেমগণের কাছে ভাবনার ও গবেষণার বিষয় রয়ে গেছে যে, আজকাল বড়ো বড়ো পুঁজিপতি নিজেদের উৎপাদন ও মুনাফা লাভের খাত সম্প্রসারিত করার জন্য বড়ো অংকের ঋণ গ্রহণ করে থাকে। যদি এ প্রকার ঋণকে জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ

করা হয়, তাহলে কোনো কোনো অবস্থায় এসব ব্যক্তির ওপর হয়তো কখনোই জাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে না। আর এটি শরিয়তের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এজন্য এ জাতীয় ঋণের ক্ষেত্রে যদি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাবের ওপর আমল করে এ কথা বলা হয় যে, এসব ঋণ জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে না, তাহলে যথার্থ হবে বলে মনে করি।[৫৭]

১৩৯৯ হিজরির ১২ রবিউল আউয়ালে জাকাতের এ অর্ডিন্যান্সের যে প্রচারপত্র জনমত যাচাই করার জন্য বিলি করা হয়েছিলো তার মধ্যেও জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ঋণকে বাদ দেওয়া হয়েছিলো এবং এর ওপর গবেষণা করে 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-ও এ মতই ব্যক্ত করেছিলো।[৫৮]

অতএব, মজলিসের প্রদত্ত অভিমত অনুযায়ী জাকাতের নিসাব পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া এবং ঋণের ব্যাপারে তাদের প্রস্তাবনাকে সামনে রেখে অর্ডিন্যান্সের তৃতীয় দফার বিবরণ এভাবে হওয়া উচিত—

'অর্ডিন্যান্সের অন্যান্য বিধানের অনুসারী, নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি থেকে, শিডিউল নম্বর ১-এ প্রদত্ত বিধি মোতাবেক ,জাকাতবর্ষ শেষ হওয়ার পর আবশ্যকীয়ভাবে জাকাত উসুল করা হবে। তবে শর্ত হলো, যে ব্যক্তি এ কথা প্রমাণ করতে পারবে যে, জাকাত আদায়ের দিন তার জাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি তার সম্পদ থেকে জাকাত আদায় করা হবে না। অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত হলো, যে ব্যক্তি এ কথা প্রমাণ করতে পারবে যে, সে ঋণী। এই ঋণ কোনো উৎপাদন-কার্য বা মুনাফা লাভ করার জন্য সে করেনি। এমন ব্যক্তির ঋণ জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে।

---

[৫৭] এ ক্ষেত্রে আরও একটি মত প্রসিদ্ধ যা শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) ইসলাম আওর জাদিদ মায়িশাত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তা হলো : ঋণ নিয়ে যেসব সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে তার মধ্য থেকে শুধু সেসব সম্পদের মূল্য মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ করা হবে। যেগুলো নিজেই জাকাতযোগ্য সম্পদ যেমন : ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদি। আর যেসব সম্পদ নিজে জাকাতযোগ্য সম্পদ নয় যেমন : ব্যবসায়িক-পতিষ্ঠানের ঘর, মেশিনারিজ ইত্যাদি এগুলোর মূল্য মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ করা হবে না।

[৫৮] মাসিক বায়্যিনাত, জুমাদাস সানিয়া, ১৩৯৯ হিজরি, পৃষ্ঠা : ৮।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদ

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার ওপর একটি যুক্তিসংগত ও জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সংগত যে, ফকিহগণের স্পষ্ট অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য : أموال ظاهرة বা দৃশ্যমান সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করার অধিকার রয়েছে কিন্তু أموال باطنه বা অদৃশ্যমান সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করার অধিকার তার নেই। সাধারণত মুক্তভাবে চারণভূমিতে বিচরণ করে খায় এমন পশু, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচার উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি এবং এমন ব্যবসায়-সম্পদ যা শহর থেকে বাইরে স্থানান্তর করা হয় সেগুলোকে ফকিহগণ দৃশ্যমান সম্পদ বলে গণ্য করেছেন। আর নগদ টাকা-পয়সা, অলঙ্কারাদি ও জাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদকে অদৃশ্যমান সম্পদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট যেহেতু নগদের আকৃতিতে থাকে তাই যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত এ প্রশ্ন গবেষণার যোগ্য যে, রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে জাকাত উসুল করার অধিকার রাখে কি না? এ মাসআলায় চিন্তাভাবনা করার পর মজলিসের অধিবেশন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'আজকালকার ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে দৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে গণ্য করা যায়।

এ মাসআলার বিশদ বিবরণ এই যে, মহানবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ফারুক রা.-এর যুগে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিলো না। উভয় প্রকার সম্পদ থেকেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাকাত উসুল করা হতো। কিন্তু উসমান রা.-এর খিলাফতকালে জাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তিনি অনুভব করেন, যদি জাকাত উসুলকারীগণ সাধারণ লোকদের ঘরে ঘরে ও দোকানে দোকানে গিয়ে তাদের মাল-সম্পদ অনুসন্ধান করে, তাহলে লোকদের কষ্ট হবে এবং এ কারণে তাদের ঘরবাড়ি, দোকান-পাট, গুদামসমূহ ও সংরক্ষিত ব্যক্তিগত স্থানসমূহের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তখন তিনি এই ফরমান জারি করেন যে, কেবল সেসব সম্পদের জাকাত সরকারিভাবে উসুল করা হবে যেগুলোর জাকাত গ্রহণ করতে এসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না এবং যেগুলোর হিসাব করার জন্য ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের তালাশে যেতে হবে না। আর সেসময় এমন সম্পদ কেবল দুই প্রকার তথা পশুসম্পদ ও ক্ষেত-খামারের উৎপন্নজাত ফসল ছিলো। তাই তিনি এগুলোর জাকাত সরকারিভাবে উসুল করার ঘোষণা দিলেন এবং

বাকি সম্পদকে অদৃশ্যমান সম্পদ বলে আখ্যা দিয়ে এগুলোর জাকাত আদায়ের দায়িত্ব খোদ মালিকদের ওপর ন্যস্ত করলেন।

পরবর্তী সময়ে যখন উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ.-এর যুগ এলো তখন তিনি শহরসমূহের বাইরে চৌকি স্থাপন করলেন। যখন কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়িক সম্পদ নিয়ে এদিক দিয়ে যেতেন তখন তার কাছ থেকে জাকাত উসুল করে নেওয়া হতো। এখানে শহর থেকে বাইরে রফতানির বাণিজ্যিক সম্পদকেও দৃশ্যমান সম্পদ বলে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, রাষ্ট্রকে এসব সম্পদের জাকাত উসুল করা এবং এর হিসাব করার জন্য মালিকদের ঘর, দোকান ও সংরক্ষিত স্থানসমূহে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজন ছিলো না।

আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ফকিহগণের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করা হলো :

১. আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. লেখেন—

ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الْآيَةَ تُوجِبُ حَقَّ أَخْذِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ، وَعَلَى هَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْخَلِيفَتَانِ بَعْدَهُ، فَلَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ وَظَهَرَ تَغَيُّرُ النَّاسِ كَرِهَ أَنْ تُفَتِّشَ السُّعَاةُ عَلَى النَّاسِ مَسْتُورَ أَمْوَالِهِمْ فَفَوَّضَ الدَّفْعَ إِلَى الْمُلَّاكِ نِيَابَةً عَنْهُ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يُسْقِطُ طَلَبَ الْإِمَامِ أَصْلًا، وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاتَهُمْ طَالَبَهُمْ بِهَا .

'মহান আল্লাহর বাণী خذ من أموالهم صدقة-এর বাহ্যিক অর্থ এটি আবশ্যক করে তোলে যে, জাকাত গ্রহণ করার একচ্ছত্র অধিকারী সময়ের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান। এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরের দুই খলিফা। এরপর যখন উসমান রা. রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তখন তিনি এটি অপছন্দ করেন যে, জাকাত উসুলকারীগণ মানুষের গোপন সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হোক। এ কারণে তিনি সম্পদের মালিকদেরকেই তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের জাকাত প্রদানের দায়িত্ব দেন। উসমান রা.-এর এ অভিমতের সঙ্গে কোনো সাহাবি দ্বিমত পোষণ করেননি। এটি ইমামের জন্য রাষ্ট্রিয়ভাবে জাকাত উসুল করার অধিকারকে কোনোভাবেই খর্ব

করে না। এজন্য যদি জানা যায়, কোনো শহরের অধিবাসীরা জাকাত প্রদান করে না, তাহলে তিনি তাদের কাছে জাকাত চাইতে পারবেন।'[৫৯]

২. ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. লেখেন—

وقوله تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقة يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَخْذَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْإِمَامِ وَأَنَّهُ مَتَى أَدَّاهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْإِمَامِ قَائِمٌ فِي أَخْذِهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى إِسْقَاطِهِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَجِّهُ الْعُمَّالَ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا عَلَى الْمِيَاهِ فِي مَوَاضِعِهَا.

'মহান আল্লাহর বাণী خذ من أموالهم صدقة এর ওপর ইঙ্গিত বহন করে যে, জাকাত গ্রহণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। যার ওপর জাকাত দেওয়া ওয়াজিব এমন ব্যক্তি যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে গরিব-মিসকিনকে জাকাত দিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য তা জায়েজ হবে না। কেননা, জাকাত গ্রহণ করার অধিকার ইমামের জন্য বলবৎ রয়েছে; তাই তা রহিত করা যাবে না। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাকাত উসুলের কর্মকর্তাদেরকে পশুর জাকাত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, তারা যেন পশুগুলোর পানি পান করানোর স্থান থেকে জাকাত আদায় করে।'[৬০]

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি লেখেন—

وَأَمَّا زَكَوَاتُ الْأَمْوَالِ فَقَدْ كَانَتْ تُحْمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، ثُمَّ خَطَبَ عُثْمَانُ فَقَالَ: هَذَا شَهْرُ زَكَوَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ» فَجَعَلَ لَهُمْ أَدَاءَهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَسَقَطَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَقُّ الْإِمَامِ فِي أَخْذِهَا؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَقْدَهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ نَافِذٌ عَلَى الْأُمَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ»، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ بَعَثَ سُعَاةً عَلَى زَكَوَاتِ الْأَمْوَالِ كَمَا بَعَثَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَالثِّمَارِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَمْوَالِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِلْإِمَامِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ مَخْبُوَّةً

[৫৯] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৭।

[৬০] আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৪।

فِي الدُّورِ، وَالْحَوَانِيتِ، وَالْمَوَاضِعِ الْحَرِيزَةِ، وَلَمْ يَكُنْ جَائِزًا لِلسُّعَاةِ دُخُولُ أَحْرَازِهِمْ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَلِّفُوهُمْ إِحْضَارَهَا...... وَلَمَّا ظَهَرَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ عِنْدَ التَّصَرُّفِ بِهَا فِي الْبُلْدَانِ أَشْبَهَتْ الْمَوَاشِيَ فَنُصِبَ عَلَيْهَا عُمَّالٌ يَأْخُذُونَ مِنْهَا مَا وَجَبَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلِذَلِكَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِمَّا يَمُرُّ بِهِ الْمُسْلِمُ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ.

'জাকাতের সম্পদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। একদিন উসমান রা. ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, 'এটি তোমাদের জাকাত প্রদানের মাস। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় সে যেন তা পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পদের জাকাত আদায় করে।' তিনি এ ভাষণে জনসাধারণকে তাদের জাকাত গরিব-মিসকিনদের দেওয়ার অনুমতি দান করেন। আর এ কারণে রষ্ট্রপ্রধানের জাকাত গ্রহণ করার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। কেননা, এটি এমন এক কাজ যা একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান করেছেন। তাই তা উম্মাহর ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তির কারণে কার্যকর হয়ে গেছে যে, 'উম্মাহর উর্ধ্বতন ব্যক্তিগণ তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পন্ন করতে পারবেন।' আর আমাদের কাছে এমন কোনো সংবাদ পৌঁছেনি যে, তিনি অভ্যন্তরীণ সম্পদের জাকাত গ্রহণ করার জন্য লোকদের কাছে উসুলকারী কর্মকর্তা পাঠিয়েছেন; যেমনটি তিনি পশুসম্পদ ও ফল-ফসলের জাকাত গ্রহণ করার জন্য পাঠিয়েছেন। কেননা, সকল অভ্যন্তরীণ সম্পদই রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে অদৃশ্যমান। সেগুলো হয়তো ঘরবাড়ি, দোকান-পাট ও সংরক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত থাকে। আর জাকাত উসুলকারীদের জন্য সেসব সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করার অধিকার নেই। অনুরূপভাবে তাদের জন্য এই অধিকারও নেই যে, তারা এসব সম্পদ তাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করবে। কিন্তু যখন এসব সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করার কারণে দৃশ্যমান হয়ে গেলো তখন সেগুলোর ওয়াজিব জাকাত গ্রহণ করার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হলো। এজন্যই উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. তার কর্মকর্তাদের কাছে পত্র লিখলেন,

তারা যেন মুসলিমগণ যে ব্যবসায়-সম্পদ নিয়ে তাদের চৌকির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সে সম্পদের জাকাত গ্রহণ করে। তারা প্রতি বিশ দিনার স্বর্ণমুদ্রা থেকে অর্ধ দিনার জাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে।'[৬১]

৩. ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল এখতিয়ার'-এ আছে—

لِأَنَّ الْأَخْذَ كَانَ لِلْإِمَامِ، وَعُثْمَانُ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فَوَّضَهُ إِلَى الْمُلَّاكِ، وَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ طَلَبِ الْإِمَامِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاتَهُمْ طَالَبَهُمْ بِهَا، وَلَوْ مَرَّ بِهَا عَلَى السَّاعِي كَانَ لَهُ أَخْذُهَا.

'জাকাত গ্রহণ করার অধিকার ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য সংরক্ষিত। আর উসমান রা. এ দায়িত্ব জাকাতপ্রদানকারী মালিকদের কাছে ন্যস্ত করেছেন। এটি ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধানের চাওয়ার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে না। এমনকি যদি কোনো শহরের অধিবাসীদের ব্যাপারে জানা যায়, তারা নিজেদের সম্পদের জাকাত আদায় করে না, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের থেকে জাকাত চেয়ে নেবেন। আর এসব ব্যক্তি যদি জাকাত উসুলকারীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তাদের জন্য জাকাত উসুল করার অধিকার রয়েছে।'[৬২]

৪. আর 'আল হিদায়া' গ্রন্থকার লেখেন—

ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها « لقلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته.

'যে ব্যক্তি উশর আদায়কারীর পাশ দিয়ে একশো দিরহাম নিয়ে অতিক্রমকালে তাকে সংবাদ দেয় যে, তার ঘরে আপন মালিকানায় আরও একশো দিরহাম রয়েছে, যেগুলোর ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাহলে সে যে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করছে সেগুলো (নিসাবের চেয়ে) কম হওয়ার কারণে জাকাত প্রদান করবে না। আর তার বাড়িতে যা রয়েছে তা উসুলকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।'[৬৩]

---

[৬১] আহকামুল কুরআন-জাস্সাস, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

[৬২] আল ইখতিয়ার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০০।

[৬৩] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩৬।

ফকিহগণের উল্লিখিত দ্ব্যর্থহীন আলোচনাসমূহের আলোকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নগদ টাকা-পয়সা এবং ব্যবসায়-সম্পদ সেই সময় পর্যন্ত অদৃশ্যমান সম্পদ বলে গণ্য হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো গোপন স্থানে মালিকদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। এমন সম্পদের জাকাত উসুল করতে গেলে যেহেতু এসব সংরক্ষিত স্থানে হস্তক্ষেপ করতে হয় তাই এগুলোকে রাষ্ট্রের উসুল কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সম্পদগুলোই যখন মালিকগণ নিজেদের সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনে এবং রাষ্ট্রের হেফাজতে চলে আসে তখন সেগুলো দৃশ্যমান সম্পদের বিধানে চলে আসে এবং রাষ্ট্রের জন্য এগুলোর জাকাত উসুল করার অধিকার অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় কোনো সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদ বলে গণ্য হওয়ার জন্য দুটি বিষয় থাকা জরুরি—

১. সেই সম্পদ এমন সংরক্ষিত স্থানে থাকতে পারবে না যেগুলো হিসাবের জন্য সেই সংরক্ষিত স্থানে তদন্ত করার প্রয়োজন পড়ে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতির বক্তব্য এটিই!

২. এই সম্পদ রাষ্ট্রের হেফাজতে এসে যাবে। চতুর্থ উদ্ধৃতির মাধ্যমে এমনটিই স্পষ্ট হয়েছে।

যদি এ মানদণ্ডের ওপর ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের ওপর এ দুটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয়। কেননা, একদিকে এ সম্পদসমূহকে সেগুলোর মালিকগণ নিজেদের হেফাজত থেকে বের করে রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং সেগুলোর হিসাব নেওয়ার জন্য গোপন স্থানে তদন্ত করার প্রয়োজনও নেই। আর অন্যদিকে এসব সম্পদ রাষ্ট্রের হেফাজতেই কেবল নয়, বরং রাষ্ট্রের জামানতেও চলে এসেছে। বিশেষত, ব্যাংক যখন সরকারি মালিকানায় হয় এবং তার সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের স্কন্ধেই অর্পিত থাকে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদসমূহ জাকাত উসুলকারী কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে রাষ্ট্রের অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে। এজন্য অধিবেশনের সদস্যদের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত সম্পদ اموال ظاهرة বা দৃশ্যমান সম্পদের স্থলাভিষিক্ত। তাই রাষ্ট্র এসব সম্পদের জাকাত উসুল করতে পারবে।

আর এসব সম্পদের সবগুলোকে কিংবা এর কিয়দাংশকে যদি অদৃশ্যমান সম্পদ বলে ধরা হয়, তাহলেও এ ক্ষেত্রে ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—যে এলাকার

লোকজন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে জাকাত প্রদান করবে না রাষ্ট্র সেই এলাকার লোকদের কাছ থেকে اموال باطنه বা অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত চাইতে পারবে। যেমনটি 'ফাতহুল কাদির' এবং 'কিতাবুল এখতিয়ার'-এর দ্ব্যর্থহীন বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। আর এ মাসআলাই 'বাদায়েউস সানায়ে'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

জাকাত আদায়ের নিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জোরপূর্বকভাবে জাকাত কেটে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, জাকাত একটি ইবাদত। আর অন্যান্য ইবাদতের মতো তা আদায় করার সময়ও নিয়ত জরুরি। কিন্তু যখন আলোচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে জোরপূর্বকভাবে জাকাত কেটে নেওয়া হয় তখন হয়তো সেই সম্পদের মালিকদের জাকাত আদায় করার নিয়ত থাকে না।

ফকিহগণের বিবরণে এ সমস্যার সমাধানও রয়েছে। আর তা এই যে, রাষ্ট্রের যেসব সম্পদের জাকাত উসুল করার অধিকার রয়েছে সেসব সম্পদের জাকাত রাষ্ট্রকর্তৃক কর্তিত হয়ে যাওয়াও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়তের স্থলাভিষিক্ত। যেমন : আল্লামা শামি রহ. লেখেন—

> وَفِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ إِذَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ كُرْهًا فَوَضَعَهَا مَوْضِعَهَا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ فَقَامَ أَخْذُهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ. وَفِي الْقُنْيَةِ: فِيهِ إِشْكَالٌ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ فِيهِ شَرْطٌ وَلَمْ تُوجَدْ مِنْهُ. اهـ قُلْتُ: قَوْلُ الْكَرْخِيِّ فَقَامَ أَخْذُهُ إِلَخْ يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ تَأَمَّلْ.
>
> 'মুখতাসারুল কারখিতে আছে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি জোরপূর্বকভাবে জাকাত কেটে নেয় এবং তাকে যথাস্থানে ব্যয় করে, তাহলে তার জন্য তা জায়েজ হবে। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধানের এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি জাকাত উসুল করবেন। সুতরাং তার গ্রহণ করে নেওয়াই মালিকের জাকাত প্রদানের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর 'আলকুনইয়া' গ্রন্থে আছে, এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হলো জাকাত দানের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। অথচ এখানে মালিকের নিয়ত পাওয়া যায়নি। (আল্লামা

শামি বলেন) আমি বলি, ইমাম কারখি রহ.-এর উক্তি 'তার গ্রহণ করে নেওয়াই মালিকের জাকাত প্রদানের স্থলাভিষিক্ত হবে' এর মধ্যে এ প্রশ্নের নিরসন রয়েছে।'[৬৪]

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ঋণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত উসুল করার ওপর তৃতীয় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ব্যাংকসমূহের মধ্যে যে টাকা-পয়সা সঞ্চিত রাখা হয় ইসলামি ফিকহের দৃষ্টিকোণে সেগুলো ঋণ হওয়ার মর্যাদা রাখে। আর ঋণী ব্যক্তির জন্য এই অধিকার কীভাবে অর্জিত হতে পারে যে, সে ঋণদাতা ব্যক্তির সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করবে?

কিন্তু চিন্তা-গবেষণা করার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, ঋণ হয়ে যাওয়ার পরও এসব সম্পদ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ও রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার ভিত্তিতে আরও বেশি সরকারি হেফাজতে চলে এসেছে। এজন্য ঋণ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের জাকাত উসুল করতে পারার অধিকারে নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়েনি। এগুলো নিঃসন্দেহে শক্তিশালী ঋণ; যার ওপর সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ফরজ। আর ব্যাংকসমূহ সরকারি মালিকানাধীন হওয়ার কারণে এই সঞ্চয়সমূহ কেবল সরকারের গোচরেই নয়, বরং তার জামানতে চলে এসেছে। এজন্য রাষ্ট্র যদি সাধারণ অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে এসব সম্পদের জাকাত কেটে নেয়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোনো সমস্যা নেই।

সতর্কতামূলক পদ্ধতি

কিন্তু 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা' মনে করে, ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার সতর্কতামূলক পদ্ধতি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি এসব প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখার জন্য আসে তখন সে এমন একটি ফরম পূরণ করবে যার মধ্যে তার পক্ষ থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে এই অনুমতি দেওয়া হবে যে, যখন জাকাত আদায়ের তারিখ আসবে তখন প্রতিষ্ঠান

---

[৬৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩।

তার জমাকৃত টাকা থেকে জাকাত কেটে তা জাকাত ফান্ডে দিয়ে দেবে। আর এভাবে এই প্রতিষ্ঠান মালিকদের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করার নিয়মতান্ত্রিক উকিল হয়ে যাবে। এরপর এর ওপর না অদৃশ্যমান সম্পদ হওয়ার ভিত্তিতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে আর না নিয়তের দিক থেকে কোনো কথা বলার অবকাশ থাকবে। আর না ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট 'ঋণ' হওয়ার ওপর ভিত্তি করে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার অবকাশ থাকবে।

সুদি অ্যাকাউন্ট ও জাকাত

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত উসুল করার ওপর অন্য আরেকটি প্রশ্ন কোনো কোনো মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে পারে যে, এটি হচ্ছে সুদি অ্যাকাউন্ট। আর সুদ ও জাকাত কীভাবে একসঙ্গে একত্রিত হতে পারে?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি কোনো রাষ্ট্রে সুদি ব্যবসা-বাণিজ্যের অস্তিত্ব তার ঝলমলে ললাটে লজ্জাজনক এক কলঙ্ক-তিলক। বিশেষত, জাকাতের ব্যবস্থা চালু করার পর এই হারাম ও নাপাক আমদানির মাধ্যমকে অবশিষ্ট রাখার কোনো বৈধতা থাকতে পারে না। এজন্য রাষ্ট্রের ওপর অবশ্য কর্তব্য হলো যতদ্রুত সম্ভব মুসলিমদেরকে সুদি ব্যবস্থাপনার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়া।

কিন্তু ইসলামি ফিকহ-শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তির সম্পদে হালাল ও হারাম মিশ্রিত হয় এবং সেই ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদের সামগ্রিক জাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিকোণে তাতে কোনো সমস্যা নেই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, হালাল সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ শরয়ি দৃষ্টিকোণে জাকাত হবে আর বাকি হারাম সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ জাকাত না হয়ে সদকা বলে গণ্য হবে। মূলত আসল শরয়ি বিধান হলো সুদ গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সুদ উসুল করে নেয়, তাহলে সুদের সমুদয় আমদানি ও মুনাফা সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। এখন সরকার যদি এর মধ্য থেকে শতকরা আড়াই ভাগ কেটে জাকাত ফান্ডে দিয়ে দেয়, তাহলে (যেহেতু জাকাত ফান্ডে নফল সদকাসমূহ ও বিভিন্ন দান-অনুদান শামিল) মালিকদের ওপর শরয়ি দৃষ্টিকোণে ওয়াজিব হলো অবশিষ্ট সুদ সদকা করে দেওয়া। এর ওপর ভিত্তি করে আসল হালাল মালের জাকাত আদায় না করার বাহানা তালাশ করবে না।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, কোনো ব্যক্তির ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা জমা আছে এবং এর ওপর একশো টাকার সুদ বৃদ্ধি পেয়ে এগারোশো টাকায় উপনীত হয়েছে। এখন রাষ্ট্র পুরো এগারোশত টাকার শতকরা আড়াইভাগ হিসাব করে সাড়ে সাতাইশ টাকা জাকাত উসুল করবে। এই সাড়ে সাতাইশ টাকার মধ্য থেকে পঁচিশ টাকা এই ব্যক্তির আসল এক হাজার টাকার জাকাত। আর বাকি আড়াই টাকা জাকাত নয়, বরং সুদের যে টাকার পুরোটুকু সদকা করা দরকার ছিলো তার শতকরা আড়াইভাগ। যদি এ আড়াই টাকাও সদকার ফান্ডে চলে যায়, তাহলে ফিকহের দৃষ্টিতে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এর ব্যয়ের খাতও দরিদ্র শ্রেণি।

নাবালেগ শিশুর জাকাত

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো জাকাতের নিসাবের মালিক ব্যক্তি জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। আর অপরদিকে ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম মালিক রহ.-এর মতে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তির সম্পদেও জাকাত ফরজ। সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সে যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে কোনো ধরনের পার্থক্য করা হয়নি, তাই এর মধ্যে সম্ভবত ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব অবলম্বন করা হয়েছে। আর লোকদের বর্তমান অবস্থা সামনে রেখে যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে একে গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

ত্যাজ্য সম্পদ

অবশ্য ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে এমনও কিছু সম্পদ থাকতে পারে যা কোনো মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ। যেহেতু মৃত ব্যক্তির ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পদে উত্তরাধিকারীদের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং উত্তরাধিকারীদের সবাই জাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নাও হতে পারে; তাই এ সম্পদের জাকাত উসুল করাও ঠিক হবে না। এজন্য অর্ডিন্যান্সের সংশোধনীর মধ্যে এটিও যুক্ত হওয়া সমীচীন যে, 'যে ব্যক্তি জাকাত কেটে নেওয়ার দিন ইন্তিকাল করেছে, তার অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত কেটে নেওয়া হবে না।'

কোম্পানি এবং শেয়ার

সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সে কোম্পানিসমূহকেও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির শেয়ারসমূহকে শিডিউল নম্বর ১-এর অন্তর্ভুক্ত করে সেখান থেকেও জাকাত কেটে রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে মনে হয়, প্রতিটি কোম্পানির ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে আইনানুগভাবে পৃথক একক ব্যক্তি ধরে জাকাত উসুল করা হবে। আবার এ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার থেকেও জাকাত উসুল করা হবে। যদি বাস্তবিকভাবেই এমন হয়, তাহলে তা শরিয়তের একেবারেই পরিপন্থি। কেননা, এ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির সম্পদ থেকে একই বছরে দুই বার জাকাত উসুল করার সম্ভাবনা থেকে যায় যা কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না। এজন্য যদি কোম্পানিসমূহ থেকে জাকাত উসুল করা হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে জাকাত উসুল করা যাবে না। আবার শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে জাকাত উসুল করা হলে কোম্পানির সম্পদ থেকে উসুল করা যাবে না। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে অধিবেশনের সদস্যবৃন্দদের কাছে উত্তম হলো শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে জাকাত উসুল করা।

নগদ অর্থে উশর আদায়

অর্ডিন্যান্সে উশরেরও একটি অংশ আবশ্যকীয়ভাবে উসুল করা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, জমিন থেকে সিঞ্চন ছাড়া অর্জিত ফসলাদির শতকরা পাঁচভাগ, এ ছাড়া অন্য সর্বপ্রকার জমিনে কৃষকের অংশকে বাদ রাখা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর ওপর উশর ওয়াজিব। জমির মালিকগণ নিজেরা এই উশর আদায় করবে। এ নির্দেশনায় শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো অনিষ্ট নেই। অবশ্য অর্ডিন্যান্সের পঞ্চম দফার পাঁচ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উশর নগদ অর্থে আদায় করা হবে। কেবল গম ও ধানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে যে, যদি আঞ্চলিক জাকাত বিভাগ চায়, নগদ অর্থ উসুল না করে সরাসরি গম বা ধান উসুল করবে, তাহলে তারা তা করতে পারে।

'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর সদস্যবৃন্দ মনে করে, এ অংশেও সংশোধনী আনা আবশ্যক। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে নগদ অর্থে উশর আদায়

করা আবশ্যক নয়। শরিয়ত এ ব্যাপারে মালিকের সহজতার দিকে দৃষ্টি রেখেছে, উৎপন্ন ফসলাদির মালিকের জন্য যেভাবে উশর আদায় করা সহজ সেভাবেই সে আদায় করবে। এজন্য এ শর্তকে বিলুপ্ত করে বিষয়টি উশরদাতার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

উৎপন্ন ফসলাদির এক চতুর্থাংশ উশর থেকে বাদ দেওয়া

অর্ডিন্যান্সে কৃষি উৎপন্নজাত ফসলাদির এক চতুর্থাংশকে উৎপাদন-ব্যয় ধরে তাকে উশর থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। যদিও কোনো কোনো ইমামের মতে এমন উক্তি বর্ণিত আছে যে, কৃষির উৎপন্নজাত ফসলাদির এক চতুর্থাংশকে উৎপাদন-ব্যয় হিসেবে উশর থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।[৬৫] কিন্তু হানাফি ফকিহগণ এবং অন্যান্য মাজহাবের অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের মতে এই ছাড় নেই। এজন্য রাষ্ট্র যদি এই এক চতুর্থাংশকে আবশ্যকীয়ভাবে বাদ দিতেই চায়, তাহলে এ ঘোষণাও করে দেওয়া উচিত যে, এ অংশটুকুর উশর মালিকগণ আদায় করবে।

জাকাত আদায়ের তারিখ

সরকারের জারিকৃত বর্তমান অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতিটি জাকাতবর্ষ পয়লা রমজান থেকে শুরু হয়ে শাবান মাসের শেষ তারিখে শেষ হবে। এটি আনন্দের বিষয় যে, শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী জাকাত বণ্টন করার জন্য হিজরি সাল নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন আসবাবপত্রের মূল্যমান নির্ধারণ করার জন্য শিডিউল নম্বর ১ এ বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। শরিয়ত সমর্থিত পদ্ধতি হলো যখন কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তখন প্রতিটি আসবাবপত্রের জন্য আলাদা বর্ষ গণনা করা হয় না, বরং সমুদয় আসবাবপত্রের জন্য জাকাত ওয়াজিব হওয়ার একই তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এজন্য সঠিক পদ্ধতি হলো সমুদয় সম্পদের মূল্যমান নির্ধারণের একই তারিখ ধার্য করা।

---

[৬৫] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৭৪ দ্রষ্টব্য।

অবশ্য এই মূল্যের ভিত্তির ওপর জাকাত কেটে নেওয়ার তারিখ বিভিন্ন আসবাবপত্রের বিবেচনায় বিভিন্ন হতে পারে।

মূল্যবান পাথর ও মৎস্য সম্পদের জাকাত

অর্ডিন্যান্সের দুই নং শিডিউলে এমন সব বস্তুর তালিকা দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্র আবশ্যকীয়ভাবে যেগুলোর জাকাত উসুল করবে না, বরং মালিকগণকেই এসব সম্পদের জাকাত আদায় করতে হবে। এ তালিকায় মূল্যবান পাথর এবং মৎস্যসম্পদের ওপরও জাকাত প্রদান আবশ্যক করা হয়েছে। অথচ এ দুই বস্তুর ওপর জাকাত আসে না—যে পর্যন্ত না সেগুলোকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। এজন্য এ দুই বস্তুকে শিডিউলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া অপরিহার্য। কেননা, এগুলো ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করার সময় 'ব্যবসায়-সম্পদের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা দুই নং শিডিউলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বিবরণে অর্ডিন্যান্সে সরাসরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে জাকাত পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও দরিদ্র লোকদের সহযোগিতা করার আলোচনা রয়েছে। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, 'সর্বাবস্থায় জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে জাকাতের হকদারদেরকে মালিক বানানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।'

এটি এজন্য জরুরি যে, অর্ডিন্যান্সের উর্দু অনুবাদ থেকে এই সন্দেহ হতে পারে যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠান জাকাতকে নির্মাণকার্য ও কর্মকর্তাদের বেতন প্রদানে ব্যয় করতে পারবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি জায়েজ নেই। তুলনামূলকভাবে ইংরেজি মূলপাঠ যদিও সুন্দর; কিন্তু এর মধ্যেও এটি স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ

১. অর্ডিন্যান্সে উল্লিখিত নিসাবের মালিকের বিদ্যমান সংজ্ঞা পরিবর্তন করে তদস্থলে এ কথা সংস্থাপন করতে হবে যে,

'সাহেবে নিসাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমমূল্যের নগদ টাকা বা স্বর্ণ অথবা ব্যবসার সম্পদ থাকে। অথবা এই চার বস্তুর মধ্য থেকে কোনো একটি অথবা সবগুলোর সমষ্টি মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যমানের বরাবর হয়।'

এরপর প্রতিবছর জাকাত আদায়ের তারিখের আগে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের যে মূল্য হবে তা ঘোষণা করে এর মূল্যকে জাকাত উসুলের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ, কেবল সেসব লোক থেকেই জাকাত আদায় করা যাবে যাদের কাছে সংজ্ঞায় উল্লিখিত পরিমাণ সম্পদ ব্যাংক কিংবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত থাকবে।'

২. অর্ডিন্যান্সের তৃতীয় ধারায় সংশোধনী এনে এভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে যে, 'অর্ডিন্যান্সের অন্যান্য বিধানের অনুসারী নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রতিটি মুসলিম থেকে শিডিউল নম্বর ১ এ প্রদত্ত বিধি মোতাবেক জাকাতবর্ষ শেষ হওয়ার পর আবশ্যকীয়ভাবে জাকাত উসুল করা হবে। তবে শর্ত হলো যে ব্যক্তি এ কথা প্রমাণ করতে পারবে যে, জাকাত আদায়ের দিন তার জাকাতযোগ্য সমুদয় সম্পদ, নিসাবের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি, সেই ব্যক্তির উল্লিখিত সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করা হবে না। অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত হলো, যে ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারবে সে ঋণী এবং এই ঋণ কোনো উৎপাদন কার্য বা মুনাফা লাভ করার জন্য করেনি সেই ব্যক্তির ঋণকে জাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে।

আরেকটি শর্ত হলো 'যে ব্যক্তির ব্যাপারে যথাবিহিত ডেথ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, সে জাকাত কেটে নেওয়ার দিন ইন্তিকাল করেছে, তাহলে তার ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত কেটে নেওয়া হবে না।'

৩. ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের টাকা গচ্ছিতকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে একটি ওকালতনামা লিপিবদ্ধ করানো হবে যার মধ্যে তারা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই অনুমতি প্রদান করবে যে, জাকাত আদায় করার দিন প্রতিষ্ঠান তাদের পক্ষ থেকে জাকাত কেটে সেই টাকা জাকাত ফান্ডে দিয়ে দেবে।

৪. কোম্পানিসমূহ এবং এগুলোর শেয়ারের ওপর থেকে পৃথক পৃথকভাবে জাকাত উসুল করা যাবে না, বরং যদি কোম্পানি থেকে জাকাত উসুল করা

হয়, তাহলে শেয়ার থেকে উসুল করা যাবে না। আর যদি শেয়ার থেকে উসুল করা হয়, তাহলে কোম্পানির কাছ থেকে উসুল করা যাবে না। এ দুই পদ্ধতির মধ্য থেকে উত্তম হলো শেয়ার থেকে জাকাত উসুল করা।

৫. উশর নগদের আকৃতিতে উসুল করার বাধ্য-বাধকতাকে বিলুপ্ত করতে হবে। এ বিষয়টি ফসলের মালিকের কাছে ন্যস্ত করা হবে যে, তিনি চাইলে ধান বা গমও দিতে পারেন আবার নগদ টাকা-পয়সাও আদায় করতে পারেন।

৬. সর্বপ্রকার কৃষিজাত উৎপাদন থেকে রাষ্ট্র এক চতুর্থাংশকে উৎপাদন ব্যয় হিসেবে বাদ দিয়েছে। এ ব্যাপারে এই ঘোষণা প্রদান করতে হবে যে, এই অংশটুকুর উশর (এক দশমাংশ) খোদ মালিকগণ আদায় করবে।

৭. এক নম্বর শিডিউলে সর্বপ্রকার আসবাবপত্রের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য একটা তারিখই নির্ধারণ করতে হবে; বিভিন্ন আসবাবপত্রের জন্য বিভিন্ন তারিখ রাখা যাবে না। অবশ্য জাকাত কর্তন তারিখ বিভিন্ন আসবাবপত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন হতে পারে।

৮. মূল্যবান পাথর ও মৎস্য সম্পদকে দুই নম্বর শিডিউল থেকে বাদ দিতে হবে।

৯. দুই নম্বর শিডিউলে পশুর জাকাতের ব্যাখ্যা বর্ণনায় পাঁচ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত উটের জাকাতের ব্যাখ্যা নিতান্তই অস্পষ্ট। এর দ্বারা মনে হয়, পাঁচ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত উটের জন্য জাকাত হিসেবে একটি উট দেওয়া ওয়াজিব। একে সংশোধন করে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে, পাঁচ থেকে পঁচিশটি উট পর্যন্ত প্রতি পাঁচটি উটের বদলে একটি করে বকরি জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

১০. জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহে এটি স্পষ্ট করতে হবে যে, সর্বাবস্থায় জাকাতের হকদার ব্যক্তিদেরকে মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী বানাতে হবে। এবং এ জাকাতের টাকা কোনো নির্মাণ কাজে ও শিক্ষকদের বেতন প্রদানে ব্যয় করতে পারবে না।

সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সটি তড়িৎ অধ্যয়ন করার পর আমাদের মনে এ দশটি প্রস্তাবনা উদয় হয়েছে। এগুলোই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا.

এরপর হয়তো মহান আল্লাহ আরও কিছু বিষয় অন্তরে উদয় করে দেবেন।

যারা এ মাসআলা সত্যায়ন করেছেন

১. মুফতি রশিদ আহমাদ,
মুফতি ও মুহতামিম : দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, নাজেমাবাদ, করাচি।

২. মুফতি মুহাম্মাদ রফি উসমানি,
মুফতি ও মুহতামিম : দারুল উলুম, করাচি।

৩. মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি,
খাদেম : দারুল ইফতা, দারুল উলুম করাচি।

৪. মুফতি ওলি হাসান,
মুফতি : জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরি টাউন, করাচি।

৫. মাওলানা ডাক্তার আবদুর রাজ্জাক ইস্কান্দার,
উস্তাজ ও নাজেমে তালিমাত : জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, বিননুরি টাউন, করাচি।

৬. মুফতি সাহবান মাহমুদ,
দারুল উলুম করাচি।

৭. মাওলানা মুফতি আবদুর রউফ,
নায়েবে মুফতি : দারুল উলুম করাচি।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান

'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা' গত ২১ শাবান ১৩৯৯ হিজরি সনে এক অধিবেশনে জাকাত ও উশরের ব্যাপারে সরকারের জারিকৃত অর্ডিন্যান্সের ওপর পর্যালোচনা করে যে খসড়া প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছিলো সে ব্যাপারে মতামত জানার জন্য তা রাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বিভিন্ন ফতোয়া বিভাগের আলেমগণের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ্ এগুলোর মধ্য থেকে অধিকাংশেরই জবাবি পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। নিচে উল্লিখিত আলেমগণ সেই খসড়া পত্রের মূল মাসআলায় কোনো ধরনের সংশোধন ছাড়াই 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর সদস্যবৃন্দের সঙ্গে একমত পোষণ করে সত্যায়নমূলক দস্তখত করে দিয়েছেন।

১. শায়খুল হাদিস মাওলানা আবদুল হক,
   মুহতামিম : দারুল উলুম হক্কানিয়া, আকুড়াখটক।

২. মাওলানা মুফতি আবদুল্লাহ,
   মুফতি ও মুহতামিম : মাদরাসা কাসেমুল উলুম, মুলতান।

৩. মাওলানা মুফতি আবদুল হাকিম,
   মুফতি : মাদরাসা আশরাফিয়া, সাখখর।

৪. মাওলানা সলিমুল্লাহ খান মুদ্দাজিল্লুহুম,
মুহতামিম : জামিয়া ফারুকিয়া, ডর্ক কলোনি, করাচি। (তিনি নিয়তের মাসআলায় কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মজলিসের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।)

৫. মাওলানা ফাজেল হাবিবুল্লাহ,
মুহতামিম : জামিয়া রশিদিয়া, সাহিওয়াল।

৬. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ সাইদ,
মুফতি : মাদরাসা মাতলাউল উলুম, বরুরি রোড, কোয়েটা।

৭. মাওলানা ফজল মুহাম্মাদ,
মুহতামিম, মাদরাসা মাজহারুল উলুম, মোঙ্গুরা, সাওয়াত।

৮. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ ওয়াজিহ,
মুফতি : দারুল উলুমিল ইসলামিয়া, টাণ্ডুরুলায়ার, সিন্ধু।

৯. মাওলানা মুফতি খলিল,
মাদরাসা আশরাফুল উলুম : বাগবানপুরা, গুজরানওয়ালা।

১০. মাওলানা হাবিবুল হক,
মুদাররিস : মাদরাসা আশরাফুল উলুম, বাগবানপুরা, গুজরানওয়ালা।

১১. মাওলানা কাজি সাদুল্লাহ,
সদস্য : ইসলামি দর্শন কাউন্সিল, পাকিস্তান।

১২. মাওলানা কাজি বশির আহমাদ,
দারুল ইফতা : রাওয়ালকোট, আজাদ কাশ্মির।

১৩. মাওলানা মাকবুলুর রহমান কাসেমি,
দারুল ইফতা : রাওয়ালকোট, পৌঁছ, আজাদ কাশ্মির।

১৪. মাওলানা আবদুল্লাহ,
নাজেম : দারুল উলুম তালিমুল কুরআনবাগ, পৌঁছ, আজাদ কাশ্মির।

১৫. মাওলানা ছানাউল্লাহ,
খতিব : জামে মসজিদ, বাগ, পৌঁছ, আজাদ কাশ্মির।

এসব মহান আলেম ছাড়া নিম্নবর্ণিত আলেমগণ মজলিসের প্রস্তুতকৃত খসড়া পত্রে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও লিখে দিয়েছেন। তারা এ খসড়া পত্রের কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্নমতও পোষণ করেছেন।

১. মাওলানা মুফতি জামিল আহমাদ থানবি,
মুফতি : জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোর।

২. মাওলানা মুফতি আবদুস সাত্তার,
মুফতি : খাইরুল মাদারিস, মুলতান।

৩. মাওলানা আবদুশ শাকুর তিরমিজি,
দারুল উলুম হক্কানিয়া, সাহিওয়াল, জিলা সেরগোধা।

৪. মাওলানা সরফরাজ খান সফদর,
মাদরাসা নুসরাতুল উলুম, গুজরানওয়ালা।

মহান এসব আলেমের কেউ কেউ মজলিসের প্রস্তুতকৃত খসড়াপত্রের কিছু ভুলের ওপর সতর্ক করেছেন। তাদের সতর্কীকরণের প্রতি মজলিস আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সেই ভুলগুলো নিম্নরূপ—

১. মজলিসের প্রস্তুতকৃত খসড়ায় 'এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার' শর্ত ব্যাখ্যা করে লেখা হয়েছিলো, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য জরুরি হলো নিসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদ জাকাত দাতার মালিকানায় থাকা। অথচ এখানে এই তাফসিল থাকতে হবে, যদি বছরের শুরুতে পূর্ণাঙ্গ নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছরের মাঝখানে একেবারে নিঃশেষ না হয়ে কমে যায় তাহলেও জাকাত ওয়াজিব হবে। মজলিসের পূর্ব লিখিত খসড়ায় এ ত্রুটি[৬৬] রয়ে গিয়েছিলো। এখন এই লেখা মজলিসের পক্ষ থেকে বিলুপ্ত বলে মনে করতে হবে। আগের লেখার মর্ম এই দাঁড়িয়েছিলো, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ নিসাব সারা বছর মালিকানায় থাকা জরুরি।

২. 'নিসাবের মালিক' ব্যক্তির পূর্ববর্তী সংজ্ঞা এভাবে লেখা হয়েছিলো, 'সাহেবে নিসাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমমূল্যের নগদ টাকা বা স্বর্ণ অথবা ব্যবসায়িক সম্পদ

[৬৬] এর কারণ হলো ফকিহগণের বর্ণনায় সাধারণভাবে বর্ধনশীল সম্পদকে নিসাব বলে ব্যক্ত করে নির্দিষ্ট পরিমাণকে 'পূর্ণাঙ্গ নিসাব' এর চেয়ে কম পরিমাণকে 'অপূর্ণাঙ্গ নিসাব' বলে আখ্যায়িত করা হয়। লেখার সময় যদিও নিসাব শব্দটির প্রতি আমাদের নজর ছিলো কিন্তু 'পরিমাণ' শব্দটি আমাদের পক্ষ থেকে ভুলক্রমে লেখা হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হলো বর্ধনশীল সম্পদ সারা বছরই বিদ্যমান থাকতে হবে। (একেবারে নিঃশেষ হতে পারবে না) তবে বছরের শুরু ও শেষে পূর্ণাঙ্গ নিসাব অবশ্যই থাকতে হবে। যদিও বছরের মাঝখানে কিছু কমে যায়।

থাকে। অথবা এই চার বস্তুর মধ্য থেকে কোনো একটি অথবা সবগুলোর সমষ্টি মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যমানের বরাবর হয়।'

আলোচ্য সংজ্ঞায় এ অবস্থার বিধান বর্ণনা করা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলো যে, যখন কোনো ব্যক্তির কাছে কেবল স্বর্ণই থাকে এবং রৌপ্য বা নগদ অর্থ একেবারেই[৬৭] না থাকে এই অবস্থায় শরয়ি দৃষ্টিকোণে স্বর্ণের নিসাব হলো সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ। এ ভুল সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মজলিস 'নিসাবের মালিকের' সংজ্ঞায় সংশোধন এনে এভাবে লিখে দিয়েছে যে,

'কৃষিজাত উৎপন্ন ফসল ও পশুসম্পদ ছাড়া জাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদে নিসাবের মালিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য (৬১২.৩৫ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ (৮৭.৪৭ গ্রাম) কিংবা উভয়টির কোনো একটির মূল্য বরাবর টাকা বা ব্যবসায় সম্পদ হয় অথবা আলোচ্য বস্তুসমূহের মধ্য থেকে কোনোটির বা সবগুলোর সামষ্টিক মূল্য মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ হয়ে যায়।'

মজলিস উক্ত সংজ্ঞায় এ সংশোধনী আনার পর 'ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিলকে'ও বিষয়টি অবহিত করেছিলো। অতএব, এখন রাষ্ট্র যে 'সংশোধিত জাকাত অর্ডিন্যান্স ১৯৮০' কার্যকর করেছে তার মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহে সে আলোকেই সংশোধন করে দিয়েছে।[৬৮]

৩. মজলিসের প্রস্তুতকৃত খসড়ায় লেখা হয়েছিলো, শহর থেকে বহির্গমনকারী ব্যবসায়-সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করার জন্য উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. চৌকি স্থাপন করেছিলেন। এর দ্বারা মনে হচ্ছিলো, চৌকি স্থাপন করার এই ধারা সর্বপ্রথম উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. শুরু করেছিলেন। অথচ তা সঠিক নয়। বাস্তবতা হলো উমর রা.-এর শাসনামলেই এসব চৌকি থেকে জাকাত উসুল করার ধারা চালু হয়েছিলো।[৬৯]

কয়েকটি খণ্ডভুলের ওপর সাবধান করার এই ছিলো ইতিবৃত্ত। কিন্তু আলোচ্য চারজন মহান আলেম মৌলিকভাবে যেসব মাসআলার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ

---

[৬৭] এ অবস্থার বিধান যদিও সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু সংজ্ঞার পূর্ববর্তী আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছিলো।

[৬৮] জাকাত ও উশরের সংশোধিত অর্ডিন্যান্স ১৯৮০ খৃস্টাব্দ, ধারা : ৩, অনুচ্ছেদ : ক দ্রষ্টব্য।

[৬৯] মাবসুত ও কিতাবুল আছার দ্রষ্টব্য।

করেছেন এবং নিজেদের সংশয় প্রকাশ করেছেন তা হলো ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার মাসআলা। এ ব্যাপারে চারজন আলেমের দলিল-প্রমাণ ও সন্দেহ-সংশয়ের ওপর মজলিস দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু চিন্তা-গবেষণা করার পরও মজলিসের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়নি। এজন্য আমাদের কাছে সংগত মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করি।

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার ওপর যেসব সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে মৌলিকভাবে সেগুলো তিনটি সন্দেহের ওপর ভিত্তিশীল :

১. রাষ্ট্রের জন্য কেবল দৃশ্যমান সম্পদের জাকাত উসুল করার অধিকার রয়েছে; অদৃশ্যমান সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করার অধিকার তার নেই। এসব সম্পদের জাকাত আদায় করা মালিকদের ওপর ফরজ। আর নগদ টাকা যেহেতু অদৃশ্যমান সম্পদের অন্তর্ভুক্ত তাই ব্যাংক-অ্যাকাউন্টও অদৃশ্যমান সম্পদেরই অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পদের জাকাত উসুল করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই।

২. ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট মূলত ব্যাংকের দায়িত্বে প্রদত্ত অ্যাকাউন্টের মালিকদের দেওয়া ঋণ। যখন এসব টাকার মালিকগণ সেগুলোকে ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত রেখেছে তখন সেগুলো তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে ব্যাংকের মালিকানায় চলে গিয়েছে। এখন মূল মালিকের ওপর জাকাত আদায় করা তখনই ওয়াজিব হবে যখন সে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত অর্থ উত্তোলন করবে। এর আগে যে জাকাত ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে তা জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার আগেই এমন এক সম্পদ থেকে উসুল করা হচ্ছে যার ওপর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয় এবং যা অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মালিকানাধীনও নয়। সুতরাং এটি জায়েজ হতে পারে না।

৩. জাকাত আদায় করার জন্য আদায়কারীর নিয়ত থাকা জরুরি। আর ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট মালিকের নিয়ত থাকে না।

আমরা এ তিনটি সংশয়ের ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সংগত মনে করছি। মহান আল্লাহ তাওফিক প্রদানকারী।

দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদ

অধিবেশনের সদস্যবৃন্দের খসড়া লিপিতে ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. এবং অন্যান্য ফিকহশাস্ত্রবিদের স্পষ্ট বিবরণ দ্বারা আরজ করা হয়েছিলো, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর সোনালি যুগে দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। তখন জাকাতযোগ্য সর্বপ্রকার সম্পদ থেকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত উসুল করা হতো। কিন্তু উসমান রা.-এর যুগে যখন সম্পদ ও জনবসতি বেড়ে গেলো এবং এই আশঙ্কা দেখা দিলো যে, জনসাধারণের সংরক্ষিত এলাকায় জাকাত উসুলকারীগণের হস্তক্ষেপের কারণে লোকদের কষ্ট হবে এবং এ কারণে ফেতনা সৃষ্টি হবে তখন তিনি কেবল দৃশ্যমান সম্পদের জাকাত সরকারিভাবে উসুল করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে খোদ সম্পদের মালিকদেরকেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন।

মহান ফকিহগণের স্পষ্ট বিবরণের আলোকে আরজ করা হয়েছিলো, কোনো সম্পদ 'أموال ظاهرة' দৃশ্যমান সম্পদ হওয়ার জন্য দুটি বিষয় জরুরি—

১. এসব সম্পদের জাকাত উসুল করার জন্য মালিকদের সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পড়ে না।

২. সম্পদ রাষ্ট্রের হেফাজতে থাকে। এরপর আরজ করা হয়েছিলো, ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত সম্পদে এই দুটি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য এগুলোকে দৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

আমাদের এ অভিমতের ওপর কেউ কেউ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কোনো সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদ হওয়ার মূল কারণ হলো 'خروج من المصر' অথবা শহর থেকে বের হওয়া। যেহেতু সেকালে শহরের সীমান্তে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উশর উসুলকারী এজন্য বসানো হতো যে, তারা পথচারী ও অতিক্রমকারী লোকদের জান-মালের হেফাজত করবে। এজন্য শহর থেকে বের হয়ে সকল সম্পদ রাষ্ট্রের হেফাজতেই চলে আসতো এবং এর ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র তাদের জাকাত উসুল করতো। সংরক্ষিত স্থানসমূহের তদন্ত ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন না হওয়া এই বিধানের তাৎপর্য; কারণ নয়। এজন্য হুকুমের ভিত্তি 'خروج من المصر' অথবা শহর থেকে বের হওয়ার ওপর হবে। আর যেহেতু এ কারণ ব্যাংক এবং অন্যান্য

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় না তাই এগুলোকে দৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে গণ্য করে এগুলো থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত উসুল করা ঠিক হবে না।

এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর সদস্যবৃন্দ বারবার চিন্তাভাবনা করেছে এবং এ মাসআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত কুরআন-হাদিসের ভাষ্যগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু ব্যাপক চিন্তাভাবনার পরও ফলাফল এটিই সামনে এসেছে যে, সরকারিভাবে জাকাত উসুল করার জন্য সম্পদ শহর থেকে বের হওয়াকে কারণ সাব্যস্ত করা এবং এর ওপর হুকুমের ভিত্তি রাখা সঠিক নয়। বরং আসল কারণ হলো, জাকাতযোগ্য সম্পদ এমন হতে হবে, যার থেকে জাকাত উসুল করার জন্য সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান ও তদন্ত করার প্রয়োজন পড়ে না। এর প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ :

হাদিস ও ফিকহের কিতাবসমূহের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, খুলাফায়ে রাশিদিন রা. এবং তাদের পরবর্তী খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বণ্টন করার সময় সেসব বেতন-ভাতা থেকে জাকাত কেটে রেখে দিতেন। এ কর্মপদ্ধতির ওপর সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ এবং অন্যান্য ফকিহ কোনো ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেননি, বরং তারা এর সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। যেমন মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ.-এর একটি রেওয়ায়েতে আছে—

قَالَ الْقَاسِم بن محمد : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟» فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، «أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ»، وَإِنْ قَالَ: لَا. «سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

'কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদেরকে তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করতেন তখন লোকদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে এমন কোনো সম্পদ আছে যার ফলে তোমার ওপর জাকাত ওয়াজিব? এরপর সে যদি হ্যাঁ বলতো, তাহলে তিনি তার বেতন থেকে ওই সম্পদের জাকাত কেটে রেখে দিতেন। আর যদি না বলতো, তাহলে জাকাত কর্তন না করে তার সমুদয় প্রাপ্য তাকে দিয়ে দিতেন।'[৭০]

ইমাম আবু উবায়দ রহ. এই রেওয়ায়েতটি নিম্নোক্ত শব্দমালায় উল্লেখ করেছেন—

[৭০] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস : ৬৫৮।

فإن أخبره ان عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مما يريد أن يعطيه وإن أخبره أن ليس عنده مال قد حلت فيه الزكاة سلم إليه عطاءه.

'(আবু বকর রা.-এর জিজ্ঞেসের পর) যদি সেই ব্যক্তি বলতো তার কাছে এমন সম্পদ রয়েছে যার ওপর জাকাত ওয়াজিব, তাহলে তিনি তাকে যে বেতন দিতে চাইতেন তা থেকে জাকাত কেটে নিতেন। আর যদি সে এ সংবাদ দিতো, তার কাছে এমন কোনো সম্পদ নেই যার ওপর জাকাত ওয়াজিব, তাহলে তিনি তাকে তার পূর্ণ বেতন-ভাতা দিয়ে দিতেন।'[৭১]

তা ছাড়া ইবনু আবি শাইবা রহ. তার মুসান্নাফে উমর রা.-এর এই আমল বর্ণনা করেছেন—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ فَإِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ «جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.

'আবদুর রহমান ইবনু আবদুল কারি উমর রা.-এর যুগে ওবায়দুল্লাহ ইবনু আরকাম রা.-এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, বেতন-ভাতা বণ্টনের সময় নিকটবর্তী হলে উমর রা. ব্যবসায়-সম্পদ একত্রিত করতেন এবং এগুলোর নগদ ও বাকির হিসাব করতেন। এরপর তিনি উপস্থিত অনুপস্থিত সবধরনের সম্পদের জাকাত গ্রহণ করতেন।'[৭২]

আবু উবায়দা রহ. রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.

'যখন বেতন-ভাতা বণ্টিত হতো তখন তিনি সকল ব্যবসায়ীর সম্পদ একত্র করতেন এরপর এগুলোর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সম্পদের জাকাত বিদ্যমান সম্পদ থেকে কেটে নিতেন।'[৭৩]

মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানি রহ. এই রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারীদের

---

[৭১] কিতাবুল আমওয়াল-আবু উবায়দ, পৃষ্ঠা : ৪১১।

[৭২] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, হাদিস : ১০৪৬৬, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮৪।

[৭৩] কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা : ৪২৫।

জীবনানুসন্ধান করার পর লেখেন—'وسنده حسن' 'এর সনদ ও বর্ণনাসূত্র হাসান।'[৭৪]

তাছাড়া আবু বকর এবং উমর রা.-এর ব্যাপারে এ কথা বলা যায়, তাদের শাসনামলে দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। এজন্য তারা সর্বপ্রকার সম্পদের জাকাত উসুল করতেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায়, উসমান রা. যিনি সর্বপ্রথম এই বিভাজন সৃষ্টি করেন তার শাসনামলেও বেতন-ভাতা থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার এই ধারা চালু ছিলো। এ ব্যাপারে 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' রহ. গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

> عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذٰلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
>
> 'আয়শা বিনতু কুদামা রহ. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—আমি যখন উসমান ইবনু আফ্ফান রা.-এর কাছে বেতন-ভাতা গ্রহণ করার জন্য যেতাম তখন তিনি বেতন না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন তোমার কাছে এমন কোনো সম্পদ আছে যার ওপর জাকাত ওয়াজিব? তখন আমি যদি হাঁ বলতাম, তাহলে তিনি আমার বেতন থেকে ওই সম্পদের জাকাত উসুল করে নিতেন। আর যদি না বলতাম, তাহলে তিনি আমাকে আমার প্রাপ্য পুরো বেতন দিয়ে দিতেন।'[৭৫]

এমনকি কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, আলি রা.-এর শাসনামলেও বেতন-ভাতা থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার ধারা চালু ছিলো। অবশ্য তার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে এটিও জানা যায়, তিনি কেবল সেসব লোকের অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত উসুল করতেন যাদের বেতন-ভাতা রাষ্ট্রীয়কোষাগার থেকে চালু ছিলো। অন্য লোকদের নয়। মুআবিয়া রা.-এর আমলও এমনই ছিলো।[৭৬] আর ইবনু আব্বাস এবং ইবনু আমের রা. এর অভিমতও তাই।[৭৭]

---

[৭৪] ইলাউস সুনান, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।

[৭৫] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস : ৮৩৮।

[৭৬] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা : ২৭৩।

[৭৭] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা : ২৭৩।

তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বেতন-ভাতা বণ্টন করার সময় খোদ বেতনের জাকাতও এই বেতন থেকেই উসুল করে নিতেন। এ ব্যাপারে মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবায় এসেছে—

عن هبيرة قال كان ابن مسعود يزكي عطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين.

'হুবায়রা রহ. বলেন—ইবনু মাসউদ রা. লোকদের বেতন থেকে প্রতি হাজারে জাকাত হিসেবে পঁচিশ দিরহাম কর্তন করতেন।'

মাওলানা জফর আহমাদ উসমানি রহ. এই রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারীদের জীবনী অনুসন্ধান করার পর লেখেন—'রেওয়ায়েতটির সনদ হাসান পর্যায়ের'।[৭৮]

তবে যেহেতু সেসব বেতনের জাকাত উসুল করা হতো যেগুলো কবজা করার পর প্রাপকের মালিকানায় আসতো সেহেতু আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর কর্ম-পদ্ধতি ছিলো, তিনি প্রথমে বেতন দিয়ে দিতেন এরপর তা থেকে জাকাত উসুল করতেন। এ সম্পর্কে মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে এসেছে—

عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال كان يعطى ثم يأخذ زكاته.

'হুবায়রা ইবনু ইয়ারিম আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রথমে বেতন-ভাতা দিয়ে দিতেন এরপর তার জাকাত উসুল করতেন।'[৭৯]

মুজামে তাবারানিতে এ রেওয়ায়েতটি এভাবে এসেছে—

كان يعطى العطاء ثم يأخذ زكاته.

'তিনি প্রথমে বেতন দিয়ে দিতেন এরপর তার জাকাত উসুল করতেন।'

আর আল্লামা নুরুদ্দিন হাইসামি রহ. মাজমাউজ জাওয়ায়েদে এই রেওয়ায়েত এভাবে লেখেন—

رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة.

'কেবল হুবায়রা ছাড়া রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারীগণ সকলেই হাদিস সহিহ হওয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। আর হুবায়রাও নির্ভরযোগ্য।'

---

[৭৮] ইলাউস সুনান, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।

[৭৯] মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭৮।

ইমাম আবু ওবায়দ রহ. এ রেওয়ায়েতটিকে আরও বিস্তারিতভাবে এবং স্পষ্ট করে লিখেছেন—

عن هبيرة بن يريم قال كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منه الزكاة.

'হুবায়রা ইবনু ইয়অরিম বলেন—আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. আমাদেরকে বিভিন্ন থলিতে করে বেতন-ভাতা প্রদান করতেন এরপর তা থেকে জাকাত গ্রহণ করতেন।'[৮০]

বেতন-ভাতা থেকে জাকাত গ্রহণ করার ধারা খুলাফায়ে রাশিদিন রা.-এর শাসনামলের পরেও চালু ছিলো। এ সম্পর্কে মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবায় এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إِذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ.

'ইবনু আওন মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি রাষ্ট্রপ্রধানদের দেখেছি, যখন তারা বেতন-ভাতা প্রদান করতেন তখন এগুলোর জাকাত গ্রহণ করে নিতেন।'

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ.-এর যুগে যদিও দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছিলো কিন্তু তার ব্যাপারেও বর্ণিত আছে—

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ «يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ.

'উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি বেতন ও পুরস্কার থেকে জাকাত উসুল করতেন।'[৮১]

এ রেওয়ায়েতটি মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে এভাবে এসেছে—

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

'জাফর ইবনু বুরকান বলেন—উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. যখন কোনো ব্যক্তি অথবা কর্মচারীকে তার বেতন প্রদান করতেন তখন তার কাছ থেকে জাকাত আদায় করে নিতেন।'[৮২]

---

[৮০] কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা : ৪১২।

[৮১] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, হাদিস : ১০৪৭০।

[৮২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ৭০৩৭।

জাকাত গ্রহণের বিষয়টি কেবল বেতন-ভাতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে-কোনো মুসলিমেরই কোনো পাওনা থাকতো তা দেওয়ার সময় এর জাকাত উসুল করার নিয়মও ইসলামের প্রথম যুগসমূহে অব্যাহত ছিলো। এ ব্যাপারে 'মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা' এবং 'সুনানে বাইহাকি'তে এসেছে—

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: أَخَذَ الْوَالِي فِي زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَائِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا فَأُدْخِلَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَى مَيْمُونٍ «ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى.

'আমর ইবনু মায়মুন বলেন, এক গভর্নর ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনামলে রাক্কার অধিবাসী আবু আয়শা নামক জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা জোরপূর্বকভাবে উসুল করে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে। এরপর উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. যখন খলিফা হোন তখন সেই ব্যক্তির সন্তান এসে তার কাছে এই জুলুমের ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করে। তখন তিনি গভর্নর মায়মুনের কাছে লিখে পাঠান, তোমরা তাদের কাছে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও এবং এগুলোর এ বছরের জাকাত গ্রহণ করো। যদি এগুলো এমন মাল না হতো যা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, (অর্থাৎ, মালে জিমার) তাহলে আমি এ সম্পদের অতীত বছরগুলোর জাকাতও উসুল করে নিতাম।'[৮৩]

মাওলানা জফর আহমাদ উসমানি রহ. এ হাদিসের সনদ ও বর্ণনাসূত্র তদন্ত করার পর লেখেন—রেওয়ায়েতটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং সনদ অবিচ্ছিন্ন।

ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে ভিন্ন সনদে 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিকেও বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যেও এক বছরের জাকাত উসুল করার আলোচনা রয়েছে। বর্ণনাটি হলো—

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ

[৮৩] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, হাদিস : ১০৬১৪, বাইহাকি সুনানে কুবরা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৫০।

بِكِتَابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ضِمَاراً.

'কোনো এক গভর্নর কিছু সম্পদ অন্যায়ভাবে আটক করেছিলো উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. এ ব্যাপারে পত্র লিখলেন যেন সে সম্পদ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং অতীত বর্ষগুলোর জাকাত উসুল করা হয়। এরপর অন্য আরেকটি পত্র এভাবে লিখলেন, এ সম্পদ থেকে কেবল এক বছরের জাকাত উসুল করা হবে। কেননা, তা এমন সম্পদ ছিলো যা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না।'[৮৪]

আলোচ্য সবগুলো বিবরণ দ্বারা জানা গেছে, নগদ টাকা-পয়সার জাকাত সরকারিভাবেই উসুল করা হতো। আর তাও জাকাত উসুলকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কিংবা শহর থেকে সম্পদ বের হওয়ার অবস্থায় নয়, বরং আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক এবং উসমান রা.-এর কর্মপদ্ধতি ছিলো, তারা বেতন দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সময় সেসব সম্পদের জাকাত এই বেতন থেকেই উসুল করতেন যেসব সম্পদ জাকাত দাতাদের ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ও অন্যান্য স্থানে তাদের মালিকানায় ছিলো। তারা অবশ্য প্রদেয় জাকাত বেতন থেকে কেটে অবশিষ্ট বেতন লোকদের হাতে অর্পণ করতেন। আর আলি রা., আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. এবং উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. এসব বেতনেরই জাকাত উসুল করতেন। কেননা, মালিক যদি আগে থেকেই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে বেতন-ভাতার এই সম্পদের জাকাতযোগ্য হওয়ার কারণে এর ওপরও জাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। অবশ্য তারা বেতন থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার পরিবর্তে প্রথমে বেতন প্রাপকদের হাতে দিয়ে দিতেন। এরপর মালিকের কাছ থেকে জাকাত উসুল করতেন। মোটকথা, নগদ টাকা পয়সা থেকেও সরকারিভাবে জাকাত উসুল করা হতো। আর এই ধারা দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদের বিভাজন সৃষ্টি হওয়ার পরও অব্যাহত ছিলো। এমনকি উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. এমন সব সম্পদ থেকেও জাকাত উসুল করতেন যেগুলো অন্যায় ও জোরপূর্বকভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো।

এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়, কোনো সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে গণ্য হওয়া এবং তা থেকে সরকারিভাবে জাকাত উসুল করার জন্য সেই

---

[৮৪] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস : ৮৭৪।

সম্পদ শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া জরুরি নয়। বরং আসল বিষয় হলো এমন সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করার জন্য জাকাতদাতার সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান ও তদন্ত চালাবার প্রয়োজন না হওয়া এবং সেই সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা।

বেতন-ভাতা থেকে জাকাত উসুল করার এই কর্মপন্থা সেই যুগেও কোনো ধরনের অস্বীকৃতি ছাড়াই অব্যাহত ছিলো। খোদ হানাফি মাজহাবের ফকিহগণও এসব ঘটনা বর্ণনা করে এর সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। আবু বকর রা. এবং উসমান রা. কর্তৃক বেতন থেকে জাকাত উসুল করার বিষয়ে স্বয়ং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. লেখেন—

> قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ قَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ لا، سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ «، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ.
>
> ‘কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদেরকে তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করতেন তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে কি এমন কোনো সম্পদ আছে যার ফলে তোমার ওপর জাকাত ওয়াজিব? এরপর সে যদি হাঁ বলতো, তাহলে তিনি তার বেতন থেকে ওই সম্পদের জাকাত কেটে রেখে দিতেন। আর যদি সে না বলতো, তাহলে তার জাকাত কর্তন না করে তাকে সমুদয় প্রাপ্য বেতন দিয়ে দিতেন।’ ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, ‘আমরা এ মতটি গ্রহণ করেছি। আর এটিই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত।’[৮৫]

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. উসমান রা.-এর ব্যাপারে আয়শা বিনতু কুদামা রা.-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যা ইতোপূর্বে মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ.-এর উদ্ধৃতিতে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাছাড়া আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. এবং শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ.-এর আলোচিত ঘটনা—যার মধ্যে আত্মসাৎকৃত সম্পদকে ফিরিয়ে দিয়ে তা থেকে জাকাত উসুল করার আলোচনা রয়েছে—উল্লেখ করে এর মাধ্যমে ‘ ضمار مال’ বা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাহীন সম্পদের ওপর জাকাত

---

[৮৫] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, হাদিস : ৩২৭।

ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, এই সম্পদ থেকে এক বছরের যে জাকাত উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. উসুল করেছেন তা হানাফি মাজহাবের আলেমগণের কাছেও স্বীকৃত। অন্যথায় তিনি একে খণ্ডন করতেন কিংবা এর একটি নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতেন।

এমনকি ইমাম তহাবি রহ.-এর একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে জানা যায়, অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাতের ব্যাপারেও হানাফি মাজহাব মতে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে এসব সম্পদের জাকাত উসুল করার জন্য জাকাত উসুলকারী পাঠিয়ে সরকারিভাবে সেগুলোর জাকাত উসুল করবেন অথবা এই দায়িত্ব যাদের ওপর জাকাত ওয়াজিব তাদের ওপরই অর্পণ করবেন যে, তারা নিজ দায়িত্বে জাকাত আদায় করে দেবে। ইমাম তহাবি রহ. আপন গ্রন্থ 'শরহু মায়ানিল আসারে' এ ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখেছেন। অধ্যায়টির নাম হলো باب الزكاة يأخذها الامام ام لا তিনি এ অধ্যায়ে নিজের অভ্যাস অনুযায়ী উভয় দৃষ্টিকোণ বর্ণনা করার পর লেখেন—

وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ , أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُمْ صَدَقَةَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا وَجَبَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ , وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي ثِمَارِهِمْ , ثُمَّ يَضَعُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِ الزَّكَوَاتِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ , لَا يَأْبَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ الْأَمْوَالِ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَأَمْوَالَ التِّجَارَاتِ كَذَلِكَ..... وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ.

'যুক্তির দৃষ্টিতেও এর কারণ হলো আমরা আলেমগণকে দেখতে পেয়েছি, তারা এ মাসআলায় কোনো দ্বিমত পোষণ করেন না-যে, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি উন্মুক্ত বিচরণক্ষেত্রে বিচরণকারী পশুসমূহের মালিকদের কাছে জাকাত উসুলকারী পাঠিয়ে তাদের পশুগুলোর জাকাত উসুল করবে; যদি তাদের ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে তাদের ফসলাদির মধ্যেও এই অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে। জাকাত উসুল করার পর তা ব্যয় করার সঠিক খাতে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তা ব্যয় করবেন। এ কর্মপন্থাকে কোনো মুসলিম অস্বীকার করেনি। সুতরাং যুক্তির দাবি হলো

> অন্যান্য সম্পদ, যেমন : স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়-সম্পদেরও একই বিধান। ..... আর এ সবগুলোই ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত।'[৮৬]

ইমাম তহাবি রহ. এখানে কোনো ধরনের শর্ত ও বন্ধনের উল্লেখ করা ছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানের এই অধিকার থাকার বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্যবসায়-সম্পদের জাকাত উসুল করার জন্য জাকাত উসুলকারীকে এসব সম্পদের মালিকের কাছে পাঠাতে পারেন। তিনি এখানে কোনো মাল জাকাত উসুলযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য শহর থেকে বের করা না করার শর্ত উল্লেখ করেননি। জাকাত উসুলকারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার কোনো শর্তও এখানে উল্লেখ নেই। ইমাম তহাবি রহ.-এর এই উদ্ধৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগ হানাফি ফকিহগণের অন্যান্য দ্ব্যর্থহীন উদ্ধৃতির সঙ্গে বাহ্যত সংঘর্ষপূর্ণ হয়। আর উল্লিখিত উদ্ধৃতির আগ-পিছ মিলিয়ে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তার এই আলোচনা জাকাত উসুলকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। কিন্তু চর্মচক্ষে এটিই প্রতীয়মান হয়, আলোচ্য উদ্ধৃতিতে কোনো ধরনের বন্ধন ও শর্তের উল্লেখ নেই। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম তহাবি রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত গ্রহণ করার অধিকারও মূলত হানাফি আলেমগণের মতে রাষ্ট্রপ্রধানের। অবশ্য সেই জনকল্যাণকে সামনে রাখতে হবে যা উসমান রা.-এর সামনে ছিলো। যেখানে লোকদের সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজন পড়ে সেখানে সম্পদের মালিকদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হবে, তারা যেন নিজেদের পক্ষ থেকে এসব সম্পদের জাকাত আদায় করে দেয়। আর যেখানে সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজন পড়ে না সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান আপন অধিকার বলে এসব সম্পদের জাকাত উসুল করতে পারেন। যেহেতু জাকাত উসুলকারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তির সম্পদে এ জাতীয় কোনো অনিষ্ট নেই তাই রাষ্ট্রপ্রধান তার নিজের আসল অধিকার অনুযায়ী সেগুলোর জাকাত উসুল করতে পারেন। আরও কিছু অতিরিক্ত সম্পদও যদি এমন হয় যেগুলোর জাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে এ জাতীয় অনিষ্ট নেই সেখানেও রাষ্ট্রপ্রধানের আসল অধিকার ফিরে আসবে এবং তিনি সেসব সম্পদের জাকাত উসুল করতে পারবেন। যার দৃষ্টান্ত বেতন-ভাতা এবং জোরপূর্বক আত্মসাৎকৃত সম্পদের ব্যাপারে ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

---

[৮৬] শরহু মায়ানিল আছার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৪।

এমনকি কোনো স্থানের ব্যাপারে যদি এটি জানা যায়, লোকজন অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত প্রদান করছে না, তাহলে সেখানে এই অনিষ্ট থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান তার অধিকার বলে এসব সম্পদের জাকাত উসুল করতে পারবেন। কেননা, জাকাত দেওয়া বর্জন করার অনিষ্ট লোকদের সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান করার অনিষ্টের চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর। প্রায় সকল ফকিহ এ কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. লেখেন—

> ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الْآيَةَ تُوجِبُ حَقَّ أَخْذِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ، وَعَلَى هَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْخَلِيفَتَانِ بَعْدَهُ، فَلَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ وَظَهَرَ تَغَيُّرُ النَّاسِ كَرِهَ أَنْ تُفَتِّشَ السُّعَاةُ عَلَى النَّاسِ مَسْتُورَ أَمْوَالِهِمْ فَفَوَّضَ الدَّفْعَ إلَى الْمُلَّاكِ نِيَابَةً عَنْهُ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يُسْقِطُ طَلَبَ الْإِمَامِ أَصْلًا، وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاتَهُمْ طَالَبَهُمْ بِهَا.
>
> 'মহান আল্লাহর বাণীর 'خذ من أموالهم صدقة' বাহ্যিক অর্থ এটি আবশ্যক করে তোলে যে, জাকাত গ্রহণ করার একচ্ছত্র অধিকারী সময়ের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান। এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরের দুইজন খলিফা। এরপর যখন উসমান রা. রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং মানুষের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হলো তখন তিনি অপছন্দ করলেন যে, জাকাত উসুলকারীগণ মানুষের গোপন সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হোক। এজন্য তিনি নিজের প্রতিনিধি হিসেবে সম্পদের মালিকদের ওপরই জাকাত প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উসমান রা.-এর এ অভিমতের সঙ্গে কোনো সাহাবি দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে এটি ইমামের অনুসন্ধানের অধিকারকে কোনোভাবেই খর্ব করে না। এজন্য যদি জানা যায়, কোনো শহরের অধিবাসীরা জাকাত প্রদান করে না তাহলে তিনি তাদের কাছে জাকাত চাইতে পারবেন।'[৮৭]

এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মূলত সকল সম্পদের জাকাত উসুল করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের। আর অদৃশ্যমান সম্পদের ব্যাপারে এই অধিকার একটি বিশেষ কল্যাণের কারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই অধিকারটি

---

[৮৭] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৭।

একেবারে রহিত হয়ে যায় নি, বরং যেসব সম্পদের জাকাত সম্পদের মালিকগণ আদায় করে সেগুলোও মূলত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবেই আদায় করে অথচ মূলত তাদের এই অধিকার ছিলো না। এজন্যই অদৃশ্যমান সম্পদের ঋণের ক্ষেত্রে বান্দাদের পক্ষ থেকে তলবকারী রয়েছে বলে ফকিহগণ স্থির করেছেন।

এখানে কোনো কোনো আলেম এই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. উসমান রা.-এর কর্মপন্থার বিবরণ দিয়ে লেখেন—

> فَجَعَلَ لهم أداؤها إِلَى الْمَسَاكِينِ وَسَقَطَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَقُّ الْإِمَامِ فِي أَخْذِهَا لِأَنَّهُ عَقَدَ عَقْدَهُ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ فَهُوَ نَافِذٌ عَلَى الْأُمَّةِ.
>
> ‘তিনি এ ভাষণে জনসাধারণকে তাদের জাকাত গরিব-মিসকিনদের দেওয়ার অনুমতি দান করেছেন। আর এ কারণে রাষ্ট্রপ্রধানের জাকাত গ্রহণ করার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। কেননা, এটি এমন এক চুক্তি যা একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান সম্পন্ন করেছেন। তাই তা উম্মাহর ওপর কার্যকর হয়ে গেছে।’[৮৮]

এর দ্বারা জানা গেলো, উসমান রা.-এর এই ফায়সালার পর অদৃশ্যমান সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করার অধিকার আর কারও জন্যই অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ.-এর পুরো উদ্ধৃতিটুকু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে মনে হয়, রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন অধিকার যার পর সম্পদের মালিকদের নিজে নিজে জাকাত আদায় করার অধিকার বাকি থাকে না এবং তাদের জাকাত আদায়কে শরয়ি দৃষ্টিকোণে গ্রহণ করা যায় না। যেমন—আলোচ্য উদ্ধৃতির আগে তার বর্ণনা এ রকম—

> وقَوْله تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقة يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَخْذَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْإِمَامِ وَأَنَّهُ مَتَى أَدَّاهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْإِمَامِ قَائِمٌ فِي أَخْذِهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى إِسْقَاطِهِ
>
> ‘মহান আল্লাহর বাণী ‘خذ من أموالهم صدقة’ এর ওপর ইঙ্গিত বহন করে যে, জাকাত গ্রহণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। যার ওপর জাকাত দেওয়া ওয়াজিব এমন ব্যক্তি যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে গরিব-মিসকিনকে জাকাত দিয়ে দেয়, তাহলে এটি তার জন্য জায়েজ হবে না। কেননা,

---

[৮৮] আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

জাকাত গ্রহণ করার অধিকার ইমামের জন্য বহাল রয়েছে; তাই তা রহিত করার কোনো সুযোগ নেই।

আলোচ্য উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, তা রাষ্ট্রপ্রধানের এমন অধিকারের আলোচনা করছে যা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সম্পদের মালিকদের জন্য জাকাত দেওয়া কেবল নাজায়েজই নয়, বরং তারা যদি জাকাত আদায় করেও, তাহলেও তা আদায় হবে না। এরপর এই অধিকারের ব্যাপারে আরেকটু সামনে গিয়ে তিনি লেখেন—যেহেতু উসমান রা. একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন আর তিনি অদৃশ্যমান সম্পদের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাতিল করে দিয়েছেন তাই তা রহিত হয়ে গেছে।[৮৯]

এর সারমর্ম হলো উসমান রা.-এর শাসনামলের আগে সম্পদশালীদের জন্য দরিদ্র লোকদেরকে অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত দেওয়া জায়েজ ছিলো না। আর তারা যদি জাকাত প্রদান করতো, তাহলেও তা আদায় হতো না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উসমান রা. তাদেরকে এই অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। এখন এ বিষয়ের ফায়সালা হয়ে গেছে যে, এমন সম্পদের মালিকগণ যদি নিজে নিজে জাকাত আদায় করে, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এই উসুলের অধিকার একেবারেই রহিত হয়ে গেছে এবং এখন যদি তিনি জাকাত

---

[৮৯] অতএব, পশুসম্পদের ব্যাপারেও এখন রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার এই যে, তার উপস্থিতিতে সম্পদের মালিক যদি নিজে নিজে জাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কোনো কোনো ফকিহের মতে এভাবে জাকাত দিলে জাকাত আদায়ই হবে না। আলমাবসুত গ্রন্থে আছে—

فإن قال دفعتها إلى المساكين لم يصدق وتؤخذ منه الزكاة عندنا.... ولنا: أن هذا حق مالي يستوفيه الإمام بولاية شرعية فلا يملك من عليه إسقاط حقه في الاستيفاء.... ولا يبرأ بالأداء إلى الفقير فيما بينه وبين ربه وهو اختيار بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى

'যদি জাকাত দাতা বলে, আমি দরিদ্র ব্যক্তিদের জাকাত দিয়ে দিয়েছি, তাহলে তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে না এবং আমাদের মাজহাব মতে তার কাছ থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে।... আমাদের অভিমত হলো এটি হলো একটি অর্থ সংক্রান্ত অধিকার। শরিয়ত প্রদত্ত অধিকার বলে রাষ্ট্রপ্রধান তা আদায় করবেন। সুতরাং যাকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে সে তা রহিত করার অধিকার রাখে না। ..... দরিদ্র লোকদেরকে আদায় করে দেওয়ার দ্বারাও সে তার মাঝে এবং তার প্রতিপালকের মাঝে দায়মুক্ত হবে না। এটিই আমাদের কোনো কোনো মাশায়েখের অভিমত। মহান আল্লাহ তাদের ওপর করুণার বারিধারা বর্ষণ করুন।

উসুল করতে চান তাহলে উসুল করতে পারবেন না। ফাতহুল কাদিরের ভাষ্য স্পষ্টভাবে বলছে—

وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا.

> 'এটি রাষ্ট্রপ্রধানের জাকাত চাওয়ার অধিকারকে একেবারেই রহিত করে দেয় না।'

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ.-এর পুরো আলোচনা এবং অন্যান্য ফিকহশাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে দৃষ্টিপাত করার পর যেসব বিষয় সামনে আসে সেগুলো হলো—

১. মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালি যুগ এবং আবু বকর ও উমর রা.-এর যুগে দৃশ্যমান সম্পদ ও অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত সরকারিভাবে উসুল করা হতো। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই ছিলো যে, পশুসম্পদ এবং কৃষিজাত উৎপন্ন ফসলাদির জাকাত উসুল করার জন্য জাকাত উসুলকারী পাঠানো হতো। আর নগদ টাকা-পয়সা এবং ব্যবসায়-সম্পদের জাকাত উসুল করার জন্য জাকাত উসুলকারী পাঠানোর পরিবর্তে সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, তারা নিজেরাই যেন জাকাত নিয়ে আগমন করে। কিন্তু উভয় প্রকার সম্পদের জাকাত আদায় করার পদ্ধতি এটিই ছিলো যে, তা রাষ্ট্রকে দিয়ে দেওয়া হবে।

২. উমর রা. শহর থেকে বাইরে গমনশীল সম্পদের জাকাত উসুল করার জন্য এই পরিবর্তন করেন যে, এর উসুলের জন্য জাকাত উসুলকারী নিয়োগ করতেন। আর বাকি অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত পূর্ব-বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী খোদ সম্পদের মালিকগণই নিয়ে আসতেন।

৩. উসমান রা.-এর শাসনামলে অদৃশ্যমান সম্পদের পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং মানুষের বসবাসের এলাকা বিস্তার লাভ করলে তিনি অনুভব করলেন, এখন যদি অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত সরকারিভাবে আদায় করার এই ধারা অব্যাহত রাখা হয় যে, এ ছাড়া অন্য-কোনোভাবে জাকাত আদায় করা জায়েজ হবে না, তাহলে দৃশ্যমান সম্পদের মতো এ ক্ষেত্রেও জাকাত উসুলকারী নিয়োগ করতে হবে এবং সংরক্ষিত স্থানে তাদের হস্তক্ষেপের কারণে লোকদের কষ্ট হবে। এজন্য তিনি জাকাত আদায়কারী সম্পদশালী

ব্যক্তিদেরকে এই অনুমতি দিয়ে দিলেন, তারা যেন জাকাতযোগ্য সম্পদের জাকাত নিজেরাই আদায় করেন।

৪. উসমান রা. কর্তৃক অনুমতিদানের ঘোষণার পর লোকদের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি হলো তারা নিজেরাই অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের জাকাত উসুল করার অধিকার এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অতএব, এখনো তিনি দুই অবস্থায় জাকাত উসুল করার ব্যবস্থা করতে পারেন :

- কোনো স্থানের লোকদের ব্যাপারে যদি জানা যায়, তারা স্ব-প্রণোদিত হয়ে জাকাত আদায় করছে না।
- অদৃশ্যমান সম্পদ যদি দৃশ্যমান সম্পদের সঙ্গে এভাবে সংমিশ্রিত হয়ে যায় যে, সেগুলোর জাকাত উসুল করার জন্য কোনো ব্যক্তির সংরক্ষিত স্থানে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পড়ে না।

৫. তৎকালীন যুগে যেহেতু সংরক্ষিত স্থানে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানো ছাড়া সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরের সময় জাকাত উসুলকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার মাধ্যমেই সম্পদ প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি অধিক পরিমানে সামনে আসতো। এজন্য ফকিহগণ এ পদ্ধতির বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, এসব সম্পদ শহর থেকে বের হয়ে দৃশ্যমান সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যেসব সম্পদ শহরের ভিতরে রয়ে গেছে সেগুলো অদৃশ্যমান সম্পদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেছে। তবে শহর থেকে বের হওয়াই বিধানটির মূল কারণ নয়। বরং এটি আপন যুগের বিবেচনায় একটি সাধারণ ঘটনার বিবরণ। অন্যথায় বিধানটির মূল ভিত্তি তাই যার ওপর ভিত্তি করে অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত উসুল করাকে সরকারিভাবে উসুল করার সাধারণ নিয়ম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো ধরনের তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়াই সেগুলো স্পষ্ট হয়ে যাওয়া। এজন্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেসব সম্পদ থেকেও জাকাত উসুল করা হয়েছে যেগুলো শহর থেকে বের হতো না, কিন্তু অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হয়ে যেতো। যেমন : বেতন-ভাতা এবং রাষ্ট্রের কোনো কর্মকর্তাকর্তৃক জোরপূর্বকভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ যার আলোচনা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এখানে কোনো কোনো আলেম এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, কিছু সম্পদ তো রাষ্ট্রের অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হয়ে যেতো কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার সেসব সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করতো না। উদাহণস্বরূপ জাকাত উসুলকারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি নিজের সংরক্ষিত স্থানে রাখা সম্পদের ব্যাপারে স্বীকার করে নিতো তবুও সেসব সম্পদের জাকাত উসুল করা হতো না, যেমনটি ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। এর উত্তরে আরজ এই যে, স্বীকার করার মাধ্যমে তো অদৃশ্যমান সম্পদের মধ্য থেকে সব সম্পদই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু শাখাগত কিছু ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে মূল বিধান পরিবর্তন করা যায় না এবং রাজস্ব কর্মকর্তাকেও এই অধিকার দেওয়া যেতে পারে না, তিনি যে সম্পদকেই চাইবেন তাকে দৃশ্যমান আখ্যা দিয়ে এর জাকাত উসুল করবেন। এজন্য তাকে এই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার পাশ দিয়ে সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করবে তুমি কেবল তার সেই সম্পদেরই জাকাত উসুল করতে পারবে যা সেসময় তোমার সামনে থাকবে। আর লোকদের ঘর-বাড়ি ও দোকান-পাটে যে সম্পদ থাকে তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তোমার নেই। এই মূলনীতির নিরিখে বলা যায়, সংরক্ষিত স্থানে রক্ষিত সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়নি। আর এ মূলনীতি যখন স্থিরকৃত হয়ে গেলো তখন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনায় কোনো ব্যক্তি যদি নিজের অদৃশ্যমান সম্পদকে রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে স্বীকার করার মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তা হবে এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা যার কারণে এ মূলনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। এজন্য এ অবস্থায়ও মূলনীতি অনুযায়ী তা থেকে জাকাত উসুল করা যাবে না।

হ্যাঁ, কিছু সম্পদ যদি এমন পাওয়া যায় যেগুলোর ধরনই এমন যে, সেগুলো রাষ্ট্রের কাছে কোনো তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্র এসব সম্পদের ব্যাপারে এই প্রজ্ঞাপন জারি করে যে, এসব সম্পদের জাকাত সরকারিভাবে উসুল করা হবে, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং বেতন-ভাতা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকর্তৃক আত্মসাৎকৃত সম্পদ থেকে যে জাকাত উসুল করা হয় এটিও তা জায়েজ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

অন্য কথায় বলা যায়, শহর থেকে সম্পদ বের হওয়া যদিও রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তার জন্য জাকাত উসুল করা বৈধ হওয়ার কারণ, তারপরও এটি রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জাকাত উসুল করার ইচ্ছাধিকারের কারণ নয়, বরং তার জন্য জাকাত উসুল করার অধিকার এ কারণে প্রমাণিত যে, কোনো ধরনের তদন্ত করা ছাড়া প্রকাশ পেয়ে যাওয়া। সুতরাং যেসব সম্পদের ধরন এমন হবে যেগুলো কোনো ধরনের তদন্ত ছাড়াই প্রকাশ পেয়ে যায় সেগুলো থেকে সরকার জাকাত উসুল করার প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে। বিধানটি রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পদের জাকাতের মতো। যেমনটি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

এ কারণেই ফকিহগণ শহর থেকে সম্পদ বের হওয়াকে 'باب فى من يمر على العاشر' (অর্থাৎ, যে সম্পদ নিয়ে রাজস্ব কর্মকর্তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তার অধ্যায়) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর আলোচ্য বিষয় হলো রাজস্ব আদায়কারী ব্যক্তি কোন কোন সম্পদের জাকাত উসুল করতে পারবে? কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের জাকাত উসুল করার অধিকারের বিবরণ থাকে সেখানে 'خروج من المصر' বা 'শহর থেকে সম্পদ বের হওয়াকে' কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় না, বরং এখানে কারণ এটি বর্ণনা করা হয় যে, অদৃশ্যমান সম্পদের মধ্য থেকে জাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে লোকদের সংরক্ষিত স্থানে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন পড়ে। যার ফলে জনসাধারণের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে যেমনটি ফাতহুল কাদিরের উদ্ধৃতিতে ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ.-এর আলোচনাও 'মজলিসে তাহকিকে মাসায়েলে হাজেরা'-এর প্রস্তুতকৃত খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ঋণ হওয়ার মাসআলা

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত উসুল করার ওপর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছিলো তা হলো যখন কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা-পয়সা রাখে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সেই টাকা-পয়সা তখন ব্যাংকের দায়িত্বে ঋণ বলে গণ্য হয়; আমানত বলে নয়। এজন্য এই টাকা-পয়সার ক্ষতিপূরণের দায়ভারও ব্যাংককেই নিতে হয়। এই টাকার ওপর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা সুদ বলে গণ্য হয়। আর

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো টাকা-পয়সা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণ হিসেবে প্রদান করে তখন সেই টাকা-পয়সা এ ব্যক্তির মালিকানা থেকে বের হয়ে ঋণগ্রহীতার মালিকানায় প্রবেশ করে। এখন তার ওপর এ সম্পদের জাকাত আদায় ওই সময় ওয়াজিব হবে যখন তা হস্তগত হবে। এর আগে তার ওপর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না। এজন্য ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার ওপর প্রথম প্রশ্ন এই যে, ব্যক্তির ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার আগেই তা কাটা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই জাকাত ঋণদাতার মাল থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণগ্রহীতার মাল থেকে উসুল করা হয়েছে। অথচ এর কোনো দৃষ্টান্ত শরিয়তে নেই।

আমরা আমাদের নিম্নোক্ত আলোচনায় এ দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। এ দুটি সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের স্বরূপ নির্ধারণ করা জরুরি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি ফিকহের বিবেচনায় ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট ঋণ।[৯০] কিন্তু ঋণদাতার হস্তক্ষেপের বিবেচনায় এটি নতুন পর্যায়ের এমন এক ঋণ যার নজির পূর্ববর্তী ফকিহগণের যুগে ছিলো না। আর এর দৃষ্টান্ত বর্তমান

---

[৯০] অবশ্য যেসব অ্যাকাউন্টের ওপর সুদের লেনদেন কার্যকর হয়, যেমন : সেভিং সঅ্যাকাউন্ট বা ফিক্সড ডিপোজিট। এগুলোর অন্য আরেকটি সম্ভাবনাও গবেষণার যোগ্য। আর তা এই যে, ব্যাংকে রক্ষিত এসব সম্পদ 'শিরকাতে ফাসেদা' বা 'মুদারাবাতে ফাসেদা'-এর মাল হবে। কেননা ফকিহগণ লেখেন—যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে 'শিরকাত' বা 'মুদারাবা' করার সময় লাভের পরিব্যাপ্ত অংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোনো অংশ ধার্য করা হয়, তাহলে 'শিরকাত' ও 'মুদারাবাত' ফাসেদ হয়ে যায়। (শামি) আর 'শিরকাতে ফাসেদা' বা 'মুদারাবাতে ফাসেদা'-এর মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত অংশীদার উভয়পক্ষ নিজেদের মাল ফিরিয়ে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই ব্যবসায় অংশগ্রহণমূলক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। উভয় পক্ষ আপন আপন অংশের মালিক বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় টাকা-পয়সা ঋণ নয়, বরং ব্যবসায়-সম্পদের হুকুমে থাকবে। আর সুদবিহীন অ্যাকাউন্টে একটি সম্ভাবনা এই রয়েছে যে, এগুলো মূলত আমানত। কিন্তু অনুমতির মাধ্যমে মিশ্রিত হওয়ার কারণে এগুলো 'অংশগ্রহণমূলক মালিকানা' হয়ে গেছে। (শামি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪ ও ৮) আর আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর ওপর ভিত্তি করেই সেভিংস অ্যাকাউন্ট-কে 'অংশগ্রহণমূলক মালিকানা' বলে অভিহিত করেছেন। (এমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০৯)

যদি এসব অ্যাকাউন্টের এসব ব্যাখ্যা সঠিক হয়, তাহলে এ জাতীয় অ্যাকাউন্ট ঋণ হওয়ার মাসআলা এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় চিন্তার বিষয় হলো, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এসব অ্যাকাউন্টে রক্ষিত টাকা-পয়সার ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের ওপর থাকে না। অথচ উভয় পক্ষের তরফ থেকেই এগুলোর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি শর্ত হিসেবে উল্লেখ থাকে।

যুগেও খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য জাকাতের বিষয়ে ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে পুরোপুরিভাবে অন্যান্য ঋণ ও করজের সঙ্গে তুলনা করা কোনোক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঋণের ভিতর দেখার বিষয় হলো, এই ঋণ উসুল হওয়ার ব্যাপারে ঋণদাতার আশা কতটুকু এবং ঋণদাতা এই সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কতটুকু রাখে? এরই ওপর ভিত্তি করে ফকিহগণ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঋণকে 'دين قوى' শক্তিশালী ঋণ, 'دين ضعيف' দুর্বল ঋণ ও 'متوسط دين' মধ্যম ঋণ—এই তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। আর এ ভিত্তিতেই অস্বীকারকৃত ঋণকে 'ضمار مال' (এমন সম্পদ যা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই)-এর অন্তর্ভুক্ত করে এর জাকাত প্রদান থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে পর্যালোচনা করবো তখন এগুলো ঋণ হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অন্যান্য সাধারণ ঋণ থেকে একে স্বতন্ত্র বলে দৃষ্টিগোচর হবে। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১. সাধারণ ঋণসমূহের অবস্থা এই হয়ে থাকে যে, ঋণদাতার আয়ত্ত থেকে বের হওয়ার পর সেগুলোতে ঋণদাতার হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকে না, বরং সেগুলো ঋণগ্রহীতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে, যখন সে চায় আদায় করে। পক্ষান্তরে ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে ঋণদাতা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা না দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর এটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তিই নয়, বরং তা ব্যাংকের ব্যতিক্রমহীন ও ধারাবাহিক এমন কর্মপদ্ধতি যা ছাড়া ব্যাংক চলতেই পারে না। এজন্য এটি ঋণের এমন এক পদ্ধতি যাতে ঋণদাতা যখন চায় তখন তাৎক্ষণিকভাবে সে একে নিজ মালিকানায় ফিরিয়ে নিতে পারে। আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটি এমনই নির্ভরযোগ্য যেমন নির্ভরযোগ্য নিজের লোহার সিন্দুকে টাকা পয়সা রাখা। আমরা বলবো, ব্যাংকে রাখা এর চেয়েও বেশি নির্ভরযোগ্য। কেননা, লোহার সিন্দুকের টাকা-পয়সা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিন্তু ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে রক্ষিত টাকা-পয়সার এই আশঙ্কাটুকুও নেই।

২. ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে রক্ষিত টাকা-পয়সায় অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ঠিক তেমনি হস্তক্ষেপ করতে পারে যেমন নিজের আলমারিতে রক্ষিত টাকা-পয়সায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা এই ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের ওপরই সচল রয়েছে এবং অধিকাংশ আদান-প্রদান ব্যাংকের মাধ্যমেই করা হয়।

৩. আজকাল ব্যাংকে টাকা রাখার পর কোনো ব্যক্তি এটি মনে করে না, সে এই টাকা কাউকে ঋণ দিচ্ছে, বরং সে একে নিজের টাকা মনে করে এবং এর সঙ্গে নিজের টাকার মতো আচরণ করে। যখন কোনো ব্যক্তি নিজের উপস্থিত-অনুপস্থিত সম্পদের তালিকা তৈরি করে তখন সে নিজের ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে উপস্থিত সম্পদের মধ্যে গণ্য করে; অনুপস্থিত সম্পদের মধ্যে নয়।

৪. সাধারণ ঋণসমূহের অবস্থা হলো : ঋণের চুক্তির উদ্যোগ ঋণগ্রহীতা গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু এখানে উদ্যোক্তা হলো ঋণদাতা। আর তার আসল উদ্দেশ্য হলো ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে নিজের সম্পদের হেফাজত করা।

সাধারণ ঋণসমূহের মোকাবিলায় ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের এসব পার্থক্যের কারণগুলো ভালোভাবে মনে রেখে ঋণের ওপর জাকাতের মাসআলায় চিন্তাভাবনা করা বাঞ্ছনীয়।

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত উসুল করার ওপর প্রথম প্রশ্ন এই করা হয় যে, ঋণের ওপর যদিও জাকাত ফরজ হয়; কিন্তু তা আদায় করা তখনই ওয়াজিব হয় যখন তা ঋণদাতার কবজায় ফিরে আসে। আর বক্ষ্যমাণ অবস্থায় ঋণদাতার কবজায় আসার আগেই তা থেকে জাকাত কেটে নেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আমাদের নিবেদন হলো (শক্তিশালি) ঋণের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি তো সর্বসম্মত অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. ঋণদাতাকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে, জাকাত আদায় করা তার ওপর ওই সময় ওয়াজিব হবে যখন ঋণের টাকা তার হাতে ফিরে আসবে। সুতরাং যখনই তার হাতে চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ ফিরে আসবে তখনই এক দিরহাম পরিমাণ জাকাত হিসেবে আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব হবে। এই সহজতার প্রেক্ষাপট এবং এর মূল কারণ নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত ও বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে :

১. ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন—

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: « كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا ثُمَّ دَايَنَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ

دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنَ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا.

'হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবদুল কারি উমর রা.-এর শাসনামলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি বলেন, লোকজন ঋণ থেকেও জাকাত গ্রহণ করতো। আর তা এভাবে যে, যখন লোকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার সময় নিকটবর্তী হতো তখন হিসাব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের ঋণের হিসাব করতেন এবং তাদের ঋণের টাকা কর্তন করতেন। আর যা তাদের হাতে বাকি থাকতো তার জাকাত তাদের কবজা করার আগেই উসুল করা হতো। কিন্তু লোকজন এরপর এমন ঋণের আদান-প্রদান শুরু করলো যা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতো। এজন্য দায়িত্বশীলগণ কেবল নগদ ঋণ থেকে জাকাত উসুল করতেন। কিন্তু লোকেরা যখন নিজেদের ঋণ ফেরত পেতেন ও কবজা করতেন তখন অতীত বর্ষসমূহের জাকাতও দিয়ে দিতেন।'[৯১]

এই রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ঋণসমূহের হুকুম মূলত এই ছিলো যে, প্রতি বছর সেগুলোর জাকাত আদায় করা হবে। চাই সেগুলো উসুল করা হোক আর না হোক। কিন্তু যেহেতু কোনো কোনো সময় ঋণদাতাগণ তাদের ঋণের জাকাত আদায় করে দিতো কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসব ঋণ উসুল হতো না তাই এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, ঋণসমূহের জাকাত ঋণ উসুল করার পর দেওয়া হবে। কিন্তু জাকাত যখন আদায় করা হবে তখন অতীত বছরসমূহের জাকাতও আদায় করতে হবে। এতদসত্ত্বেও সাহাবিগণ রা. এবং তাবিয়িগণের একটি বড়ো দলের মাজহাব এই ছিলো যে, ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে ঋণের জাকাত আদায় করার জন্য ঋণ পরিশোধ হওয়ার প্রতীক্ষা করা হবে না। বরং প্রতি বছরই এগুলোর জাকাত আদায় করে দেওয়া হবে। উমর রা., উসমান রা., ইবনু উমর রা., জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রা., জাবের ইবনু জায়েদ রা., মুজাহিদ রা., ইবরাহিম নাখায়ি রহ., মায়মুন ইবনু মিহরান রহ., কাতাদা রা. ও সাইদ ইবনু মুসাইয়েব রা.-এর মাজহাব এটিই ছিলো।[৯২]

---

[৯১] সুনানে বায়হাকি কুবরা, হাদিস: ৭৬২৫।

[৯২] কিতাবুল আমওয়াল-আবু উবায়দ, পৃষ্ঠা : ৪৩৪।

এ মতটিকে ইমাম আবু ওবায়েদ রহ. অগ্রগণ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটিই ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থান এই যে, ঋণ যতই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে হোক না কেন এর মধ্যে যেহেতু আদায় না হওয়ার সম্ভাবনাও আছে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তা মালিকের আয়ত্তে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না। এই মতের সমর্থনে তিনি আলি রা.-এর সেই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন যা ইমাম মুহাম্মাদ রহ. রেওয়ায়েত করেছেন। রেওয়ায়েতটি হলো—

عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا كان ذلك دين على الناس فقبضه فزكاه لما مضى قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة.

'আলি ইবনু আবি তালিব রা. বলেন—যখন কোনো ব্যক্তি লোকদের কাছে ঋণ পায় এরপর সে তা উসুল করে নেয় তখন সে অতীতের জাকাতও প্রদান করবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন—আমরা এ অভিমতটি গ্রহণ করেছি। আর এটিই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত।'[৯৩]

এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায়, ইমাম আবু হানিফা রহ. এই মাসআলায় নিজ মাজহাবের মূল ভিত্তি আলি রা.-এর কথার ওপরই রেখেছেন।

আলি রা.-এর এই রেওয়ায়েত ইমাম বায়হাকি রহ. এবং ইমাম আবু ওবায়দ রহ.-সহ অন্যরা এই শব্দে উল্লেখ করেছেন—

عن علي رضي الله عنه في الدين الظنون قال : إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى.

'যে ঋণ উসুল করা সন্দেহজনক হয় সে ব্যাপারে আলি রা. বলেন, যদি ঋণদাতা সত্যবাদী হয়, তাহলে ঋণ উসুল হওয়ার পর অতীত বর্ষগুলোর জাকাত আদায় করবে।'[৯৪]

ইমাম আবু ওবায়দ রহ. 'الدين الظنون' বা সনেদহজনক ঋণের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন—

---

[৯৩] কিতাবুল আছার, পৃষ্ঠা : ১০৮।
[৯৪] সুনানে বায়হাকি কুবরা, হাদিস : ৭৮৭৩।

وقال أبو عبيد قوله الظنون: هو الذى لا يدرى صاحبه أيقضيه الذى عليه الدين أم لا كأنه الذى لا يرجوه.

'আবু ওবায়দ রহ. সন্দেহজনক ঋণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন—'الدين الظنون' এমন এক ঋণ যার ব্যাপারে ঋণদাতা জানে না, ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি তা পরিশোধ করবে কি না? এ ঋণের ব্যাপারে যেন সে আশাই করে না।'

এই রেওয়ায়েতের সবিস্তার বিবরণ ইবনু আবি শাইবা রহ. এভাবে উল্লেখ করেছেন—

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: «يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِيَ» قَالَ: «يُمْهِلُ فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ»

'হাসান বলেন—আলি রা.-কে এমন একজন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যের কাছে টাকা-পয়সা ঋণ হিসেবে পায়। আলি রা. উত্তরে বলেছেন—ঋণদাতা মহাজন জাকাত আদায় করবে। কিন্তু তার যদি এই আশঙ্কা হয় ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি তা আদায় করবে না, তাহলে সে জাকাত দেবে না। পরবর্তী সময়ে যদি এই ঋণ উসুল হয়, তাহলে তখন তা আদায় করবে।'[৯৫]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এ ব্যাপারে আলি রা.-এর মাজহাব তাই যা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. ও অন্যান্যদের মাজহাব। একটি বিবরণে এসেছে—

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَا: « مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ »

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর বলেন—যে ব্যক্তি কোনো মাল ঋণ দেয় তার ওপর প্রতি বর্ষের জাকাত ওয়াজিব হয়, যদি ঋণগ্রহীতা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হয়।'[৯৬]

আর আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর পূর্ণাঙ্গ শব্দাবলি এই—

[৯৫] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, হাদিস : ১০২৪৬।

[৯৬] সুনানে কুবরা বায়হাকি, হাদিস : ৭৮৭৩।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ , وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

'ইবনু উমর রা. বলেন, তোমরা তোমাদের হাতের সম্পদের জাকাত প্রদান করো। আর তোমাদের যে সম্পদ এমন কোনো ব্যক্তির হাতে ঋণ হিসেবে থাকে যে নির্ভরযোগ্য, তা তোমাদের করায়ত্তে থাকা সম্পদের মতোই। আর যে ঋণ উসুল করা সন্দেহজনক হয় তাতে জাকাত নেই যে পর্যন্ত না তা ঋণদাতা উসুল করতে পারে।'[৯৭]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর এই রেওয়ায়েতের একটি অংশ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-ও উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ঋণের মাসআলায় মালিকি মাজহাবের লোকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি লেখেন—

عن نافع عن ابن عمر رضى الله أنه قال فى الدين يُرْجَى قال زَكِّهِ كُلَّ عَامٍ.

'ইবনু উমর রা. বলেন—যে ঋণ উসুল হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায় প্রতি বছর তার জাকাত প্রদান করবে।'[৯৮]

এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়, হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ এই অধ্যায়ে নিজ মাজহাবের ভিত্তি আলি রা. ও ইবনু উমর রা.-এর অভিমতের ওপর রেখেছেন। তাদের (আলি ও ইবনু উমর রা.) মতে ঋণ ফিরে পাওয়ার পর জাকাত ওয়াজিব হয় কেবল এই অবস্থায় যখন ঋণ ফিরে পাওয়া সংশয়যুক্ত হয় বা তা ফিরে পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকে। আর ঋণ ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে যেখানে নিশ্চয়তা থাকে সেখানে তাদের মতেও ঋণ হাতে আসার আগেই জাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ এই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেছেন যে, প্রচলিত ঋণসমূহ থেকে প্রতিটি ঋণের মধ্যেই—চাই তা যতই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে থাকুক না কেনো তা আদায় না হওয়ার—কিছু না কিছু আশঙ্কা থেকেই যায়। এজন্য তারা আদায় হওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য প্রতিটি 'শক্তিশালি ঋণ'কে সংশয়যুক্ত ঋণ অভিহিত করে এর সাধারণ হুকুম এভাবে বর্ণনা করেছেন

---

[৯৭] সুনানে কুবরা বায়হাকি, হাদিস : ৭৬২৪।

[৯৮] কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদিনা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭২।

যে, এমন ঋণের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে বটে, তবে তা আদায় করা তখনই অপরিহার্য হবে যখন সেই ঋণ মহাজনের হস্তগত হবে।

এ বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা যখন ব্যাংক-অ্যাকাউন্টকে পর্যবেক্ষণ করবো এবং সাধারণ ঋণসমূহের মোকাবিলায় এর পূর্ব বর্ণিত পার্থক্যগুলোতে নিরীক্ষণ করবো তখন আমাদের সামনে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট শক্তিশালী ঋণের এমন একটি প্রকার, পূর্ববর্তী ফকিহগণের যুগে যার অস্তিত্ব ছিলো না। থাকলেও তা ছিলো খুবই নগন্য। এ প্রকার ঋণকে 'আদায় হওয়ার ব্যাপারে সংশয়যুক্ত ঋণ' কিছুতেই বলা যায় না। এ ঋণ—'প্রাপ্তির নিশ্চয়তায়', 'মহাজনের হস্তক্ষেপের বিবেচনায়' এবং সাধারণ প্রচলনের নিরিখে এতটুকু অধিকারে ও মালিকানায় থাকে, যেন ঋণদাতার নিজের ঘরেই বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য উমর রা.-এর উক্তি 'بمنزلة ما فى ايديكم' এর প্রয়োগ ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের চেয়ে বেশি অন্য কোনো ঋণের ওপর হতে পারে না।

এছাড়া ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য যদি অন্যান্য ঋণের মতো তা নগদ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে এ কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এত সমস্যা সৃষ্টি হবে যে, জাকাত সঠিকভাবে আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ইমাম আবু ওবায়দ রহ. সাধারণ ঋণসমূহের ব্যাপারেও এটি বলেছেন—

وإنما إختاروا أو من اختار منهم تزكية الدين مع عين المال لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد ولم يقم بأدائها وذلك إن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم الخمسة والعشرة وأكثر من ذلك وأقل فهو يحتاج فى كل درهم يقتضيه فما فوق ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه وفى أقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط فلهذا أخذوا له با الاحتياط فقالوا يزكيه مع جملة ماله فى رأس الحول وهو عندى وجه الأمر

'যেসব আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ঋণের জাকাত মূল সম্পদের সঙ্গেই আদায় করা হবে তারা এ মাজহাবকে এজন্য অবলম্বন করেছেন, যে ব্যক্তি ঋণের জাকাত আদায় করাকে তা হাতে ফিরে

পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিলম্বিত করবে সে ঋণের জাকাতকে তার পরিমাণ জেনে সেই অনুযায়ী সঠিকভাবে আদায় করতে পারবে না। কেননা, ঋণ অনেক সময় কিস্তির মাধ্যমে আদায় হয়ে থাকে। যেমন : কখনো পাঁচ টাকা আবার কখনো দশ টাকা, কখনো আরও বেশি কিংবা কম। এখন ঋণদাতা ব্যক্তি যে টাকাই প্রাপ্ত হবে তার ব্যাপারে তাকে জানতে হবে, এই টাকা কত বছর, কত মাস ও কত দিন আয়ত্ত হতে বাইরে ছিলো। এরপর তাকে এই হিসাব অনুযায়ী জাকাত আদায় করতে হবে। আর এভাবে জাকাত আদায় করতে গেলে কষ্ট ও ত্রুটি হওয়ার বড়ো সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে এমন ব্যক্তির জন্য ফকিহগণ সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তি প্রতি বছর নিজের অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে ঋণের জাকাতও আদায় করে দেবে। আর এটিই আমার কাছে সঠিক পদ্ধতি।'[৯৯]

সাধারণ ঋণসমূহের ব্যাপারে এই সমস্যা গোচরীভূত হোক বা না হোক ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে এ প্রকার হিসাব-নিকাশ কার্যক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। কেননা, সাধারণত এসব অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো কোনো সময় এক দিনে কয়েকবার টাকা উত্তোলন করা হয় আবার জমা দেওয়া হয়। ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করার পর তার জাকাত আদায় করার পদ্ধতি এই হতে পারে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের মালিক নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত টাকার ব্যাপারে এই রেকর্ড পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করবে যে, এসব টাকা ব্যাংকে কতদিন রক্ষিত ছিলো যাতে সে তার ওপর ওয়াজিব হওয়া অতীত বছরসমূহের জাকাত আদায় করতে পারে। আর যখন সে কোনো টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করবে তখন প্রথমে এই হিসাব করবে যে, এই টাকা ব্যাংকে কতদিন ছিলো এবং তার ওপর কত টাকা ওয়াজিব হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে একে বাস্তবায়ন করা কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খোদ হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ বছরের মাঝে অর্জিত হওয়া সম্পদের জন্য আলাদা বর্ষ গণনা না করার একটি প্রমাণ এই পেশ করেছেন যে, কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। যেমন : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বছরের মাঝে লাভ অর্জিত সম্পদকে আলাদা বর্ষ হিসেবে গণনাকারীদের সমালোচনা করে লিখেছেন—

---

[৯৯] কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা : ৪৩৪।

يَنْبَغِي لصَاحب هَذَا المَال ان يقْعد حسابا يحسبون لَهُ زَكَاة مَاله مَتى تجب ارايتم الرجل اذا كَانَ يُفِيد الْيَوْم الْفَا وَغدا الفين وَبعد غَد ثَلَاثَة آلَاف وَبعد ذَلِك خَمْسَة آلَاف وَبعد ذَلِك بِعشْرين يَوْمًا عشرَة آلَاف أينبغي لَهُ ان يُزكي كل مَال من هَذِه الاموال على حِدة وَهَذَا قَول ضيق لَا يُوَافق مَا عَلَيْهِ النَّاس يَنْبَغِي لَهُ ان يجمع مَال كُله ثمَّ يُزَكِّيه اذا وَجَبت الزَّكَاة على مَاله الاول.

'(এসব ফকিহের উক্তি অনুযায়ী) প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য উচিত হলো একজন হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করা, যে তার সম্পদের জাকাতের হিসাব করবে, তার ওপর কখন জাকাত ওয়াজিব হয়? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যখন কোনো ব্যক্তি আজ এক হাজার টাকা অর্জন করে কাল দুই হাজার টাকা অর্জন করে পরশু তিন হাজার টাকা অর্জন করলো এরপর কোনো দিন সে পাঁচ হাজার টাকা অর্জন করলো এবং বিশ দিন পর দশ হাজার টাকা অর্জন করলো; তার জন্য কি এটি সম্ভব যে, সে প্রতিটি টাকার আলাদা জাকাত আদায় করবে? এটি সংকীর্ণধর্মী কথা যা মানুষের প্রচলনের অনুকূল নয়। এর পরিবর্তে তার জন্য সহজ প্রক্রিয়া হলো সে তার সম্পদ সঞ্চয় করবে এরপর তার পুরো সম্পদের জাকাত একসঙ্গে সেদিন আদায় করে দেবে যেদিন সর্বপ্রথম তার ওপর জাকাত ফরজ হয়েছিলো।'[১০০]

আর ইবরাহিম নাখায়ি রহ. হলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যার উক্তিসমূহ ফিকহে হানাফির শীর্ষস্থানীয় মূল উৎস। তার একটি উক্তি ইমাম ইবনু আবি শাইবা রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন—

وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه ومن كان له من دين ثقة فليزكه.

'যে ব্যক্তির নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তির কাছে ঋণ পাওনা থাকে সে যেন এর জাকাত প্রদান করে। আর যে ঋণ স্থির হয় না, যেমন আজ দেয় তো দুদিন পর উসুল করে নেয়, তার জাকাতও যেন সে প্রদান করে।'[১০১]

---

[১০০] কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনাহ, পৃষ্ঠা : ৪৯১, ৪৯২।

[১০১] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬২।

এ উক্তির উদ্দেশ্যও সম্ভবত এটিই যে, ঋণের যে টাকা আসা-যাওয়া করতে থাকে সেগুলোর পৃথক পৃথক হিসাব রাখা যেহেতু কঠিন সেহেতু সেগুলোর জাকাত একসঙ্গে আদায় করাই সমীচীন। আর এ প্রকার ঋণের যে পূর্ণাঙ্গ উপমা ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট; সম্ভবত এমন পূর্ণাঙ্গ উপমা অন্যান্য ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং এসব প্রমাণের আলোকে ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত উসুল করার ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করা সঠিক নয় যে, জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার আগেই তা উসুল করে নেওয়া হচ্ছে। বরং আলোচ্য প্রমাণসমূহের আলোকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব অ্যাকাউন্টের জাকাত আদায় করাও ওই সময়ই ওয়াজিব হয়ে যায় যখন অন্যান্য সম্পদের বর্ষ পূর্ণ হয়।

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট 'ঋণ' হওয়ার ওপর ভিত্তি করে তা থেকে জাকাত কেটে নেওয়ার ওপর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো, যখন কোনো ব্যক্তি ব্যাংককে কোনো টাকা ঋণ দেয় তখন সেই টাকা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে ব্যাংকের মালিকানায় প্রবেশ করে। সুতরাং রাষ্ট্র যে টাকা থেকে জাকাত উসুল করছে তা ব্যাংকের মালিকানায় রয়েছে। আর শরিয়তে এর কোনো নজির নেই যে, এক ব্যক্তির জাকাত অন্যের সম্পদ থেকে উসুল করা হবে।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই, যেসব ঋণের প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের মতো সুনিশ্চিত হবে তার জাকাত উসুল করার প্রচুর নজির রয়েছে। সেই ঋণ মহাজনের মালিকানায় ধরে তা থেকে জাকাত উসুল করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো—

এক. ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দিক রা. উমর রা. ও উসমান রা. জাকাতের টাকা বেতন-ভাতা থেকে কেটে নিতেন। ইতোপূর্বে ইমাম আবু ওবায়দ রহ.-এর রেওয়ায়েতের এসকল শব্দ অতিক্রান্ত হয়েছে—

فإن أخبره أن عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مما يريد أن يعطيه.

'(আবু বকর রা.-এর জিজ্ঞেসের পর) যদি সেই ব্যক্তি বলতো, তার কাছে এমন সম্পদ রয়েছে যার ওপর জাকাত ওয়াজিব, তাহলে তিনি তাকে যা বেতন দিতে চাইতেন তা থেকে জাকাত কেটে নিতেন।'[১০২]

---

[১০২] কিতাবুল আমওয়াল-আবু ওবায়দ, পৃষ্ঠা : ৪১১।

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বেতন-ভাতা উসুল করার আগে তা বায়তুল মাল ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে ঋণ হিসেবে ছিলো। আর এই বেতন-ভাতার ওপর যেহেতু ভাতা প্রাপকের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না তাই সেই বেতন-ভাতা প্রকৃতপক্ষে তার মালিকানায় ছিলো না। কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই তা থেকে জাকাত এজন্য উসুল করা হতো যে, এ ঋণের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বেতন প্রাপকের মালিকানায় চলে এসেছে বলে ধরে নেওয়া হতো। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ ঘটনা আপন মুয়াত্তায় উল্লেখ করে এই শিরোনাম দিয়েছেন—

(باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه الزكاة)

'যে ব্যক্তি অন্যের কাছে ঋণ পায় তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না তার অধ্যায়।' এরপর তিনি এ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন,

وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا سلم إليه عطائه.

'কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ রহ. বলেন—আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদেরকে তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করতেন তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে কি এমন কোনো সম্পদ আছে যার ফলে তোমার ওপর জাকাত ওয়াজিব? এরপর সে যদি 'হ্যাঁ' বলতো, তাহলে তিনি তার বেতন থেকে ওই সম্পদের জাকাত কেটে রেখে দিতেন। আর সে যদি না বলতো, তাহলে জাকাত কর্তন না করে তাকে তার প্রাপ্য বেতন দিয়ে দিতেন।'

এরপর তিনি লেখেন—

قال محمد : وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

'ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন—'আমরা এ মতটি গ্রহণ করেছি। আর এটিই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত।'[১০৩]

মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানি রহ. আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর রা.-এর কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করার পর লেখেন—

---

[১০৩] মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা : ১৭০।

وفيه دلالة على انهم كانوا يأخذون زكاة العطاء لكونه دينا مستحقا على بيت المال والا لم يكن لأخذ الزكاة منه معنى.

'এসব রেওয়ায়েতের আলোকে জানা যায়, তারা বেতন-ভাতা থেকে জাকাত উসুল করতেন, কারণ সেগুলো বাইতুল মালের ওপর সুনিশ্চিত ঋণ ছিলো। (অথচ বেতন-ভাতার ঋণ করজের ঋণের চেয়ে দুর্বল) অন্যথায় এসব বেতন থেকে জাকাত উসুল করার কোনো অর্থ থাকতে পারে না।'[১০৪]

এসব উদ্ধৃতি ও রেওয়ায়েতের মধ্যে এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, ফিরে পাওয়া নিশ্চিত এমন ঋণ আয়ত্তে আসার আগেই তা থেকে জাকাত উসুল করা যায়। কেননা, ফিরে পাওয়া নিশ্চিত হওয়ার কারণে ধরে নেওয়া হয় যেন তা মালিকের আয়ত্তে চলে এসেছে।

দুই. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর ব্যাপারে ইমাম আবু ওবায়দ রহ. বলেন—

عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال اليتامى فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك يخرج زكاتها كل عام من أموالهم وهي دين عليه.

'নাফে বলেন—আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর তত্ত্বাবধানে পিতৃহীন-অনাথদের সম্পদ থাকতো। তিনি তাদের সম্পদকে নিজ দায়িত্বে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন; যাতে সেগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি প্রতি বছর তাদের সম্পদের জাকাত বের করতেন, অথচ তা তার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকতো।'[১০৫]

এখানে এই মাসআলা তো স্বতন্ত্র যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালেগের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কিনা। আর আলোচ্য রেওয়ায়েতের এতিমগণ দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক এতিমগণ উদ্দেশ্য না অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিমগণ? কিন্তু এখানে যে বিষয়টি চিন্তার তা হলো আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. এতিমদের ওপর জাকাত দেওয়া ফরজ বলে মনে করতেন এবং তাদের সম্পদকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন। এরপর তিনি এ সম্পদ ঋণ থাকা অবস্থায়ই তার জাকাত উসুল

---

[১০৪] ইলাউস সুনান, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।

[১০৫] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ৭০০১।

করতেন। এ পদ্ধতিটি আজকের ব্যাংক-অ্যাকাউন্টের পদ্ধতির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ না করে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো : এসব সম্পদকে জামানতযোগ্য অর্থাৎ, ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যোগ্য বানানো। আর এসব টাকা আবদুল্লাহ্ ইবনু উমর রা.-এর মালিকানায় এসে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি সেগুলোর আসল মালিকের জাকাত আদায় করেছেন। এর মাধ্যমেও প্রতীয়মান হয়, ঋণ ফিরে পাওয়ার বিষয়টি যদি সুনিশ্চিত হয়, তাহলে তাকে ঋণদাতার মালিকানায় ধরে তা থেকে জাকাত উসুল করা যায়।

জাকাতে নিয়তের মাসআলা

ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত উসুল করার ওপর তৃতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিলো তা ছিলো, ব্যাংকসমূহ থেকে জোরপূর্বক জাকাত উসুল করা অবস্থায় জাকাতদাতার নিয়ত পাওয়া যায় না। অথচ জাকাত আদায় হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত।

এ ব্যাপারে মজলিসের পূর্ববর্তী লেখায় আরজ করা হয়েছিলো, যেসব সম্পদের জাকাত উসুল করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে সেসব সম্পদের জাকাত যদি রাষ্ট্র উসুল করে নেয়, তাহলে তা নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। আর এর প্রমাণ হিসেবে আল্লামা শামি রহ.-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছিলো—

وَفِي مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ إِذَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ كُرْهًا فَوَضَعَهَا مَوْضِعَهَا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ فَقَامَ أَخْذُهُ مَقَامَ دَفْعِ الْمَالِكِ. وَفِي الْقُنْيَةِ: فِيهِ إِشْكَالٌ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ فِيهِ شَرْطٌ وَلَمْ تُوجَدْ مِنْهُ. اهـ قُلْت: قَوْلُ الْكَرْخِيِّ فَقَامَ أَخْذُهُ إلَخْ يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ تَأَمَّلْ.

'মুখতাসারুল কারখিতে আছে, যদি রাষ্ট্রপ্রধান জোরপূর্বক জাকাত কেটে এবং একে যথাস্থানে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধানের জাকাত উসুল করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং তার গ্রহণ করে নেওয়াই মালিকের জাকাত প্রদানের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে। আর 'আলকুনইয়া' গ্রন্থে আছে, এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; আর তা হলো জাকাত দানের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। অথচ এখানে মালিকের নিয়ত পাওয়া যায়নি। আল্লামা শামি বলেন—ইমাম কারখি

রহ.-এর উক্তি 'তার গ্রহণ করে নেওয়াই মালিকের জাকাত প্রদানের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য' এর মধ্যেই এ প্রশ্নের নিরসন রয়েছে।'[১০৬]

এই অভিমতের ওপর কোনো কোনো আলেম প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আল্লামা শামি রহ. এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর লিখেছেন—

ثُمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْمُفْتَى بِهِ التَّفْصِيلُ إِنْ كَانَ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ يَسْقُطُ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَايَةَ أَخْذِهَا، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهَا مَوْضِعَهَا لَا يَبْطُلُ أَخْذُهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَاطِنَةِ فَلَا.

'এরপর আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে, যার ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে তাতে কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে। যদি তা দৃশ্যমান সম্পদে হয়, তাহলে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধির জন্য এর জাকাত গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। যদি তিনি একে জাকাত ব্যয়ের খাতে ব্যয় না করেন, তাহলেও তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা বাতিল হবে না। আর যদি তা অদৃশ্যমান সম্পদে হয়, তাহলে তা আদায় হবে না।

উল্লিখিত উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, যদি অদৃশ্যমান সম্পদের জাকাত জোরপূর্বকভাবে উসুল করা হয়, তাহলে তা আদায় হবে না।

এ ব্যাপারে আমাদের আরজ এই যে, 'মজলিস' নিজের পূর্ববর্তী লেখায় যেসব শব্দ লিখেছিলো তা ছিলো 'রাষ্ট্রের জন্য যেসব সম্পদের জাকাত উসুল করার অধিকার রয়েছে রাষ্ট্র যদি সেগুলো থেকে জাকাত উসুল করে নেয়, তাহলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই জাকাতদাতার নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে।' এটি মজলিস উল্লিখিত উদ্ধৃতির আলোকেই লিখেছিলো। কেননা, আলোচ্য উদ্ধৃতির ভিত্তি এ কথার ওপর যে, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জাকাত গ্রহণ করার অধিকার আছে কি না। আর রাষ্ট্রের ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত গ্রহণ করার অধিকার থাকার বিষয়টি ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। এজন্য আলোচ্য মাসআলায় উল্লিখিত উদ্ধৃতির কারণে এর হুকুম ও বিধানে কোনো ধরনের পার্থক্য সূচিত হবে না।[১০৭]

আর যেসব সম্পদের জাকাত গ্রহণ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে সেগুলোর

---

[১০৬] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৩৫।

[১০৭] ইতোপূর্বে এটিও আলোচনা করা হয়েছে যে, ব্যাংক একাউন্ট দৃশ্যমান সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই উত্তরও এ ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।

জাকাত যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করে, তাহলে তা নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাওয়া চার ইমামের মাজহাব মতেই স্বীকৃত। যদিও ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. নিয়তের মাসআলায় অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেন যে, কোনো কোনো অবস্থায় আকার ইঙ্গিতে নিয়ত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তারা একে মানতে চান না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—যদি কোনো ব্যক্তি নিজের সমুদয় সম্পদ বিনা নিয়তে দান করে দেয়, তাহলে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণের ভাষ্য অনুযায়ী তার জাকাত রহিত হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী তা রহিত হয় না।[১০৮]

কিন্তু রাষ্ট্রকর্তৃক জাকাত গ্রহণ করার ধারাবাহিকতায় ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-ও এ ব্যাপারে একমত যে, তা নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। মালিকি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাওয়াহিবুল জলিল'এ উল্লেখ আছে—

> إذا أخرج رجل الزكاة بغير علم من هى عليه وغير إذنه فى ذلك فإن كان مخرج الزكاة الإمام فالزكاة مجزئة.
>
> 'যে ব্যক্তির ওপর জাকাত ওয়াজিব তার অজ্ঞাতসারে ও অনুমতি ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে জাকাত উসুল করে নেয় এবং উসুলকারী ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হয়, তাহলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে।'[১০৯]

আর শাফিয়ি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নিহায়াতুল মুহতাজ'-এ উল্লেখ আছে—

> الأصح عند الشافعية أن نية السلطان تكفى إذا أخذ زكاة الممتنع.
>
> 'শাফিয়ি মাজহাবের সবচেয়ে সহিহ অভিমত হলো রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়তই যথেষ্ট হবে যখন তিনি জাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারী ব্যক্তির জাকাত উসুল করবেন।'[১১০]

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. লেখেন—

> ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.

---

[১০৮] আল মুগনি, ইবনু কুদামা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৩৯।

[১০৯] মাওয়াহিবুল জালিল, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫৬।

[১১০] নিহায়াতুল মুহতাজ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৮।

'নিয়ত করা ছাড়া জাকাত দেওয়া জায়েজ হবে না। তবে রাষ্ট্রপ্রধান যদি জোরপূর্বক জাকাত গ্রহণ করেন, তাহলে তা জায়েজ আছে।'[১১১]

এই আলোচিত বিশদ ব্যাখ্যা তো জাকাত কেটে নেওয়ার সময় জাকাত আদায় হওয়া না হওয়ার বিষয়ে ছিলো। (অর্থাৎ, ওই সময় নিয়ত করা ছাড়া জাকাত আদায় হবে কি না) তবে যদি কারও মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে জাকাত কেটে নেওয়ার পরপরই সে নিয়ত করে নিতে পারে। কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি কারও সম্পদের জাকাত আদায় করে দেয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সম্পদ ফকিরের (বা তার উকিলের) হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মূল মালিকের জন্য জাকাতের নিয়ত করার সুযোগ রয়েছে। এতে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

এর স্পষ্ট বিবরণ হানাফি মাজহাবের ফকিহগণের বক্তব্যে উল্লেখ রয়েছে। যেমন ফাতাওয়া আলমগিরিতে আছে—

رجل أدى زكاة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه المالك فإن كان المال قائما فى يد الفقير جاز وإلا فلا كذا فى السراجية

'যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির জাকাত সেই ব্যক্তির সম্পদ থেকে আদায় করে দেয় এরপর মালিক এর অনুমতি প্রদান করে, তাহলে এ সম্পদ যদি ফকিরের হাতে থাকে তাহলে তা জায়েজ হবে। অন্যথায় জায়েজ হবে না। সিরাজিয়্যা গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ আছে।'[১১২]

মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

এই মাসআলা যারা সত্যায়ন করেছেন—

১. মাওলানা মুফতি ওলি হাসান,
দারুল ইফতা : জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি।

২. মাওলানা মুফতি রশিদ আহমাদ,
দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, নাজিমাবাদ, করাচি।

---

[১১১] আল মুগনি-ইবনু কুদামা, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ২৩৮।

[১১২] ফতোওয়ায়ে আলমগিরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭১।

৩. মাওলানা মুফতি সাবহান মাহমুদ,
দারুল উলুম, করাচি।

৪. মাওলানা মুফতি আবদুল হাকিম,
মাদরাসা আশরাফিয়া, সাখখার।

৫. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ রফি উসমানি,
মুহতামিম, দারুল উলুম, করাচি।

৬. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি,
দারুল উলুম, করাচি।

৭. মাওলানা মুফতি আবদুর রাউফ সাখ্খারবি,
দারুল উলুম, করাচি।

৮. মাওলানা মুফতি ওয়াজিহুল্লাহ,
দারুল উলুম বাগ, জেলা কাচ্চি, বেলুচিস্থান।

ইসলামে খুলা তালাকের বাস্তবতা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

সকল ফকিহ্ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, 'খুলা' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এমন এক চুক্তি যা সম্পাদিত হওয়া তাদের উভয় পক্ষের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের কোনো কোনো মাননীয় বিচারপতি এই রায় ঘোষণা করেন, যদি আদালতের অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই ফলাফল বের হয়, স্বামী-স্ত্রী মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলে আদালত স্বামীর সম্মতি ছাড়াই খুলা চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) এ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম
মাকতাবাতুল ইসলাম

ইসলামে খুলা তালাকের বাস্তবতা

সংজ্ঞা : যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কোনো কারণে এত অপছন্দ করে যে, তার সঙ্গে কোনোভাবেই ঘর-সংসার করা সম্ভব না হয়, তাহলে এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো সে স্বামীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে তালাক দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে। এ অবস্থায় স্বামীর জন্যও করণীয় হলো যখন স্ত্রী বৈবাহিক সম্পর্ককে হৃষ্টচিত্তে মেনে নিচ্ছে না এবং স্বামী অনুধাবন করতে পারছে যে, এখন এ সম্পর্ক বহাল রাখা একটি অসহ্যকর বোঝা বহন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন সে ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে আপন স্ত্রীকে এক[১১৩] তালাক প্রদান করে ছেড়ে দেবে; যাতে ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে চলে যেতে পারে।

কিন্তু স্বামী যদি এতে সম্মত না হয়, তাহলে স্ত্রীকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে, সে আর্থিক কিছু বিনিময় পেশ করে তাকে মুক্ত করার জন্য স্বামীকে উৎসাহিত করতে পারবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সাধারণত নারীরা মোহর মাফ

---

[১১৩] তালাক দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো যে সময় স্ত্রী পবিত্র হবে সে সময় তাকে কেবল এক তালাক দেওয়া হবে। তালাক শব্দ কেবল একবারই ব্যবহার করা হবে। এরপর স্ত্রী হতে আলাদা জীবনযাপন করা হবে। আর এভাবে ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী মুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের সমাজে এই প্রচলন চরম আকার ধারণ করেছে, যখন তালাকের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় তখন স্বামী তিন তালাকের চেয়ে কম দেয় না। খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত, একই সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক গুনাহ। এই গুনাহের পার্থিব শাস্তি হলো এরপর যদি স্বামী-স্ত্রী পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে হিলা-শরা ছাড়া বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। আজকাল লোকেরা প্রচুর পরিমাণে এই গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে লজ্জিত ও পেরেশান হচ্ছে।

করে দিয়ে থাকে এবং স্বামী একে গ্রহণ করে স্ত্রীকে আজাদ করে দেয়। এ কাজের জন্য ইসলামি শরিয়ত যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে خلع বলা হয়।

خلع শব্দটি আরবি। তা নির্গত হয়েছে خلع থেকে। এর অর্থ হলো খুলে ফেলা। আরবগণ বলে থাকে خَلَعْتُ اللِّبَاسَ আমি পোশাক খুলে ফেলেছি। এ শব্দটিকে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের জন্য এ কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে স্বামী এবং স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর خلع-এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের এই অদৃশ্য পোশাক খুলে ফেলে।[১১৪]

আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. خلع এর পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন—

إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع.

'খুলা শব্দের মাধ্যমে বিনিময় নিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক রহিত করাকে খুলা বলা হয়।'[১১৫]

বিয়ে এবং শরয়ি অন্যান্য লেনদেনের মতো খুলাও ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু বাড়াবাড়ি যদি পুরুষের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে প্রায় সকল ফকিহের ঐকমত্য অনুযায়ী স্বামীর জন্য বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। তার জন্য সমীচীন হলো কোনো ধরনের বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া। এই অবস্থায় যদি স্বামী কোনো বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে সে মারাত্মক গুনাহগার হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে—

وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا.

'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে?'[১১৬]

---

[১১৪] আল মুগরিব, আল মুতাররেজি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৫; ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৯।

[১১৫] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৯।

[১১৬] সুরা নিসা, আয়াত : ২০।

তবে বাড়াবাড়ি যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, এবং সে-ই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, তাহলে এ অবস্থায় স্বামীর জন্য বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ আছে। কিন্তু উত্তম হলো এই বিনিময় যেন নির্ধারিত মোহরের চেয়ে বেশি না হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যদি এই বিনিময় নির্ধারিত মোহরের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলেও خلع সহিহ হবে এবং স্ত্রীকে চুক্তিকৃত পুরো বিনিময় প্রদান করতে হবে।[১১৭]

এটিই পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ . فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ.

'আর নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয়, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে সক্ষম হবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তাহলে উভয়ের কোনো পাপ নেই।'[১১৮]

খুলা চুক্তি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পন্ন করতে পারে। কোনো কোনো ফকিহ খুলা চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়াকে জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. ও অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের মতে এ চুক্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিক্রমে সম্পন্ন হতে পারে। আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।[১১৯]

এরপর এ বিষয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে, (خلع) খুলা চুক্তি তালাক হিসেবে গণ্য হবে নাকি (فسخ) বিয়ে-বিচ্ছেদ হিসেবে গণ্য হবে। উমর রা., আলি রা., আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা., সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রা., হাসান বসরি রহ., আতা রহ., কাজি শুরাইহ রহ., শাবি রহ., ইবরাহিম নাখায়ি রহ., জাবের ইবনু

[১১৭] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮৩, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫০।

[১১৮] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

[১১৯] মাবসুত সারাখসি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৩; আল মুগনি ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫২; আল জামিয়ু লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৮; কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০০।

জায়েদ রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম আবু হানিফা রহ., সুফিয়ান সাওরি রহ., ইমাম আরজায়ি রহ. এবং সহিহ উক্তি অনুযায়ী ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমত হলো খুলা চুক্তি তালাক। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., উসমান রা., তাউস রহ., ইকরিমা রহ., ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ., ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ রহ,. আবু সাওর রহ. এবং ইমাম দাউদ জাহেরি রহ.-এর অভিমত হলো খুলা চুক্তি তালাক নয়, বরং তা (فسخ) বিয়ে-বিচ্ছেদ। এর ওপর তালাকের বিধান প্রয়োগ হবে না। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর প্রথম অভিমত এটিই ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি আমাদের প্রথমোক্ত মাজহাবকে অবলম্বন করেছেন।[১২০]

এই মতভেদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলাম পুরুষকে তিন তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। যদি সে এই তিন তালাক একই সময়ে প্রয়োগ করার গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে সে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং হিলা-শরা ছাড়া দ্বিতীয়বার তাকে বিয়েও করতে পারবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে কেবল এক তালাক প্রদান করে, তাহলে তার জন্য তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করার অধিকার থাকে। এখন যদি সেই ব্যক্তি তার এ অধিকার প্রয়োগ করে স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়, তাহলে যেহেতু সে প্রথমে এক তালাক ব্যবহার করেছে তাই এখন তার জন্য কেবল দুই তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে। এখন যদি সে দুই তালাক প্রয়োগ করে, তাহলে পুনরায় সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। হিলা ছাড়া দ্বিতীয়বার তাকে বিয়েও করতে পারবে না।

এখন যেসব আলেমগণ খুলা চুক্তিকে তালাক বলে গণ্য করেন তাদের মতে যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে একবার খুলা-চুক্তি সম্পন্ন করবে সেই চুক্তি তালাক বলে গণ্য হবে। এখন যদি সেই ব্যক্তি স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নেয়, তাহলে এখন তার কেবল দুই তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে। এখন যদি সে কেবল দুই তালাক প্রদান করে, তাহলেও তা এমন চূড়ান্ত তালাক বলে গণ্য হবে যারপর স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা হিলা ছাড়া সম্ভব হবে না। কিন্তু যেসব আলেম খুলাকে (فسخ) বিয়ে-বিচ্ছেদ বলে আখ্যায়িত করেছেন তাদের মতে খুলা করার পর যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই স্বামী তিন তালাকের অধিকারী থাকবে এবং কেবল

[১২০] তাফসিরে ইবনু কাসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৫।

দুই তালাকের মাধ্যমেই স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কেননা, খুলা এখানে তালাক হিসেবে গণ্য হয়নি।[১২১]

কিন্তু এ বিষয়েও ফকিহগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, খুলা চুক্তি সম্পাদন করার কারণে স্ত্রী স্বামী থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর স্বামী একতরফাভাবে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। তবে স্বামী এবং স্ত্রী যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে তা সম্পাদন করার অবকাশ রয়েছে। কেবল সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রহ. ও ইবনু শিহাব রহ. থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইদ্দত চলাকালে পুরুষ যদি খুলা চুক্তির বিনিময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সে একতরফাভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকিহ এ অভিমত গ্রহণ করেননি।

বিনিময় দিয়ে তালাক অর্জন করার ক্ষেত্রে خلع শব্দ ছাড়াও "فديه' 'صلح' 'مبارات' طلاق على مال" শব্দগুলো প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ শব্দগুলোর মধ্যকার পার্থক্য কেবল শব্দগত, অর্থগত নয়। এজন্য শব্দগুলো একটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য মালিকি মাজহাবের কোনো কোনো ফকিহ এ শব্দগুলোর পারিভাষিক পার্থক্য এভাবে বর্ণনা করেছেন—

'স্ত্রী যদি পুরো মোহরের বিনিময়ে তালাক লাভ করে, তাহলে তাকে খুলা বলা হয়। আর মোহরের অংশ বিশেষের বিনিময়ে যদি তালাক লাভ করে, তাহলে তাকে فديه (ফিদিয়া) বলা হয়। আর তালাক লাভ করার জন্য যদি মোহরের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তাকে সুলাহ (صلح) বলা হয়। আর স্ত্রী যদি তালাকের বিনিময়ে নিজের অন্য কোনো অধিকার রহিত করে দেয়, তাহলে তাকে (مبارات) মুবারাত বলা হয়।[১২২]

আলোচ্য মাসআলার বিশদ বিবরণ

খুলা এবং এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এজন্য পেশ করা হয়েছে; যাতে সামনের আলোচনাগুলো অনুধাবন করা আমাদের জন্য সহজ হয়। এ প্রবন্ধে খুলা চুক্তির সমুদয় বিধান আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের উদ্দেশ্য কেবল খুলা সংক্রান্ত একটি বিশেষ মাসআলা আলোচনা করা যা কয়েক বছর

[১২১] মাবসুত, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৩।

[১২২] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৬; ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৩২।

যাবৎ আমাদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা এর বিশদ বিবরণ সামনে পেশ করবো।

আজ পর্যন্ত সকল ফকিহ্ ও মুজতাহিদ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন যে, খুলা চুক্তি স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিপূর্ণ লেনদেন ও এমন এক আদানপ্রদান যা উভয় পক্ষের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। এজন্য তাদের কেউ কাউকে খুলা চুক্তি সম্পন্ন করতে বাধ্য করতে পারবে না। স্বামীর জন্যও এই অধিকার নেই, সে স্ত্রীকে খুলা করতে আইনগতভাবে বাধ্য করবে। আবার স্ত্রীর জন্যও এই অধিকার নেই, সে স্বামীকে আইনের শক্তিবলে খুলা করতে বাধ্য করাবে।

অখণ্ড ভারত এবং পাকিস্তানের আদালতসমূহ মুসলিমদের মোকদ্দমাসমূহে এই মূলনীতি অনুযায়ী রায় দিয়ে আসছিলো। এ ব্যাপারে উমর বিবি বনাম মুহাম্মাদ দীন এবং সাইদা খানম বনাম মুহাম্মাদ মাসিহ-এর দুটি মোকাদ্দমা যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। উমর বিবি বনাম মুহাম্মাদ দীন-এর মোকাদ্দমায় জাস্টিস আবদুর রহমান এবং জাস্টিস হার্নস ঐকমত্য পোষণ করে এই রায় প্রদান করেছিলেন, স্ত্রী তার স্বামীর সম্মতি ছাড়া খুলা চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না।[১২৩]

এমনিভাবে সাইদা খানম বনাম মুহাম্মাদ মাসিহ-এর মোকাদ্দমায় বিচারপতি এ.আর. কার্নেলস, বিচারপতি মুহাম্মাদ জান এবং বিচারপতি খুরশিদ জামান সাহেবাও একই রায় দিয়েছিলেন, স্ত্রী তার স্বামীর সম্মতি ছাড়া খুলা চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। কেবল মেজাজের বিভিন্নতা, পছন্দ না হওয়া ও ঘৃণাবোধের ওপর ভিত্তি করে আদালত বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না।[১২৪]

কিন্তু ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি শিব্বির আহমাদ, বিচারপতি বি. জেড. কায়কাউস এবং বিচারপতি মাসউদ আহমাদ বিলকিস ফাতেমা বনাম নাজমুল ইকরামের মোকাদ্দমায় এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, আদালত যদি অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, স্বামী এবং স্ত্রী আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলে আদালত স্বামীর সম্মতি ছাড়াই খুলা চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।[১২৫]

---

[১২৩] উমর বিবি বনাম মুহাম্মাদ দীন, এআইআর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, লাহোর-৫১।

[১২৪] সাইদা খানম বনাম মুহাম্মাদ মাসিহ, পিএলডি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, লাহোর ১১৩।

[১২৫] বিলকিস ফাতেমা বনাম নাজমুল ইকরাম, পিএলডি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ, লাহোর ৫৬৬।

এরপর ১৯৬৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের সম্মানিত বিচারপতি এইচ. এ. রহমান, বিচারপতি ফজল আকবর, বিচারপতি হামুদুর রহমান, বিচারপতি মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলি এবং বিচারপতি এইচ. এ. মাহমুদ ও খুরশিদ বেগম বনাম মুহাম্মাদ আমিনের মামলায় এ দৃষ্টিকোণেই রায় দেন।[১২৬]

এ প্রবন্ধে আমরা খুলা তালাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ এই মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা করবো যে, খুলা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির লেনদেন নাকি তাদের মধ্য থেকে কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষকে তার সম্মতি ছাড়া খুলা করতে বাধ্য করতে পারে? আমাদের অনুসন্ধানের সীমা পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি, উম্মতে মুসলিমার প্রায় সকল ফকিহ্ ও মুজতাহিদ এ বিষয়ে একমত এবং কুরআন সুন্নাহর প্রমাণাদিও একে সমর্থন করে যে, খুলা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির লেনদেনের নাম। তাদের কোনো একপক্ষ অপর পক্ষকে খুলা করতে বাধ্য করতে পারে না। এ প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়েরই বিস্তারিত দলিল প্রমাণ পেশ করতে চাই।

জনাব এইচএ রহমান সাহেবের প্রতি আমাদের অন্তরে রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি একজন সম্মানিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে দেশ ও জাতির সম্মানজনক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু তিনি অধিকাংশ আলেমের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন—শরয়ি দৃষ্টিকোণে যা সঠিক নয়—তাই আমরা তার উপস্থাপিত যুক্তি ও প্রমাণসমূহ পর্যালোচনা করতে চাই।

নারী পুরুষের সমান অধিকার

জনাব জাস্টিস এইচএ রহমান তার রায়ের অনুকূলে সর্বপ্রথম যে প্রমাণ পেশ করেছেন তা হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াত—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'আর বিধিঅনুযায়ী পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর।'[১২৭]

---

[১২৬] খুরশিদ বেগম বনাম মুহাম্মাদ আমিন, পিএলডি ১৯৬৭, সুপ্রিম কোর্ট ৯৭।

[১২৭] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮।

জনাব জাস্টিস আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন, যেমনিভাবে পুরুষকে নারীর সম্মতি ছাড়া তালাক দেওয়ার আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীর জন্যও স্বামীর সম্মতি ছাড়া খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার লাভ হওয়া উচিত।

কিন্তু তার এই প্রমাণপেশ নিম্নোক্ত কারণসমূহের দরুন সঠিক নয়—

১. জাস্টিস উল্লিখিত আয়াতের বাকি অংশে গবেষণা করেননি। পবিত্র কুরআনের পুরো আয়াত এ রকম—

   وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۔ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۔

   'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।'[১২৮]

   আলোচ্য আয়াত (وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) এ কথার ইঙ্গিত বহন করছে যে, কোনো কোনো চুক্তি আদান-প্রদানে পুরুষকে এমন কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে যা নারীকে দেওয়া হয়নি।

২. যদি আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই গ্রহণ করা হয়, স্বামী এবং স্ত্রী সকল অধিকার ও দায়িত্বে বরাবর, তাহলে এর কী কারণ থাকতে পারে যে, পুরুষকে কোনো বিনিময় দেওয়া ছাড়াই তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু নারীকে বিনিময় দেওয়া ছাড়া তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকারের মর্ম যদি এই গ্রহণ করা হয় যে, বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই বরাবর, তাহলে স্ত্রীর জন্যও স্বামীর মতো তালাক দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। অথচ এটি এমন এক বিষয় যাকে জাস্টিস নিজেও মেনে নেবেন না।

৩. সকল ফকিহ ও মুফাসসির এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর যে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা হলো সামাজিক সাম্য ও সমতা। অন্যথায় তালাক ও বৈবাহিক সম্পর্ক নিঃশেষ করার প্রশ্নে; সাধারণ অবস্থায় এর পূর্ণাঙ্গ অধিকার একমাত্র পুরুষের। আর এ দিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র

---

[১২৮] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮।

কুরআন বলেছে, (وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) 'আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'

এ ব্যাপারে বেশ কিছু ফকিহ ও মুফাসসিরের অভিমত ও উক্তি নিচে তুলে ধরা হলো—

এক. আবু মালিক রহ. বলেন—

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قال يطلقها وليس لها من الامر شئ.

'(وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) আয়াতের উদ্দেশ্য হলো স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর তালাকদানের কোনো অধিকার নেই।'[১২৯]

দুই. ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি (শাফিয়ি) রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন—

أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُرَاعِيًا حَقَّ الْآخَرِ، وَتِلْكَ الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ كَثِيرَةٌ، وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا.

'দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের একজন অপরজনের অধিকারের প্রতি যত্নবান না হবে। তাদের মধ্যকার অংশীদারমূলক অধিকার প্রচুর। আমরা এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির প্রতি ইঙ্গিত করবো।'[১৩০]

এটি লেখার পর তিনি স্বামী-স্ত্রীর সকল অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার উল্লেখ করেছেন। এরপর (وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লেখেন—

أَنَّ الزَّوْجَ قَادِرٌ عَلَى تَطْلِيقِهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا، شَاءَتِ الْمَرْأَةُ أَمْ أَبَتْ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى تَطْلِيقِ الزَّوْجِ، وَبَعْدَ الطَّلَاقِ لَا تَقْدِرُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الزَّوْجِ وَلَا تَقْدِرُ أَيْضًا عَلَى أَنْ تَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ.

'স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে ফিরিয়েও আনতে পারে; চাই

[১২৯] আদ্দুররুল মানসুর, সুয়ুতি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৭।

[১৩০] তাফসিরে কাবির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

স্ত্রী সেই প্রত্যাহার পছন্দ করুক বা না করুক। আর স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। আর তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পরও সে তা প্রত্যাহার করে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। অনুরূপভাবে সে স্বামীকে তালাক প্রত্যাহার করা থেকে বারণও করতে পারে না।'[১৩১]

তিন. ইমাম আবু আবদুল্লাহ কুরতুবি মালিকি রহ. আপন তাফসির গ্রন্থে উল্লিখিত বাক্যটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা মাওয়ারদি রহ.-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন—

له رفع العقد دونها.

'স্বামীর জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার রয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর জন্য এই অধিকার নেই।'[১৩২]

এসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও (وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .) আয়াতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবল নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা কীভাবে সংগত হতে পারে—

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'আর বিধিঅনুযায়ী পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর।'[১৩৩]

খুলা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত

এরপর বিচারপতি এইচ. এ. রহমান ওই আয়াতের কোনো কোনো বাক্যের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন পবিত্র কুরআনে খুলা সম্পর্কে যা অবতীর্ণ হয়েছে। পুরো আয়াত নিম্নরূপ—

﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۠ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ . وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ . فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ .

[১৩১] তাফসিরে কাবির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

[১৩২] আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৫।

[১৩৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

'তালাকে রাজই হলো দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় উত্তমভাবে ছেড়ে দেবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয়, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্য থেকে কারও কোনো পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।'[১৩৪]

বিচারপতি এইচ. এ. রহমান এ বিষয়ে বিভিন্ন ফকিহ ও মুফাসসিরের উক্তি পেশ করেছেন যে, এই আয়াতে রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতিদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ.

'এরপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না।'

এর মাধ্যমে বিচারপতি এই ফলাফল বের করেছেন, যদি আদালতের বিচারকগণ এটি মনে করে যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলে তারা স্বামীর সম্মতি ছাড়াই বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। এ ব্যাপারে 'লিয়ান' 'ইলা' 'ইন্নিন' বা পুরুষত্বহীন ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির বিয়ে-বিচ্ছেদকে নজির হিসেবে পেশ করে পরিশেষে তিনি আল্লামা ইবনু হুমামের ফাতহুল কাদির, আল্লামা আবু বকর জাস্সাস রহ.-এর আহকামুল কুরআন ও সহিহ সহিহ বুখারির উদ্ধৃতির নিরিখে লিখেছেন, 'যদি স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি এমন ঘৃণা পোষণ করে যা মীমাংসার অযোগ্য, তাহলে খুলা জায়েজ হওয়ার জন্য তাই যথেষ্ট।'[১৩৫]

---

[১৩৪] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

[১৩৫] পি. এল. ডি. সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৭, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ১১৬।

কিন্তু যদি এ বিষয়টি মেনে নেওয়া হয় যে, এই আয়াতের মধ্যে فَإِنْ خِفْتُمْ এর সম্বোধন বিচারপতিদের করা হয়েছে—যেমনটি বহু আলেমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন—তাহলেও এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। আয়াতের মধ্যে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে, যদি বিচারপতিদের এই আশঙ্কা হয় যে, স্বামী এবং স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর জন্য খুলা করাতে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে এটি কীভাবে আবিষ্কার করা যায় যে, বিচারপতিদের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কাউকে খুলা করতে বাধ্য করা যায়? আয়াতের উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, বিচারপতিগণ এই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কিংবা তাদের মধ্য থেকে কাউকে খুলা করতে বাধ্য করার অধিকার রাখেন—যেমনটি বিচারপতির ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে—তাহলে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হতো, 'যদি তোমাদের এ ব্যাপারে আশঙ্কা হয় যে, স্বামী এবং স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যকার বিয়ে-বন্ধন ছিন্ন করে দাও।' কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে, 'এই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী খুলা সম্পাদন করতে কোনো গুনাহ নেই।' এর মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়, যদি বিচারপতিদের কাছে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কোনো বিষয় পেশ করা হয়, আর তারা অনুভব করতে পারেন, স্বামী-স্ত্রী এখন আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে বিচারকগণ স্বামী-স্ত্রীকে খুলা সম্পাদন করতে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু খুলা-চুক্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হতে হবে।

এখন বাকি রইলো এই প্রশ্ন, খুলা যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির ওপর নির্ভরশীল, তাহলে فَإِنْ خِفْتُمْ আয়াতের মধ্যে বিচারপতিদের সম্বোধন করা হলো কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ওই সমাজের প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে যে সমাজে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। তৎকালীন যুগে أولوا الأمر-এর অবস্থান কেবল একজন সাধারণ জজ ও বিচারক ছিলো না। বরং তার মর্যাদা ছিলো একজন সংস্কারক, মুফতি ও উপদেষ্টার মতো। লোকজন কেবল ডিগ্রি অর্জন করার জন্যই নয়, বরং কেবল অনেক শরয়ি মাসআলা জিজ্ঞেস করা এবং পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যও বিচারপতিদের শরণাপন্ন হতো। এজন্য এ আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তোমাদের কাছে এ জাতীয় বিষয় পেশ করা হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে খুলা চুক্তি সম্পাদন করার পরামর্শ দিতে পারো। প্রয়োজন হলে নিজেদের তত্ত্বাবধানে তা নিষ্পন্নও করতে পারো।

কেবল সম্বোধন করার কারণেই এই ফলাফল বের করা যায় না যে, তাদেরকে খুলা তালাকের ব্যাপারে ওই পূর্ণাঙ্গ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে অধিকার স্বামী-স্ত্রীর রয়েছে। এটি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিচের দুটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করুন—

এক. মনে করুন, বিচারপতিদের কাছে এমন একটি মোকাদ্দমা এলো যার মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রীর কেউই খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত নয়। (স্বামী এজন্য সম্মত নয় সে স্ত্রীকে ছাড়তে চায় না, আর স্ত্রী এজন্য সম্মত নয় সে কোনো বিনিময় ছাড়া তালাক পেতে চায়।) আর স্বামী পাগল হওয়া বা এ জাতীয় অন্য কোনো সমস্যাও পাওয়া যায় না যার ওপর ভিত্তি করে আদালতের জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার থাকে। অবশ্য বিচারকগণ এই আশঙ্কা করেন, বিয়ে-বন্ধন বহাল রাখা অবস্থায় তারা উভয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না। এদিকে স্ত্রীকেও খুলা সম্পাদন করার জন্য জিজ্ঞেস করা হলে, সে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে এ অবস্থায় কেবল فَإِنْ خِفْتُمْ আয়াতের মধ্যে বিচারপতিদেরকে সম্বোধন করার কারণেই কি তারা জোরপূর্বকভাবে খুলা চুক্তির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে? এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, তা কখনোই পারবে না।

দুই. মনে করুন, বাড়াবাড়ি যেহেতু স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়েছে তাই স্বামী মোহর মাফ করানো ছাড়া তালাক দিতে প্রস্তুত নয়। অপরদিকে স্ত্রী খুলা চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত নয়। সে হয়তো তালাকই চায় না অথবা তালাকের বিনিময়ে মোহর মাফ করতে সম্মত হয় না। তাহলে এই অবস্থায় কি বিচারকগণ স্ত্রীকে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করতে পারবে? কখনোই নয়। আর কোনো ব্যক্তিই فَإِنْ خِفْتُمْ আয়াতের মধ্যে বিচারপতিদেরকে সম্বোধন করার মাধ্যমে এই ফলাফল বের করতে পারে না যে, এর মাধ্যমে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিচারপতিকে জোরপূর্বকভাবে খুলাচুক্তি সম্পাদন করানোর মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের বর্ণনাপ্রসঙ্গ

খুলা সংক্রান্ত উল্লিখিত আয়াতে বিচারপতিদেরকে কেবল এই অবস্থায় খুলা-চুক্তি সম্পাদন করানোর চুক্তি দেওয়া হয়েছে যখন স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে তা করতে

সম্মত হয়। আয়াতের বিবরণধারায় চিন্তা করার মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। খুলা সংক্রান্ত আয়াতটি হলো—

> وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ . فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ .
>
> 'আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয়, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তাহলে উভয়ের মধ্য থেকে কারও কোনো পাপ নেই।'[১৩৬]

এই আয়াতের মধ্যকার প্রথম বাক্য স্পষ্টভাবে এই দিক নির্দেশনা প্রদান করছে যে, পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশনা ওই অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত যখন স্বামী-স্ত্রীর এই আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না এবং এই কারণে তারা উভয়ে খুলা করতে চায় বা কমপক্ষে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত থাকে। এরপর فَاِنْ خِفْتُمْ আয়াতের মধ্যে فاء تعقيب স্পষ্টভাবে এই নির্দেশনা প্রদান করছে যে, বিচারপতিদের প্রতি এই সম্বোধনও ওই অবস্থার সঙ্গেই সম্পৃক্ত যার আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ, اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ 'কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না।'

এরপর এই আয়াতের সামনের বাক্যও (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) চিন্তা ও গবেষণার যোগ্য। সাধারণ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বুঝে আসতে পারে, এ বাক্যটি খুলা-চুক্তিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতির বিষয়টি স্পষ্টভাবে শামিল করে। এটিকে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর জন্য আমরা একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি—

আপনি যদি জায়েদ নামক কোনো ব্যক্তিকে বলেন—'তোমার জন্য তালাক দেওয়াতে কোনো গুনাহ নেই' তাহলে এ বাক্য দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তির এ কথা বুঝাই সত্যের অনুকূল হবে যে, জায়েদ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। অথবা কমপক্ষে সে তালাক দিতে সম্মত আছে; কিন্তু তার এই সন্দেহ ছিলো, তালাক

---

[১৩৬] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৯।

দেওয়া জায়েজ হবে কি না? কিন্তু আপনি এ কথা বলে তার সন্দেহ দূরীভূত করেছেন, 'তোমার জন্য তালাক দেওয়াতে কোনো গুনাহ নেই।'

এর বিপরীতে এই বাক্যটির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি—যার ন্যূনতম বোঝার যোগ্যতা রয়েছে—এই ফলাফল বের করতে পারবে না যে, জায়েদ তালাক দিতে সম্মত ছিলো না, অথচ তাকে এই বাক্যের মাধ্যমে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। এজন্য যে, যদি জায়েদ তালাক দিতে একেবারেই রাজি না থাকতো এবং সে তালাক দিতে অস্বীকার করতো তাহলে তাকে এভাবে বলা দরকার ছিলো যে, 'তোমাকে তালাক দিতে হবে।' অথবা 'তোমাকে আইনের জোরে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য করা হবে।' কিন্তু এই অবস্থায় এ কথা বলা নিতান্তই নিরর্থক হবে যে, 'তোমার জন্য তালাক দেওয়াতে কোনো গুনাহ নেই'। আর পবিত্র কুরআন فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا বাক্য ব্যবহার করেছে। এর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মর্ম এটিই যে, আল কুরআন কেবল সেই অবস্থা বর্ণনা করছে যে ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই সম্মত আছে। অন্যথায় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যায়।

আসল ব্যাপার হলো স্বামী-স্ত্রী খুলা করতে সম্মত হওয়ার পর তাদের উভয়ের এই সংশয় হতে পারতো, আমার জন্য এ কাজ করা জায়েজ হবে কি না? স্ত্রীর এ সন্দেহ হতে পারতো, পয়সা দিয়ে তালাক নেওয়া হয়তো জায়েজ নয়। আর স্বামীর এই সন্দেহ হতে পারতো, তালাক দেওয়ার বিনিময়ে টাকা-পয়সা উসুল করা গুনাহ কি না? মহান আল্লাহ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا বলে তাদের উভয়ের সন্দেহ বিদূরিত করেছেন।

বরং এ বাক্যটির মাধ্যমে স্বামীর সম্মতির মর্ম আরও অধিক স্পষ্ট হয়েছে। কেননা, খুলা চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে গুনাহ হওয়ার অধিক সন্দেহ স্বামীরই ছিলো। কেননা, সে তা সম্পাদন করার মাধ্যমে টাকা-পয়সা গ্রহণ করছে। কিন্তু স্ত্রীর বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, সে টাকা পরিশোধ করছে।

এ ছাড়া এ আয়াতেরই সামনের এ অংশে فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (সে যে বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়) গবেষণার বেশ খোরাক রয়েছে। এখানে খুলা চুক্তির বিনিময়কে فدية এবং স্ত্রী কর্তৃক তা আদায়কে افتداء বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর আল্লামা ইবনুল কইয়্যিম জাওজি রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী এটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, খুলা এমন এক বিনিময় চুক্তি যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী

উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা জরুরি। কেননা, فدية একটি আরবি শব্দ। আর فدية আরবিতে এমন সম্পদকে বলা হয় যা যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করা হয়। এ সম্পদ পেশ করার নাম افتداء। আর গ্রহণ করার নাম فداء।[১৩৭]

সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী এটি একটি বিনিময়মূলক চুক্তি, যার মধ্যে উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য শর্ত। উভয়পক্ষের কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তি নিষ্পন্ন করতে বাধ্য করতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনু কইয়্যিম রহ. লেখেন—

> وَفِي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الْخُلْعَ فِدْيَةً، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، وَلِهَذَا اعْتُبِرَ فِيهِ رِضَى الزَّوْجَيْنِ.
>
> ‘মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খুলাচুক্তিকে ফিদয়া বলে নামকরণ করার মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, খুলা-চুক্তিতে বিনিময়ের অর্থ বিদ্যমান। আর এ কারণেই তাতে স্বামী ও স্ত্রীর সম্মতি অপরিহার্য করা হয়েছে।’[১৩৮]

এই বিশদ বিবরণ দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, খুলা সংক্রান্ত আয়াতে তিনটি বাক্য এমন রয়েছে যেগুলো স্পষ্টভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে—

১. إِلَّآ أَنْ يَّخَافَآ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ‘কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না।’

২. فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ‘তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়।’

৩. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ‘তবে উভয়ের মধ্য থেকে কারও কোনো পাপ নেই।’

এই তিনটি বাক্যের অভ্যন্তরে فَإِنْ خِفْتُمْ বাক্যটিও এসেছে। এর মাধ্যমে এ ছাড়া আর কি ফলাফল বের হতে পারে যে, যদিও এখানে বিচারপতিদেরই সম্বোধন করা হয়েছে তা সত্ত্বেও তা ওই অবস্থায় যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে খুলাচুক্তি সম্পন্ন করতে সম্মত থাকে।

সুতরাং যেমনিভাবে এই আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা সঠিক নয় যে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের কিংবা স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া বিচারপতি খুলা-চুক্তির

---

[১৩৭] আল মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন, আন নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল আসার, পৃষ্ঠা : ২০৪।

[১৩৮] জাদুল মায়াদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৮।

মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এমনিভাবে এই আয়াত দ্বারা এ বিষয়েরও প্রমাণ পেশ করা সঠিক নয় যে, বিচারপতির জন্য স্বামীর সম্মতি ছাড়া খুলা-চুক্তির মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার রয়েছে।

আমাদের আলোচনা ছিলো এ বিষয়টি মেনে নেওয়ার পর যে, فَإِنْ خِفْتُمْ আয়াতের মধ্যে সম্বোধন বিচারপতিদের করা হয়েছে। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই, আলেমগণের একটি বড়ো দলের অভিমত এটিই। কিন্তু যদি সেসব মুফাসসিরের অভিমতকে অবলম্বন করা হয় যারা বলেছেন : আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলে বিষয়টি একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এ তাফসিরের সমর্থন এভাবেও হয় যে, আয়াতের প্রথম বাক্যের (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ) এই অংশের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। এজন্য এর প্রাসঙ্গিকতার দাবি এই যে, فَإِنْ خِفْتُمْ আয়াতের মধ্যকার সম্বোধনপাত্রও স্বামী-স্ত্রীই হবেন। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.-ও এ আয়াতের তাফসির এভাবেই করেছেন—

'আর তোমাদের জন্য এ বিষয়টি হালাল নয় যে, স্ত্রীদের ছেড়ে দেওয়ার সময় কিছু গ্রহণ করা যদিও তা ওই সম্পদের মধ্য থেকে হোক যা তোমরা তাদেরকে মোহর হিসেবে প্রদান করেছো। এক অবস্থায় তা অবশ্য হালাল। আর তা এই যে, স্বামী-স্ত্রীর এই আশঙ্কা সৃষ্টি হবে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা—যা স্বামী এবং স্ত্রীর অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এর মধ্যে অটল থাকতে পারবে না; সুতরাং যদি তোমাদের (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর) ব্যাপারে এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে, তারা উভয়ে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ হবে না এই মাল লেনদেন করার মধ্যে যা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে স্ত্রী স্বামীর বিয়ে-বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে।'[১৩৯]

এ তাফসির আপন উদ্দেশ্যে নিতান্তই স্পষ্ট। যদি এ তাফসির অবলম্বন করা হয়, তাহলে এই আয়াতে বিচারপতিদের কোনো আলোচনাই অবশিষ্ট থাকে না।

এই মাসআলায় বিচারপতি এইচএ রহমান পুরুষত্বহীন ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন সে ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায়, তা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কেননা, আলোচ্য মাসআলা কেবল সেই অবস্থায় প্রযোজ্য যখন বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রসিদ্ধ প্রকৃতিগুলোর মধ্য থেকে

[১৩৯] বয়ানুল কুরআন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৫।

কোনো একটি প্রকৃতি এবং পন্থা পাওয়া যাচ্ছে না, বরং স্ত্রী কেবল পছন্দ না হওয়া ও ঘৃণাবোধের ওপর ভিত্তি করে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে চাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি পুরুষত্বহীন, স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অস্বীকৃতি-জ্ঞাপনকারী ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর তুলনা করা হয়, তাহলে এর দাবি এই যে, তার বিয়ে কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়া রহিত করা হবে। আর এটি এমন একটি বিষয় যাকে বিচারপতি নিজেও সঠিক মনে করেন না।

এখন রয়ে গেলো ফাতহুল কাদির, আহকামুল কুরআন, সহিহ বুখারি ও আল মুসাওয়া গ্রন্থের ওই উদ্ধৃতি যা বিচারপতি তার রায়ে তুলে ধরেছেন। আমরা বলতে চাই, তার এসব উদ্ধৃতিও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কেননা, এসব উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহর সীমায় অটল থাকতে না পারার মর্ম ও উদ্দেশ্য কী? সেগুলোতে এটিও বলা হয়েছে কোন সেই অবস্থাসমূহ যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করা জায়েজ হয়ে যায়?

রইলো এ বিষয়টি যে, এসব অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রীকে অথবা তাদের কোনো একজনকে বিচারপতি খুলা চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করতে পারে কি না? এ ব্যাপারে ফকিহগণের স্পষ্ট অভিমত হলো যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সম্মত না হবে ততক্ষণ খুলা-চুক্তি সম্পাদন করা সহিহ হবে না। ফকিহগণের স্পষ্ট অভিমতসমূহ আমরা নিচে তুলে ধরবো।

খুলা বিয়ে-বিচ্ছেদ না তালাক

বিচারপতি এইচএ রহমান তার রায়ের এক পর্যায়ে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, খুলা বিয়ে-বিচ্ছেদ (Dissollution of marriage) না তালাক (Divorce)? এ ব্যাপারে তিনি ফকিহগণের মতভেদ উল্লেখ করার পর আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ. এবং ইমাম দাউদ জাহেরি রহ.-এর মাজহাবকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন, যার ভিত্তিতে খুলা তালাক নয়, বরং বিয়ে-বিচ্ছেদ। এরপর তিনি লেখেন—যদি এ রায়কে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, খুলা কেবল স্বামীর সম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়।[১৪০]

[১৪০] পি. এল. ডি. সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ১১৬।

কিন্তু বিচারপতি সাহেবের এ অভিমতের সঙ্গেও একমত পোষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আলোচ্য বিষয়ের সংজ্ঞা ও পরিচিতি পর্বে আমরা এটি বর্ণনা করে এসেছি যে, খুলা তালাক বা বিয়ে-বিচ্ছেদ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? আর কার্যক্ষেত্রে ফকিহগণের এই অভিমতের ভিত্তিতে কী ফলাফল বের হয়। তাফসির, হাদিস ও ফিকহের যে গ্রন্থের মধ্যেই এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেই এর উদ্দেশ্য এটিই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি খুলাকে বিয়ে-বিচ্ছেদ গণ্য করা হয়, তাহলে এর মর্ম হবে খুলাকে তালাক বলে গণ্য না করা। এরপর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বামী তিন তালাক দেওয়ার অধিকারী থাকবে। কিন্তু এর দ্বারা কেউ এই ফলাফল বের করেননি, খুলা যেহেতু বিয়ে-বিচ্ছেদ তাই এর মধ্যে স্বামীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।

আমরা এখানে এ আলোচনা উপেক্ষা করবো যে, ফকিহগণের মতভেদের মধ্যে অগ্রাধিকারযোগ্য মাজহাব কোনটি? আমরা কিছুক্ষণের জন্য এটি মেনে নিচ্ছি যে, এ ব্যাপারে বিচারপতি সাহেবের অভিমত অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. ও ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাবই অগ্রগণ্য। তাদের মাজহাব মতে খুলা তালাক নয়, বিয়ে-বিচ্ছেদ। কিন্তু এর মাধ্যমে এটি কীভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, এই বিয়ে-বিচ্ছেদ স্বামীর সম্মতি ছাড়াই প্রয়োগ হতে পারে? স্বয়ং বিচারপতি ও বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. খুলাকে বিয়ে-বিচ্ছেদ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যদি তার মাজহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ উঠিয়ে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনিও অধিকাংশ আলেমের মতো খুলাকে বিয়ে-বিচ্ছেদ সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের সম্মতিকে অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। যেমন : আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.—যিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মাজহাবের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী লেখেন—

> وَلَا يُفْتَقَرُ الْخُلْعُ إِلَى حَاكِمٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: يَجُوزُ الْخُلْعُ دُونَ السُّلْطَانِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ . رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا . وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ. وَعَنْ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ. وَلَنَا، قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى السُّلْطَانِ، كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وَلِأَنَّهُ قَطْعُ عَقْدٍ بِالتَّرَاضِي، أَشْبَهَ الْإِقَالَةَ

'খুলাচুক্তি সম্পাদন করার জন্য বিচারপতির প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. স্পষ্ট করে বলেছেন—রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতি ছাড়াই খুলা-চুক্তি সম্পাদন করা জায়েজ। ইমাম বুখারি রহ., উমর রা. এবং উসমান রা. থেকে এ মাজহাবই উল্লেখ করেছেন। ইমাম শুরাইহ রহ., ইমাম জুহরি রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ. ও ইমাম ইসহাক রহ.-এর এটিই অভিমত। আর হাসান বসরি রহ. ও ইবনু সিরিন রহ. থেকে একটি বর্ণনা আছে, খুলা কেবল রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতির কাছেই সম্পন্ন হতে পারে। আমাদের দলিল উমর রা. এবং উসমান রা.-এর উক্তি। তাছাড়া খুলা একটি বিনিময় চুক্তি। সুতরাং তা সম্পাদিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন নেই। যেমন : বিয়ে ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া খুলা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ে-বন্ধনকে ছিন্ন করার নাম; তাই তা 'ইকালা'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেলো।'[১৪১]

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. আলোচ্য উদ্ধৃতিতে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মাজহাব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, খুলা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর 'ইকালা' এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেমনিভাবে 'ইকালা' (ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ করা) (Cancellation of the sale transaction) ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে হয়ে থাকে এবং তাদের কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষকে এটি করতে বাধ্য করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে খুলাও বিয়ে বিচ্ছেদের চুক্তি। এতেও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতি জরুরি। তাদের কোনো একজন অপরজনকে খুলা করতে বাধ্য করতে পারে না।

বিচারপতি সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. ছাড়া ইমাম শাফিয়ি রহ.-ও খুলাকে বিয়ে-বিচ্ছেদ বলে মেনে নেন। তিনি খুলাকে তালাক বলে মনে করেন না। কিন্তু এটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর পূর্ববর্তী উক্তি। তার সর্বশেষ অভিমত হলো 'খুলা' তালাক হিসেবে গণ্য হবে।[১৪২]

তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের সম্মতির বিষয়টিকে তিনিও অন্যান্য ফকিহের মতো খুলা তালাকের জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করেন। তিনি 'কিতাবুল

[১৪১] আল মুগনি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫২।

[১৪২] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯।

উম্ম'-এর باب الخلع والنشوز এর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

وَإِنْ قَالَ لَا أُفَارِقُهَا وَلَا أَعْدِلُ لَهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَسْمِ لَهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى فِرَاقِهَا.

'যদি স্বামী বলে আমি তাকে তালাক দেবো না এবং তার সঙ্গে ন্যায়ানুগ আচরণও করবো না, তাহলে তাকে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য করা হবে, কিন্তু তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা যাবে না।'[১৪৩]

অন্য এক জায়গায় তিনি লেখেন—

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانٍ إِنْ رَأَيَا إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

'আর রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এই অধিকার নেই যে, তিনি বিচারপতিদের এই নির্দেশ প্রদান করবেন, তারা যেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তাদের এই অধিকারও নেই যে, স্ত্রীর সম্পদ অনুমতি ছাড়া স্বামীকে দিয়ে দেবে।'[১৪৪]

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি লেখেন—

وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا تَطْلِيقَةً لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فَعَقَلْنَا عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنَّ ذٰلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ بِإِيقَاعِ الزَّوْجِ وَعَلِمْنَا أَنَّ الْخُلْعَ لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِإِيقَاعِ الزَّوْجِ.

'আমরা খুলা-চুক্তিকে তালাক বলে অভিহিত এজন্য করেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন—(الطلاق مرتان) তালাক দুইবার। মহান আল্লাহর বাণী থেকে আমরা এটি অনুধাবন করতে পেরেছি যে, তালাক কেবল স্বামীর পক্ষ থেকেই পতিত হতে পারে। আমরা এটিও জানতে পেরেছি, খুলা-চুক্তি কেবল স্বামীর সংঘটিত করার মাধ্যমেই সংঘটিত হতে পারে।'[১৪৫]

তিনি আরও দুই পৃষ্ঠা এগিয়ে গিয়ে তো এই মাসআলাকে একেবারেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন—

---

[১৪৩] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৯।

[১৪৪] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৪।

[১৪৫] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৮।

وَكَذٰلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِنْ خَالَعَ عَنْ عَبْدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْ أَحَدٍ أَبٍ وَلَا سَيِّدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا سُلْطَانٍ إِنَّمَا يُطَلِّقُ الْمَرْءُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا امْتَنَعَ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ وَكَانَ مِمَّنْ لَهُ طَلَاقٌ وَلَيْسَ الْخُلْعُ مِنْ هٰذَا الْمَعْنَى بِسَبِيلٍ.

'অনুরূপভাবে গোলামের মুনিব যদি গোলামের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে খুলা চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলেও তা সহিহ্ হবে না। কেননা, খুলা হলো তালাক। সুতরাং তা দেওয়ার অধিকার স্বামী ছাড়া পিতা, মুনিব, অভিভাবক ও রাষ্ট্রপ্রধানের নেই। তালাক কেবল স্বামীই দিতে পারে। অথবা তালাক দেওয়া যদি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তালাক প্রদানের অধিকারী স্বামী তালাক প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য তালাক দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু খুলা-চুক্তিতে এ জাতীয় কোনো পথ খোলা নেই।'

আলোচ্য উদ্ধৃতির সর্বশেষ বাক্যসমূহ এ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, খুলা-চুক্তির ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতি তালাকের চেয়েও বেশি জরুরি। কেননা, তালাক কখনো কখনো বিশেষ অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান কার্যকর করতে পারে কিন্তু খুলা-চুক্তির মধ্যে এ বিষয়টিও অনুপস্থিত।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, যেসব ফকিহ্ খুলা-চুক্তিকে তালাকের পরিবর্তে বিয়ে-বিচ্ছেদ বলেছেন—তারাও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই বিয়ে-বিচ্ছেদ 'ইকালা' বা ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার মতো উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না।

সামনে বেড়ে বিচারপতি আরও বলেছেন, যদি খুলা-চুক্তিকে তালাক বলেই গণ্য করা হয়—যেমনটি (Orthodox hanafi jurists) হানাফি মাজহাবের কোনো কোনো প্রাচীন ফকিহের অভিমত—তাহলেও এ প্রশ্ন থেকে যায়, বিশেষ কোনো অবস্থায় স্ত্রীর জন্য কী এই অধিকার নেই যে, সে স্বামীর বিরোধিতা সত্ত্বেও খুলা তালাক লাভ করবে? এ মাসআলার স্পষ্ট কোনো বিবরণ হানাফি ফকিহ্গণের কাছে পাওয়া যায় না।[১৪৬]

[১৪৬] পিএলডি, সুপ্রিম কোর্ট, ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ১১৬।

এখানে প্রথম বিষয় হলো খুলা-চুক্তিকে তালাক বলে অভিহিত করা কেবল পূর্ববর্তী হানাফি ফকিহগণেরই অভিমত নয়, বরং এটি সকল হানাফি ফকিহের সর্বসম্মত অভিমত। আর কেবল হানাফি ফকিহগণই নয়, বরং ফিকহশাস্ত্রবিদের অধিকাংশই খুলা-চুক্তিকে তালাক বলে অভিহিত করেন। আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. লেখেন—

وأما نوع الخلع فالجمهور على أنه طلاق.

'অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের অভিমত অনুযায়ী খুলা-চুক্তি তালাকেরই একটি প্রকার।'[১৪৭]

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, জাস্টিস বর্ণনা করেছেন, হানাফি ফকিহগণের বিবরণে এমন কোনো স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না যে, স্বামী সম্মত না থাকা অবস্থায় স্ত্রী 'তালাকে খুলা' লাভ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা এখানে হানাফি ফকিহগণের বেশকিছু স্পষ্ট উদ্ধৃতি পেশ করবো যেগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খুলা-চুক্তি স্বামীর সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল। আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস রহ. প্রাচীন হানাফি ফকিহগণের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ফকিহ। আর বিচারপতি নিজেও তার গ্রন্থ আহকামুল কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। এখানে আমরা প্রথমে তারই উদ্ধৃতি পেশ করবো। তিনি জামিলা রা.-এর ঘটনার ওপর পর্যালোচনা করে লেখেন—

لَوْ كَانَ الْخُلْعُ إِلَى السُّلْطَانِ شَاءَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَبَيَا إِذَا عَلِمَ أنهما لا يقيمان حدود الله لم يسئلهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وَلَا خَاطَبَ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ اخْلَعْهَا بَلْ كَانَ يَخْلَعُهَا مِنْهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَإِنْ أَبَيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

'যদি খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকতো যে, তিনি যখন দেখবেন, স্বামী ও স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না (তাহলে তিনি নিজে বিয়ে বন্ধনে বিচ্ছেদ ঘটাবেন) চাই স্বামী-স্ত্রী সম্মত থাকুক বা না থাকুক তাহলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামিলা রা. এবং তার স্বামীর কাছে এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করতেন না। তিনি স্বামীকে এটিও বলতেন না যে, তুমি তার সঙ্গে খুলা করে নাও। বরং তিনি নিজেই খুলা করে স্বামীর বাগিচা

[১৪৭] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯।

তাকে ফিরিয়ে দিতেন। চাই তারা উভয়ে এ খুলা-চুক্তি অস্বীকার করুক অথবা তাদের কোনো একজন অস্বীকার করুক।'[১৪৮]

আলোচ্যাংশটুকুতে আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস রহ. স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান দেখেন যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না, তাহলেও তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন না। যদি তাদের দুজনের মধ্য থেকে কোনো একজনও খুলা করতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খুলা চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার নেই। ফকিহগণের মূলনীতি এই হয়ে থাকে, যে বিষয়টি তাদের কাছে মতভেদপূর্ণ, প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হয়ে থাকে তাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে কোনো এক জায়গায় মৌলিকভাবে বর্ণনা করে দেন। এ কারণেই যখন কোনো ব্যক্তি ফকিহগণের বিবরণে এই মাসআলা অনুসন্ধান করতে চায় যে, 'তালাকের অধিকার কেবল স্বামীর, স্ত্রীর নয়' তখন এ জাতীয় বাক্যে ফকিহগণের উদ্ধৃতিতে খুব কমই পাওয়া যায়। কেননা, এ বিষয়টি এতটাই মীমাংসিত যে, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। একই বিষয় খুলাচুক্তির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। 'খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার জন্য স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের সম্মতি জরুরি' এই মাসআলাটি এতই প্রসিদ্ধ, পরিচিত, স্বীকৃত ও সর্বসম্মত যে, ফকিহগণ একে স্বতন্ত্রভাবে খুব কমই আলোচনা করেন। অবশ্য খুলা শব্দের পরিচিতি ও সংজ্ঞা এবং তার রুকন ও শর্ত বর্ণনা করার সময় একে মৌলিকভাবে বর্ণনা করেন অথবা অন্য কোনো মাসআলার দলিল হিসেবে পেশ করেন। যেমন ফিকহে হানাফির স্বীকৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ফাতাওয়া আলমগিরিতে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে—

وشرطه شرط الطلاق 'খুলা তালাকের শর্ত তালাকের শর্তের মতোই।'[১৪৯]

আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রহ. লেখেন—

وشرطه كالطلاق 'খুলা তালাকের শর্ত তালাকের শর্তের মতোই।' [১৫০]

আর শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. লেখেন—

وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ كَسَائِرِ

---

[১৪৮] আহকামুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৪৬৮।

[১৪৯] ফতোওয়ায়ে আলমগিরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫১৫।

[১৫০] ফতোওয়ায়ে শামি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৬০৬।

الْعُقُودِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ، وَلِلزَّوْجِ وِلَايَةُ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ، وَلَهَا وِلَايَةُ الْتِزَامِ الْعِوَضِ.

'রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা অন্যকারও কাছে খুলা করা জায়েজ আছে। কেননা, তা এমন এক চুক্তি (Transaction) যা অন্যান্য লেনদেন চুক্তির মতো পারস্পরিক সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। এটি বিনিময় নিয়ে তালাক দেওয়ার স্থলাভিষিক্ত। স্বামীর জন্য তালাক দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর স্ত্রীর জন্য নিজের ওপর বিনিময় আবশ্যক করার অধিকার রয়েছে।'[১৫১]

তাছাড়া ফকিহগণ অন্যান্য লেনদেনের মতো খুলা-চুক্তির রুকনও ইজাব ও কবুলকে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন মালিকুল ওলামা আল্লামা কাসানি রহ. লেখেন—

وَأَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ، وَلَا يُسْتَحَقُّ الْعِوَضُ بِدُونِ الْقَبُولِ.

'খুলা-চুক্তির রুকন হলো ইজাব ও কবুল। কেননা, এটি বিনিময় গ্রহণ করার মাধ্যমে তালাক প্রদানের চুক্তির নাম। সুতরাং কবুল করা ছাড়া বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটবে না। আর কবুল করা ছাড়া স্বামীও বিনিময়ের হকদার হবে না।'[১৫২]

এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, ফকিহগণের পরিভাষায় কোনো কর্মের রুকন ওই বস্তু হয়ে থাকে যা ছাড়া ওই কর্ম শরয়ি দৃষ্টিকোণে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। যেমন : সিজদা নামাজের রুকন। এজন্য সিজদা ছাড়া নামাজ হয় না। অনুরূপভাবে ইজাব-কবুল খুলা তালাকের রুকন। তাই এতদুভয় ছাড়া খুলা অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

পূর্বোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, যেসব ফকিহ একে তালাক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তারা এবং যেসব আলেম একে বিয়ে-বিচ্ছেদ বলে মত দেন তারাও এ বিষয়ে একমত যে, খুলা পারস্পরিক সম্মতিসূচক এমন এক চুক্তির নাম যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি জরুরি। তাদের একপক্ষ

---

[১৫১] মাবসুত-সারাখসি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৩।

[১৫২] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪৫।

অপর পক্ষকে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করতে পারে না। তাই খুলা, তালাক হোক বা বিয়ে-বিচ্ছেদ হোক উভয়টির কোনো অবস্থায়ই আলোচ্য মাসআলায় এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

আরও সামনে অগ্রসর হয়ে বিচারপতি এইচএ রহমান দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, খুলা-চুক্তিতে স্বামীর সম্মতির মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ।[১৫৩]

কোনো কোনো ব্যক্তি খুলা-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতিকে জরুরি মনে করেন এবং কোনো কোনো আলেম একে জরুরি মনে করেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো বিচারপতি নিজের এই দাবির সমর্থনে ফকিহগণের যেসব উক্তি পেশ করেছেন সেগুলো পুরোপুরিভাবে অন্য মাসআলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। স্বামীর সম্মতির সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

এ ব্যাপারে বিচারপতি আল্লামা শারানি রহ.-এর যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তা হলো—

> اتفق الائمة على أن المرءة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض وإن لم يكن من ذلك شيئ وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز ولم يكره خلافا للزهرى وعطاء وداود فى قولهم إن الخلع لا يصح فى هذه الحالة لأنه عبث والعبث غير مشروع.
>
> 'সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, যদি স্ত্রী নিজের স্বামীকে অসুন্দর বা অসামাজিক হওয়ার ওপর ভিত্তি করে অপছন্দ করে, তাহলে তার জন্য জায়েজ আছে সে স্বামীকে বিনিময় প্রদান করে তার সঙ্গে খুলা-চুক্তি সম্পন্ন করবে। যদি অপছন্দ করার কোনো কারণ না থাকে আর স্বামী-স্ত্রী খুলা করতে অকারণেই রাজি হয়ে যায়, তাহলেও তা বিনা মাকরুহে জায়েজ। অবশ্য এতে ইমাম জুহরি রহ., ইমাম আতা রহ. ও ইমাম দাউদ জাহেরি রহ.-এর মতভেদ রয়েছে। তারা বলেন—এ অবস্থায় খুলা চুক্তি সম্পাদন করা সহিহ নয়। কেননা, তা অনর্থক কর্ম। আর কোনো অনর্থক কর্ম শরিয়তে অনুমোদিত নয়।'[১৫৪]

আলোচ্য উদ্ধৃতিটুকুর মাধ্যমেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে মতভেদ

---

[১৫৩] পিএলডি, সুপ্রিম কোর্ট, ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ১১৭।

[১৫৪] আলমিজানুল কুবরা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৯।

স্বামীর সম্মতি থাকা না থাকার মাসআলায় নয়, বরং এই মাসআলায় যে, স্বামী-স্ত্রী সম্মত হওয়ার পরও খুলা সর্বাবস্থায় জায়েজ নাকি কেবল ওই অবস্থায় জায়েজ যখন স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে।

অধিকাংশ ফকিহ্ প্রথম অভিমতকে অবলম্বন করেছেন। আর ইমাম জুহরি রহ., ইমাম আতা রহ. ও ইমাম দাউদ জাহেরি রহ. দ্বিতীয় অভিমত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু খুলা-চুক্তিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতির বিষয়টিকে উভয় পক্ষই জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। যেমনটি (جاز لها ان تخالعه) ও (وتراضيا على الخلع) বাক্যদ্বয়ের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো বিচারপতি এ উদ্ধৃতি থেকে কীভাবে এই ফলাফল বের করেছেন যে, কোনো এক পক্ষের মতে স্বামীর সম্মতি ছাড়াই খুলা-চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে? এটি আমাদের বোধগম্য নয়।

এরপর বিচারপতি 'উমদাতুল কারি' গ্রন্থের বরাতে ইমাম মালিক রহ., ইমাম আরজায়ি রহ. ও ইমাম ইসহাক রহ.-এর এই মাজহাব বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মতে স্বামী-স্ত্রীর মীমাংসা করানোর জন্য যে সালিশ পাঠানো হয় তাদের জন্য বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানোরও অধিকার রয়েছে। আর তারা যদি সংগত মনে করে, তাহলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াও বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাম মালিক রহ. দুজন সালিশকে এই অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. এবং অন্য সকল ফকিহের মাজহাব এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী সালিশদ্বয়কে নিজের উকিল নিযুক্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বামীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার লাভ করবে না। এসব ফকিহ্ তাদের মতের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন—

> وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا .

> 'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা দুজন যদি মিমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন।'[১৫৫]

এ আয়াতের সর্বশেষ বাক্য এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এই সালিশদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর

---

[১৫৫] সুরা নিসা, আয়াত : ৩৫।

মধ্যে বিচ্ছেদ কিংবা পৃথক করে দেওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তা ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য পাঠানো হচ্ছে। ইমাম শাফিয়ি রহ. 'কিতাবুল উম্ম'-এ এ মাসআলা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانٍ إِنْ رَأَيَا إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا (قَالَ) : فَإِنْ اصْطَلَحَ الزَّوْجَانِ وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ حَقٍّ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَأَدَبٍ (قَالَ) : وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّهُمَا {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا} وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْرِيقًا (قَالَ) : وَأَخْتَارُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْأَلَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَرَاضَيَا بِالْحَكَمَيْنِ وَيُوَكِّلَاهُمَا مَعًا فَيُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجُ إِنْ رَأَيَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا فَرَّقَا عَلَى مَا رَأَيَا مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ غَيْرِ أَخْذِهِ.

'যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাঙ্গনের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং তারা নিজেদের বিষয়টি বিচারকের সামনে উত্থাপন করে তখন বিচারকের জন্য অপরিহার্য হলো তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন অল্পেতুষ্ট ও জ্ঞানবান সালিশ প্রেরণ করবে; যেন তারা উভয়ে দম্পতির বিষয়টি তদন্ত করে এবং যথাসম্ভব মীমাংসা করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিচারকের জন্য এই অধিকার নেই যে, তিনি সালিশদ্বয়কে নিজের রায় মোতাবেক স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই বিয়ে বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবে। সালিশদ্বয় স্ত্রীর কোনো মালও তার অনুমতি ছাড়া স্বামীকে দিতে পারবে না। সুতরাং এই কর্মপ্রচেষ্টায় যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা হয়ে যায়, তাহলে তা উৎকৃষ্টতর। অন্যথায় বিচারকের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো তিনি স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের ওপর অপরের যেসব আত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক অধিকার রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করার রায় দেবে। এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী—

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا.

'তারা দুজন যদি মিমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন।'[১৫৬]এই আয়াতে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানোর

---

[১৫৬] সুরা নিসা, আয়াত : ৩৫।

কোনো কথা উল্লেখ নেই। অবশ্য বিচারকের জন্য এটি পছন্দ করি যে, তিনি স্বামী-স্ত্রীকে বলবেন তারা যেন সালিশদ্বয়ের ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং তাদেরকে নিজেদের উকিল নিযুক্ত করে। স্বামী সালিশদ্বয়কে এ বিষয়ের উকিল বানাবে যে, তিনি যদি সংগত মনে করেন, তাহলে নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিছু নিয়ে কিংবা নেওয়া ছাড়াই বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবেন।'[১৫৭]

ইমাম শাফিয়ি রহ. আরেকটু অগ্রসর হয়ে লেখেন—

وَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجَانِ عَلَى تَوْكِيلِهِمَا إِنْ لَمْ يُوَكِّلَا.

'সালিশদ্বয়কে উকিল বানানোর জন্য স্বামী-স্ত্রীকে বাধ্য করা যাবে না যদি তারা উভয়ে তাদেরকে উকিল না বানায়।'[১৫৮]

ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ.ও এসব প্রমাণের আলোকে লিখেছেন—

وليس للحكمين في الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما الزوج.

'স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ অবস্থায় সালিসদ্বয়ের জন্য এই অধিকার নেই যে, তারা তাদের বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবেন। তবে স্বামী যদি তাদেরকে এই অধিকার প্রদান করেন তাহলে ভিন্ন কথা।'[১৫৯]

বিচারপতি এইচএ রহমান এ মাসআলায় আল্লামা ইবনু হাজম জাহেরি রহ. এর উদ্ধৃতি পেশ করে বলেছেন—তিনি এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিচারপতি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি যে, তিনি তার বিশদ আলোচনার পর এর ফলাফল কী বের করেছেন। আল্লামা ইবনু হাজম এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার পর পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন—

ليس في الآية ولا في شيئ من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم.

'কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও নেই যে, সালিশদ্বয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার আছে। আর না কোনো বিচারকের জন্যও এই অধিকার আছে।'[১৬০]

---

[১৫৭] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৪।

[১৫৮] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা. ১৯৫।

[১৫৯] মুখতাসারুত তহাবি, পৃষ্ঠা. ১৯১।

[১৬০] আল মুহাল্লা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮৭, ৮৮।

জামিলা রা.-এর ঘটনা

বিচারপতি তার রায়ের স্বপক্ষে সহিহ বুখারির নিচের হাদিসটির মাধ্যমেও প্রমাণ পেশ করেছেন—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

'ইবনু আব্বাস রা. বলেন—সাবেত ইবনু কায়সের স্ত্রী মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল, আমি সাবেত ইবনু কায়সের চরিত্র ও দীনদারিতে অসন্তুষ্ট নই। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরিমূলক কথাবার্তা আমি অপছন্দ করি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তার মোহর হিসেবে প্রদত্ত বাগানটি ফিরিয়ে দিতে সম্মত আছো? জামিলা রা. বললেন, হাঁ, তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনু কায়স রা.-কে বললেন, তুমি বাগান গ্রহণ করে তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।'[১৬১]

কিন্তু এ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা এজন্য সঠিক নয় যে, আলোচ্য ঘটনাটি স্বামীর সম্মতিক্রমে হয়েছিলো এবং তিনি খুলা তালাকের এ বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। সুনানে নাসায়ির রেওয়ায়েতে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا»، قَالَ: نَعَمْ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনু কায়স রা.-এর কাছে পয়গাম পাঠালেন, যে মাল তাকে দেওয়া তোমার ওপর আবশ্যক ছিলো তা গ্রহণ করে ওকে মুক্ত করে দাও। সাবেত ইবনু কায়স রা. বললেন, তাই হবে।'[১৬২]

---

[১৬১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২৭৩।

[১৬২] সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩৪৯৭।

এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যে, স্বামী যদি খুলা-চুক্তিতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে আর কোনো প্রশ্নই বাকি থাকে না। আলোচনা কেবল ওই অবস্থায় হচ্ছে যখন খুলাচুক্তি সম্পাদন করতে স্বামী সম্মত না থাকে। রইলো ওই বিষয়টি যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনু কায়স রা.-কে খুলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নির্দেশটি আলেমগণের ঐকমত্য অনুযায়ী পরামর্শমূলক ছিলো। বিচারক হিসেবে জোরপূর্বক ছিলো না। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন—

هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب.

'এ নির্দেশটি মূলত সংশোধন ও পরামর্শমূলক ছিলো। বাধ্যতামূলক ছিলো না।'[১৬৩]

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. এবং আল্লামা কাসতাল্লানি রহ.-ও এ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটিই লিখেছেন।

এছাড়াও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, বিচারপতি বা রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন না। এ কাজ কেবল স্বামীই করতে পারে। আবু বকর জাস্সাস রহ. এ হাদিসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন—

لَوْ كَانَ الْخُلْعُ إِلَى السُّلْطَانِ شَاءَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَبَيَا إِذَا عَلِمَ أنهما لا يقيمان حدود الله لم يسئلهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وَلَا خَاطَبَ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ اخْلَعْهَا بَلْ كَانَ يَخْلَعُهَا مِنْهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَإِنْ أَبَيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَمَا لَمَّا كَانَتْ فُرْقَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِلَى الْحَاكِمِ لَمْ يَقُلْ لِلْمُلَاعِنِ خَلِّ سَبِيلَهَا بَلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

'যদি খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকতো যে, তিনি যখন দেখবেন, স্বামী এবং স্ত্রী আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অটল থাকতে পারবে না (তখন তিনি নিজে বিয়ে বন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটাবেন) চাই স্বামী-স্ত্রী সম্মত থাকুক বা না থাকুক, তাহলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামিলা রা. এবং তার স্বামীর কাছে এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করতেন না। তিনি স্বামীকে এটিও বলতেন না, তুমি তার সঙ্গে খুলা করে নাও, বরং তিনি নিজেই খুলা করে স্বামীর বাগিচা তাকে

[১৬৩] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩২৯।

ফিরিয়ে দিতেন। চাই তারা উভয়ে এ খুলা-চুক্তি অস্বীকার করুক অথবা তাদের কোনো একজন অস্বীকার করুক। যেমন 'লিয়ান' সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার বিচারকের রয়েছে। এই অবস্থায় বিচারক স্বামীর কাছে এ কথা বলেন না, তুমি নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দাও, বরং তিনি নিজেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।'[১৬৪]

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ.-এর এই প্রমাণ অত্যন্ত শক্তিশালী। এ কারণেই আজ পর্যন্ত কোনো ফকিহ্ এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে এ কথা বলেন নি, বিচারপতি স্বামীকে খুলা করতে বাধ্য করতে পারে।

সাইদা খানম বনাম মুহাম্মাদ সামি-এর মোকাদ্দমায় মাননীয় বিচারপতি ও জামিলা রা.-এর ঘটনার এই জবাবই দিয়েছেন যে, সেখানে খুলা-চুক্তি স্বামীর সম্মতিক্রমে সম্পন্ন হয়েছিলো।[১৬৫]

বিচারপতি সাইদা খানমের মোকাদ্দমার ওপর পর্যালোচনা করে লিখেছেন, 'সাইদা খানমের মোকাদ্দমায় ওই আয়াতে গবেষণা করা হয়নি, খুলা তালাকের ব্যাপারে যা অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এখানে জামিলা রা.-এর হাদিসের ওপর আলোচনা করা হয়েছে।'

সাইদা খানমের মোকাদ্দমায় জামিলা রা.-এর ঘটনাকে স্বামীর সন্তুষ্টির ঘটনা সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর জবাবে জাস্টিস লিখেছেন, 'আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় এ বিষয়টি কুরআনের বর্ণনাশৈলী ও প্রাণের অত্যধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এসব ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, 'উলুল আমর' কাজির ভায়া হয়ে খুলা তালাকের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবেন। যদিও স্বামী তার সঙ্গে একমত না হয়।'[১৬৬] এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, বিচারপতি এর মাধ্যমে তার দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন। এর দ্বারা কোনোভাবেই এ কথার জবাব হয় না যে, জামিলা রা.-এর ঘটনা ছিলো পারস্পরিক সম্মতিপূর্ণ। জাস্টিস সাহেবের 'কুরআনের বর্ণনাশৈলী ও প্রাণের সঙ্গে' কথাটির মাধ্যমে বুঝে আসে, কাজি স্বামীর সম্মতি ছাড়া খুলা তালাকের মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। তো আমরা খুলা সংক্রান্ত আয়াত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যার মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সামনে

---

[১৬৪] আহকামুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৪৬৮।

[১৬৫] সাইদা খানম বনাম মুহাম্মাদ সামি, পিএলডি, ১৯৫২ লাহোর।

[১৬৬] পি. এল. ডি. সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ১২০, ১২১।

এসে যায় যে, উম্মতে মুসলিমার সকল ফকিহ ও মুফাসসির, পবিত্র কুরআনের এসব শব্দের এই অর্থই নির্ধারণ করেছেন যে, খুলা কেবল পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতেই হতে পারে। এ ছাড়া এর আর কোনো পথ বাকি নেই।

উমর রা.-এর বর্ণনা

জনাব এইচ. এ. রহমান তার সিদ্ধান্তের মধ্যে উমর রা.-এর একটি বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। সুনানে বাইহাকি শরিফে এসেছে উমর রা. বলেছেন—

إذا أرادت النساء الخلع فلا تكفروهن.

'যখন স্ত্রীগণ খুলা করতে চায় তখন তোমরা তা অস্বীকার করো না।'[১৬৭]

কিন্তু উমর রা.-এর এই রেওয়ায়েতই এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, বিচারক স্বামী-স্ত্রী কিংবা তাদের কোনো এক পক্ষের সম্মতি ছাড়া খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। উমর রা. এই রেওয়ায়েতে স্বামীদেরকে সম্বোধন করেছেন। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধান ও কাজি তিনি নিজেই ছিলেন। যদি রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার থাকতো, তাহলে তার জন্য স্বামীদেরকে এ কথা বলার কী প্রয়োজন ছিলো, 'যখন স্ত্রীগণ খুলা করতে চায় তখন তোমরা তা অস্বীকার করো না।' অতএব, উমর রা.-এর এই বর্ণনার মাধ্যমে এ বিষয়ের ওপর কীভাবে প্রমাণ পেশ করা যায় যে, বিচারপতি স্বয়ং স্বামী-স্ত্রী অথবা তাদের কোনো একপক্ষের সম্মতি ছাড়াই খুলা করতে পারে। হ্যাঁ, এ বর্ণনা স্বামীদের জন্য একটি নির্দেশনামা অবশ্যই যে, যখন স্ত্রীগণ খুলা করতে চায় তখন অকারণে তাদেরকে বেঁধে রাখার পরিবর্তে খুলাকে কবুল করে নেওয়াই উচিত।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেসব প্রমাণের পর্যালোচনা পেশ করেছি জনাব জাস্টিস এইচএ রহমান যেগুলোকে তার রায়ে পেশ করেছেন। এই রায়ে বিচারপতি এইচএ মাহমুদ ও একটি নোট লিখেছেন। তার নোটের অধিকাংশ প্রমাণ সেগুলোই জনাব এইচএ রহমান যেগুলো তার রায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর সেগুলোর জবাব ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য তার নোটে দুটি নতুন বিষয় এসেছে যেগুলোর জবাব ইতোপূর্বে দেওয়া হয়নি।

---

[১৬৭] আদ্দুররুল মানসুর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮৩।

এক. আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে খুলা তালাকের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন—

وَالْفِقْهُ أَنَّ الْفِدَاءَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ فِي مُقَابَلَةِ مَا بِيَدِ الرَّجُلِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِنَّهُ لَمَّا جُعِلَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الرَّجُلِ إِذَا فَرِكَ الْمَرْأَةَ، جُعِلَ الْخُلْعُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ إِذَا فَرِكَتِ الرَّجُلَ.

'খুলা-চুক্তির রহস্য এই যে, স্বামীর অধিকারে যে তালাক রয়েছে তার বিনিময়ে স্ত্রীর হাতে মুক্তিপণের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা, স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে যখন সে স্ত্রীকে অপছন্দ করে। আর স্ত্রীকে খুলা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে যখন সে তার স্বামীকে অপছন্দ করে।'[১৬৮]

উল্লিখিত উদ্ধৃতির মাধ্যমে জাস্টিস এই ফলাফল বের করেছেন, যেমনিভাবে তালাকের মধ্যে স্ত্রীর সম্মতি জরুরি নয় ঠিক তেমনিভাবে খুলা তালাকের মধ্যেও স্বামীর সম্মতি অপরিহার্য নয়। কিন্তু আল্লামা ইবনু রুশদ রহ.-এর কথার এই ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত কারণসমূহের দরুন সঠিক নয়।

ক. আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. উল্লিখিত উদ্ধৃতির কয়েক লাইন আগে স্পষ্টভাবে লিখেছেন—

وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْخُلْعُ مِنَ الَّتِي لَا يَجُوزُ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ مَعَ التَّرَاضِي إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ رِضَاهَا بِمَا تُعْطِيهِ إِضْرَارَهُ بِهَا.

'রইলো এই বিষয় যে, খুলা কোন অবস্থায় জায়েজ হয় আর কোন অবস্থায় জায়েজ হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকিহ একমত যে, খুলা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জায়েজ। তবে শর্ত হলো স্ত্রী মাল আদায়ে রাজি হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক বল প্রয়োগ না হওয়া।'[১৬৯]

এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খুলা-চুক্তি সম্পাদন করা ওই সময়ই জায়েজ হয় যখন স্বামী এবং স্ত্রী তা করতে সম্মত থাকে। অবশ্য যেহেতু এভাবে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোটামুটিভাবে

---

[১৬৮] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮।
[১৬৯] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮।

স্ত্রীর একটি পথ মিলে যায় তাই আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. একে এভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, স্ত্রীকে এই অধিকার স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকারের বিপরীতে দেওয়া হয়েছে।

খ. অন্যথায় যদি আল্লামা ইবনু রুশদ রহ.-এর উদ্দেশ্য এই হতো যে, স্ত্রীর খুলাচুক্তি সম্পাদন করার অধিকার ঠিক স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকারের মতো, তাহলে এমন হওয়া উচিত ছিলো যে, তার মতে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার জন্য স্ত্রীর মাল পরিশোধ করার প্রয়োজন হতো না। বরং যেমনিভাবে স্বামী কোনো টাকা-পয়সা দেওয়া ছাড়াই তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীও মাল পরিশোধ করা ছাড়াই স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারতো। অথচ এটি এমন এক বিষয় যাকে জাস্টিসগণ নিজেরাও মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

গ. নুরূপভাবে যদি এই উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য এটিই হতো যা বিচারপতিগণ অনুধাবন করেছেন, তাহলে স্ত্রীকে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। বরং যেমনিভাবে স্বামী আদালতে যাওয়া ছাড়াই তালাক দিতে পারে ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীরও এই অধিকার অর্জিত হতো। অথচ মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ও এ বিষয়টি মানতে নারাজ।

আমাদের আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে, আল্লামা ইবনু রুশদ রহ.-এর উদ্দেশ্য তালাক ও খুলা-চুক্তিকে একই সমান্তরালে দাঁড় করানো নয়, বরং তিনি সূক্ষ্মভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করতে চাচ্ছেন, স্ত্রীকেও খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার একটি পদ্ধতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে; যেন সে স্বামীর মোহর মাফ করে কিংবা কিছু মাল দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়ে স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। স্ত্রীর জন্য এমনটি করতে কোনো গুনাহ নেই। পবিত্র কুরআনের لا جناح অংশ দ্বারা এমনটিই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কখনোই এটি নয় যে, খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতির বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।

ঘ. এখানে সংক্ষিপ্তভাবে মূলনীতিগত কথা বর্ণনা করা নিরর্থক নয় যে, সকল ফকিহের সাধারণ পদ্ধতি হলো তারা কেবল বিধিবিধানের কারণ বর্ণনা করেন; কিন্তু সেগুলোর রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা করেন না। ঘটনাক্রমে যদি কোথাও উপকারিতা (রহস্য) বর্ণনা করেন, তাহলে السر ও الفقه فيه فيه বলার মাধ্যমে একে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে দেন। এ অবস্থায় সর্বস্বীকৃত মূলনীতি এই যে, ফকিহগণের আইনগত উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার জন্য

তাদের বর্ণনাকৃত কারণ ও ইল্লতসমূহের প্রতি লক্ষ করতে হবে। আর যে বিষয়গুলো তারা রহস্য ও উপকারিতা হিসেবে বর্ণনা করেন সেগুলোকে আইনগত বিধানের ভিত্তি বানানো যাবে না। কেননা, ফিকহি বিধিবিধানের ভিত্তি কারণসমূহের ওপর; রহস্য ও উপকারিতার ওপর নয়। এখানে ইবনু রুশদ রহ. এ সূক্ষ্ম বিষয়টিকে الفقه فيه এর শিরোনামেই তুলে ধরেছেন।

দুই. আমরা সবচেয়ে অধিক অবাক হচ্ছি জনাব জাস্টিস এইচএ মাহমুদ সাহেবের এই বর্ণনায় যে, Ibne hazam in al-mohalla supports the qazis right to effict separation by khula after efforts at reconciliation have faild.

'ইবনু হাজম রহ. মুহাল্লা নামক গ্রন্থে কাজির এই অধিকারটি সংরক্ষণ করেছেন যে, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমস্যার সমাধান ও মীমাংসার সমুদয় কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তখন তিনি খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে তাদের বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।'[১৭০]

অথচ আল্লামা ইবনু হাজম রহ. যে কঠোরতার সঙ্গে কাজি এবং সালিশদ্বয়ের এই অধিকার খণ্ডন করেছেন তা প্রতিটি ব্যক্তিই 'আলহামদুলিল্লাহ' গ্রন্থে দেখতে পারেন। তিনি লিখেছেন—

وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، لَا بِخُلْعٍ، وَلَا بِغَيْرِهِ.

'সালিশদ্বয়ের জন্য খুলা-চুক্তি কিংবা অন্য কোনোভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার নেই।'

এ মাসআলায় বিশদ আলোচনা করার পর তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন,

لَيْسَ فِي الْآيَةِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ: أَنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا، وَلَا أَنَّ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ.

'কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও নেই যে, সালিশদ্বয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার রয়েছে। আর না কোনো বিচারকের জন্যও এই অধিকার আছে।'[১৭১]

---

[১৭০] পিএলডি, সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ১৩৭।

[১৭১] আল মুহাল্লা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮৭, ৮৮।

প্রামাণ্য দলিলসমূহ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেসব দলিল-প্রমাণের ফিকহি পর্যালোচনা পেশ করেছি যেগুলো সুপ্রিম কোর্টের আলোচ্য রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সেসব প্রামাণ্য দলিল-প্রমাণ পেশ করবো যেগুলোর মাধ্যমে জানা যাবে, খুলা-চুক্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিসূচক লেনদেনের নাম। আর কাজির জন্য স্বামী-স্ত্রী কিংবা তাদের কারও সম্মতি ছাড়া একে কার্যকর করার অধিকার নেই।

এক. খুলা সংক্রান্ত আয়াতে আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি। উক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই আয়াতের তিনটি বাক্য খুলা-চুক্তি সম্পাদন করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিকে অপরিহার্য করে দিয়েছে—

ক : اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

'তবে যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না।'

খ : فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ

'তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়।'

গ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

'তবে তাদের কারও কোনো পাপ নেই।'

দুই. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.

'আর যদি মোহর নির্ধারণ করার পর স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ে-বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি ছাড় দেয় (এবং পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়) তবে স্বতন্ত্র কথা।'[১৭২]

---

[১৭২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৭।

আলোচ্য আয়াতে الَّذِیْ بِیَدِهٖ عُقْدَةُ النِّکَاحِ দ্বারা উদ্দেশ্য খোদ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী স্বামী। পবিত্র কুরআনের আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বিয়ে-বন্ধন বহাল রাখা না রাখার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র স্বামীর হাতে। সুতরাং এ বন্ধন সে ছাড়া আর কেউ নিঃশেষ করতে পারে না।

জনাব জাস্টিস এইচএ রহমান এবং জনাব জাস্টিস এইচএ মাহমুদ এ দলিলের জবাব এভাবে দিয়েছেন, কোনো কোনো মুফাসসির الَّذِیْ بِیَدِهٖ عُقْدَةُ النِّکَاحِ দ্বারা স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রীর অভিভাবককে উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু এ জবাবটি নিম্নোক্ত কারণসমূহের দরুন সঠিক নয়—

এক. তাফসির করার একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো কোনো আয়াতের যে মর্ম খোদ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, সেই মর্ম সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী ও গ্রহণ করার দিক দিয়ে ওয়াজিব। এ ব্যাপারে স্বয়ং মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে; যা বিভিন্ন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটির মান সনদের বিবেচনায় 'হাসান' থেকে কম নয়। হাদিসটি হলো—

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ»

'আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতা থেকে আর তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, বিয়ে বন্ধনের অভিভাবক স্বামী।'[১৭৩]

একই অর্থবোধক একটি হাদিসে মারফু ইবনু জারির রহ., ইবনু আবি হাতিম রহ., তাবারানি রহ. ও ইমাম বায়হাকি রহ. 'হাসান' সনদসূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ করেছেন। ওই হাদিসের মধ্যে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الَّذِیْ بِیَدِهٖ عُقْدَةُ النِّکَاحِ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বামী দ্বারা করেছেন।[১৭৪]

এ কারণেই সাহাবিগণের অধিকাংশ থেকে এই আয়াতের এ তাফসিরই

---

[১৭৩] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৬।

[১৭৪] তাফসিরে রুহুল মাআনি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১(আমাদের অনুসন্ধান মতে এই হাদিসটি দুর্বল। দেখুন উমদাতুত তাফসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৩) ৫৪।

বর্ণিত হয়েছে। এসব সাহাবির মধ্যে আলি রা. এবং ইবনু আব্বাস রা.-ও রয়েছেন।

দুই. ইমামুল মুফাসসিরিন ইবনু জারির তাবারি রহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থে এ বিষয়ে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছেন এবং অনস্বীকার্য দলিলসমূহের মাধ্যমে এ তাফসিরকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই দলিলসমূহ বিস্তারিতভাবে সেখানে দেখা যেতে পারে। এখানে সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে কেবল উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত করা হচ্ছে।[১৭৫]

সম্মানিত বিচারপতিদ্বয় এ আয়াতের যে মর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তার ফলাফল এই বের হয় যে, স্ত্রীর অভিভাবক স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই তার মোহরের অধিকার ক্ষমা করে দিতে পারেন। কাজি আবুস সাউদ রহ. প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন। তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের সামনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে এই মর্মের বিপরীতে শক্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন—এই আয়াতের সামান্য পরেই ইরশাদ হয়েছে—

وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.

'তোমরা পুরুষরা যদি ছাড় দাও, তাহলে তা হবে পরহেজগারির অধিকতর নিকটবর্তী।'[১৭৬]

অথচ অভিভাবক কর্তৃক স্ত্রীর মোহর মাফ করে দেওয়া কোনো বিবেচনায়ই তাকওয়া হতে পারে না। এই কথা ওই সময়ই সঠিক হতে পারে যখন এর সম্বোধিত ব্যক্তি স্বামীকে স্থির করে বলা হবে, সে যদি বিবেচনা করে পুরো মোহর আদায় করে দেয়, তাহলে তা হবে তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। তাফসিরে আবুস সাউদে এসেছে—

إن الأول أى كون المراد هو الزوج أنسب لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن إسقاط حق الصغيرة ليس فى شيئ من التقوى.

'প্রথম অভিমত তথা স্বামী উদ্দেশ্য হওয়া অধিকতর সংগত। কেননা, মহান আল্লাহ বলেছেন—'তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা করো, তাহলে

[১৭৫] তাফসিরে ইবনু জারির, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩১৮।

[১৭৬] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৭

তা হবে পরহেজগারির অধিকতর নিকটবর্তী।'[১৭৭] কেননা, ছোটো কোনো নারীর অধিকার রহিত করে দেওয়া তাকওয়া হতে পারে না।'[১৭৮]

ফকিহগণের অভিমত

পরিশেষে আমরা মুজতাহিদ ফকিহগণের সেসব উদ্ধৃতি পেশ করবো যেগুলোর মাধ্যমে জানা যাবে হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি, হাম্বালি ও জাহেরি মাজহাবের মধ্যথেকে প্রত্যেকেই এ বিষয়ে একমত যে, খুলা-চুক্তি কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হতে পারে। তাদের কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করতে পারে না।

হানাফি মাজহাব

হানাফি মাজহাবের বহু কিতাবের উদ্ধৃতি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। এখানে কেবল শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ.-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি যা সকল হানাফি ফকিহের উৎস হওয়ার মর্যাদা রাখে। তিনি লিখেছেন—

والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي.

'রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা অন্য কারও কাছে খুলা করা জায়েজ আছে। কেননা, এটি এমন এক চুক্তি যা অন্যান্য লেনদেন চুক্তির মতো পারস্পরিক সম্মতির ওপর নির্ভরশীল।'[১৭৯]

এছাড়াও ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ.-এর স্পষ্ট উদ্ধৃতি এই মর্মের ওপর ইতোপূর্বে দুইবার অতিক্রান্ত হয়েছে। তাছাড়া ফাতাওয়া আলমগিরি এবং ইবনু আবিদিন শামি রহ.-এর উদ্ধৃতিও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

---

[১৭৭] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৭।

[১৭৮] তাফসিরে আবুস সাউদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৯।

[১৭৯] মাবসুত-সারাখসি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৩।

শাফিয়ি মাজহাব

ইমাম শাফিয়ি রহ. লেখেন—

لِأَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْ أَحَدٍ أَبٍ وَلَا سَيِّدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا سُلْطَانٍ.

('অনুরূপভাবে গোলামের মনিব যদি গোলামের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে খুলা চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলেও তা সহিহ হবে না।) কেননা, খুলা হলো তালাক। সুতরাং তা দেওয়ার অধিকার স্বামী ছাড়া পিতা, মুনিব, অভিভাবক ও রাষ্ট্রপ্রধান কারও নেই।'[১৮০]

আর আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজি শাফিয়ি রহ লেখেন—

ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع.

'এই খুলা-চুক্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিয়ে-বন্ধন নিঃশেষ করার নাম; যা মূলত ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য শরিয়তে অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং যেখানে কোনো পক্ষেরই ক্ষতি হবে না সেখানে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করা জায়েজ হবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে 'ইকালা' করা জায়েজ আছে।'[১৮১]

মালিকি মাজহাব

১. আল্লামা আবুল ওয়ালিদ বাজি রহ. মুয়াত্তা মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন : স্ত্রীকে স্বামীর কাছে দিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে যদি স্বামী খুলা বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে আলাদা হতে না চায়।[১৮২]

২. আল্লামা ইবনু রুশদ মালিকি রহ. লেখেন—

وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْخُلْعُ مِنَ الَّتِي لَا يَجُوزُ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ مَعَ التَّرَاضِي إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ رِضَاهَا بِمَا تُعْطِيهِ إِضْرَارَهُ بِهَا.

---

[১৮০] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০০।

[১৮১] আল মুহায্যাব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭১।

[১৮২] আল মুনতাকা, খণ্ড : ৭,পৃষ্ঠা : ৬১।

'রইলো, খুলা কোন অবস্থায় জায়েজ হয় আর কোন অবস্থায় জায়েজ হয় না। তো এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকিহ একমত যে, খুলা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জায়েজ। তবে শর্ত হলো স্ত্রী মাল আদায়ে রাজি হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক বল প্রয়োগ না হওয়া।'[১৮৩]

হাম্বালি মাজহাব

হাম্বালি মাজহাবের অতিশয় নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার মুওয়াফফাকুদ্দিন ইবনু কুদামা হাম্বালি রহ. লেখেন—

وَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى السُّلْطَانِ، كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وَلِأَنَّهُ قَطْعُ عَقْدٍ بِالتَّرَاضِي، أَشْبَهَ الْإِقَالَةَ.

'তাছাড়া খুলা একটি বিনিময় চুক্তি। সুতরাং তা সম্পাদিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন নেই। যেমন বিয়ে ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া খুলা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ে-বন্ধনকে ছিন্ন করার নাম; তাই তা 'ইকালা' এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেলো।'[১৮৪]

আল্লামা ইবনু কইয়্যিম রহ. লেখেন—

وَفِي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الْخُلْعَ فِدْيَةً، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، وَلِهَذَا اعْتُبِرَ فِيهِ رِضَى الزَّوْجَيْنِ.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাচুক্তিকে 'ফিদয়া' বলে নামকরণ করার মধ্যে এই প্রমাণ রয়েছে যে, খুলা-চুক্তিতে বিনিময়ের অর্থ রয়েছে। আর এ কারণেই তাতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিকে অপরিহার্য করা হয়েছে।'[১৮৫]

---

[১৮৩] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮।

[১৮৪] আল মুগনি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫২।

[১৮৫] জাদুল মায়াদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৮।

জাহেরি মাজহাব

আল্লামা ইবনু হাজম জাহেরি রহ. লেখেন—

الخُلْعُ، وَهُوَ: الِافْتِدَاءُ إِذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، فَخَافَتْ أَنْ لَا تُوفِيَهُ حَقَّهُ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يُبْغِضَهَا فَلَا يُوفِيهَا حَقَّهَا، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ وَيُطَلِّقَهَا، إِنْ رَضِيَ هُوَ؟ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ هُوَ؟ وَلَا أُجْبِرَتْ هِيَ؟ إِنَّمَا يَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا.وَلَا يَحِلُّ الِافْتِدَاءُ إِلَّا بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمَا، فَإِنْ وَقَعَ بِغَيْرِهِمَا فَهُوَ بَاطِلٌ، وَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ، وَيَبْطُلُ طَلَاقُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهَا فَقَطْ.

'যখন স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করে অথবা ভয় করে যে, সে তার অধিকার আদায় করতে পারবে না অথবা সে আশঙ্কা করে, স্বামী তার ওপর রাগান্বিত হবে ফলে তার অধিকার আদায় করতে পারবে না, তাহলে তার জন্য এই অধিকার রয়েছে যে, সে টাকা-পয়সা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে স্বামীর বিয়ে-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে। আর স্ত্রীর টাকা পয়সা দিয়ে স্বামী থেকে মুক্তিলাভ করার নামই 'খুলা'। টাকা পেয়ে স্বামী যদি সম্মত হয় সে স্ত্রীকে তালাক দেবে, তাহলে সে তা করতে পারে। আর যদি সে সম্মত না হয়, তাহলে তাকে কিংবা স্ত্রীকে খুলা-চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, খুলা কেবল পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই অবস্থার কোনো এক অবস্থা অথবা উভয় অবস্থা না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত খুলা-চুক্তি সম্পাদন করা জায়েজ হবে না। সুতরাং স্বামী এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ যদি খুলা-চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তা তাকে ফিরিয়ে দেবে। আর সে আগের মতোই স্ত্রী থাকবে। স্বামীর তালাক বাতিল হয়ে যাবে। তবে স্বামীকে কেবল স্ত্রীর ওপর জুলুম করা থেকে বারণ করা হবে।'[১৮৬]

অন্য এক জায়গায় তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন—

لَيْسَ فِي الْآيَةِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ: أَنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا، وَلَا أَنَّ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ.

---

[১৮৬] আল মুহাল্লা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৩৫।

'কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও একথা নেই যে, সালিশদ্বয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার আছে। আর না কোনো বিচারকের জন্যও এই অধিকার আছে।'[১৮৭]

খুলা শব্দের ফিকহি মর্ম

বাস্তব কথা হলো খুলা শব্দের ফিকহি মর্মের মধ্যেই এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই তা সম্পাদিত হয়। এছাড়া এর আর কোনো পথ ও পন্থা নেই। আল্লামা আবুল ফাতাহ মুতাররেজি রহ. তার গ্রন্থ 'আল মুগারিব'-এ লেখেন—

وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها فإذا أجابها إلى ذلك فطلقها قيل خلعها.

'স্ত্রী খুলা-চুক্তি সম্পাদন করেছে তখনই বলা হয় যখন সে নিজের স্বাধীনতার জন্য স্বামীর কাছে কোনো মাল পেশ করে। সুতরাং স্বামী যদি স্ত্রীর এই পেশকৃত মাল কবুল করে নেয় এবং তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তখনই বলা হবে স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে খুলা-চুক্তি নিষ্পন্ন করেছে।'[১৮৮]

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জনাব এইচএ রহমান মুখবন্ধের শুরুতে 'তাকলিদ'-এর মাসআলা নিয়ে কথা বলেছেন। তার এই আলোচনাও আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কেননা, এখানে মাসআলা 'তাকলিদের' নয়, বরং সকল ফকিহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। 'তাকলিদের' আলোচনা তো সেখানেই তুলনীয় হতে পারে যেখানে কোনো মাসআলা কোনো একজন ফকিহের কথার ওপর ভিত্তিশীল হবে। কিন্তু পাঠক ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছেন যে, খুলা-চুক্তির এ মাসআলাটি হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি, হাম্বালিসহ জাহেরি মাজহাবের লোকদের কাছেও সর্বসম্মত ও স্বীকৃত। এটি কেবল কোনো একজন ফকিহের নিরেট ব্যক্তিগত কথা নয়। সুতরাং বিচারপতি 'তাকলিদ' সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন তার ওপর পর্যালোচনা করাকে আমরা জরুরি মনে করি না।

---

[১৮৭] আল মুহাল্লা, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮৭, ৮৮।

[১৮৮] আল মুগারিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৫।

পরিশেষে একটি ভুলের জবাব দেওয়াও জরুরি মনে করছি। আর তা হলো জনাব জাস্টিস এইচএ মাহমুদ লিখেছেন যে, ফকিহগণের যত উদ্ধৃতির মধ্যে খুলা-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য স্বামী এবং স্ত্রীর সম্মতিকে অপরিহার্য করা হয়েছে সেখানে কেবল খুলা-চুক্তির এমন একটি প্রকারের আলোচনা এসেছে যা বিচারক পর্যন্ত উত্থাপিত হয় না। কিন্তু খুলা তালাকের আরেকটি প্রকারও রয়েছে যার মধ্যে বিচারপতিই খুলা করেন এবং বিচারপতির নির্দেশক্রমে বিয়ে-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় এবং এতে স্বামীর সম্মতিও জরুরি নয়।[১৮৯]

কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষেই যদি ফকিহগণের মতে খুলা-চুক্তি দুই প্রকার হয়ে থাকে, তাহলে ফকিহগণ এই দুই প্রকারকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেননি কেন? কেনো তারা খুলা তালাকের সংজ্ঞা ও পরিচিতি এভাবে বর্ণনা করেন যার ফলে কেবল প্রথম প্রকারটিই শামিল থাকে? এরপর তারা নিজেদের গ্রন্থাবলিতে খুলা তালাকের সকল বিধিবিধান, শর্ত, রুকন ও বিভিন্ন বিশদ বিবরণ এভাবে করেন যার ফলে কেবল প্রথম প্রকারটিই আলোচনায় আসে। তারা খুলা অধ্যায়ে কোনো একটি শব্দের মাধ্যমেও দ্বিতীয় প্রকারটির প্রতি ইঙ্গিত করেন না। যে খুলা-চুক্তির জন্য তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন, যদি তা কেবল খুলা-চুক্তির প্রথম প্রকার হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় প্রকার গেলো কোথায়? এ প্রকারটির বিধিবিধান কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে? প্রথম প্রকারের জন্য পুরো অধ্যায় ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারটি কি কেবল একটি লাইনের মাধ্যমেও প্রকাশ হবার হকদার নয়?

যদি এ প্রমাণ পেশ পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে কি কাল একথা বলা হবে না যে, তালাকের যত প্রকার ফকিহগণ বর্ণনা করেছেন তা কেবল তালাকের এক প্রকারের বিধিবিধান যার অধিকার পুরুষকে দেওয়া হয়েছে। আর তালাকের আরেকটি প্রকার রয়েছে যার অধিকার স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। আর যেখানে ফকিহগণ এ কথা বলেছেন যে, তালাকের অধিকার কেবল পুরুষের, নারীর নয়; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রথম প্রকার। আর দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগ করা স্ত্রীর অধিকারে।

যদি এ কথা সঠিক না হয় আর কে আছে যে, একে সঠিক বলবে, তাহলে খুলা তালাকের ব্যাপারে একই কথা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

---

[১৮৯] পিএলডি, সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৭ পৃষ্ঠা : ১৪০।

কাজি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, অধিকাংশ ফকিহের মতে বিশেষ কিছু অবস্থায় শরয়ি কাজিকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তিনি স্বামীর সম্মতি ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। আর তার এই বিচ্ছেদ ঘটানো তালাকের মতোই। আর এই তালাক স্বামীর অনুমতি ছাড়া বিচারপতির পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যেমন : স্বামী যদি নিরুদ্দেশ, পাগল ও পুরুষত্বহীন হয়, তাহলে এসব অবস্থায় শরয়ি কাজির জন্য তাদের মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবার অধিকার রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে রয়েছে। এজন্য কাজির বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার মাসআলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়াকে সংগত মনে করছি।

বাস্তব কথা হলো স্ত্রীকে যেসব অধিকার দেওয়া স্বামীর জন্য কর্তব্য সেগুলো দুই প্রকার। প্রথম প্রকার অধিকার সেগুলো, যেগুলো আইনগত মর্যাদা রাখে এবং যেগুলো বিয়ের আইনানুগ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য জরুরি। যেমন : ভরণ পোষণ ও স্বামীর দায়িত্বসমূহ। এগুলো এমন অধিকার যেগুলোকে আইন ও আদালতের বলে স্বামীর কাছ থেকে উসুল করা যায়। আর স্বামী যদি এগুলোকে আদায় করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য আইনগতভাবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি সে তালাক দিতে অস্বীকার করে বা তালাক দেওয়ার যোগ্য না থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে কাজিকে তার স্থলাভিষিক্ত করে বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়। পাগল, ভরণ-পোষণ প্রদানে অস্বীকারকারী, পুরুষত্বহীন, নিরুদ্দেশ ও খবর পাওয়া যায় না এমন ব্যক্তির বিধান এটিই।

এর বিপরীতে বিয়ের কিছু অধিকার এমন যেগুলো আদায় করা নৈতিকভাবে জরুরি কিন্তু আইনগতভাবে জরুরি নয়। আদালতের শক্তিবলেও এগুলোকে উসুল করা যায় না। যেমন : স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ। স্পষ্ট যে, এই অধিকারসমূহ আইনের বলে কার্যকর করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামীর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আদালত এ সব অধিকার আদায় করার ব্যবস্থা করতে পারবে না। আর যখন এ প্রকার অধিকারের সম্পর্ক আদালতের সঙ্গে নয়, তাই কাজির এ অধিকারও নেই যে, সে কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

অতএব, এ বিষয়ে সকল ফকিহ একমত যে, কেবল পাঁচটি দোষের ওপর ভিত্তি করে কাজি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন—

১. স্বামী যখন পাগল হয়।
২. স্বামী যখন ভরণ-পোষণ আদায় করে না।
৩. স্বামী যখন পুরুষত্বহীন হয়।
৪. স্বামী যখন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
৫. স্বামী যখন এমনভাবে অনুপস্থিত হয় যে, তাকে নিরুদ্দেশ বলে অভিহিত করা যায়।

এই পাঁচটি অবস্থা ছাড়া কাজির জন্য কখনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার নেই। আর কেবল স্ত্রীর পক্ষ থেকে অপছন্দ হওয়ার কারণে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েজ হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) ‘ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়’ বিষয়ে ইসলামি ফিকহ অ্যাকাকাডেমি জেদ্দা-এর জন্য আরবি ভাষায় ‘المستقبليات في السلع عقود’ (ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়) শিরোনামে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ রচনা করেন। আমরা সেটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম
মাকতাবাতুল ইসলাম

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

আজকাল পুঁজি বাজারে ব্যবসার একটি বিশেষ প্রকার প্রচলিত রয়েছে, যাকে আরবিতে 'المستقبليات' এবং ইংরেজিতে (Futures) বলা হয়। ব্যবসার এ প্রকারটিতে বিশেষ কতিপয় বস্তু ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো তারিখে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। আজকাল বিশ্ব পুঁজিবাজারে এবং বিশেষত, পশ্চিমা দেশসমূহে ব্যবসার যত ধরন প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এই প্রকারের ব্যবসার প্রচলনে বহু রমরমা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ব্যবসার জন্য এখন স্বতন্ত্র মার্কেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব মার্কেটে দিনে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা-পয়সার লেনদেন হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, ব্যবসার এ বিশেষ পদ্ধতিকে অস্তিত্বে আনার জন্য সর্বপ্রথম ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে একটি বাণিজ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়; যার নাম (Chicago board of trade)। অবশ্য জাপানিগণ দাবি করেন, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দেরও একশো বছর আগে তারা ব্যবসার এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।[১৯০]

প্রথমত : ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে লেনদেনের কাঠামো ও পরিচয়

ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মূলতত্ত্ব জানার জন্য 'এনসাইক্লোপিডিয়া ওফ ব্রিটানিকা'-এর মধ্যে এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

---

[১৯০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন; (Gerald gold : Modern commodity futures, Trading, seventh ed. ১৯৯৫ p. ১৫।

Commercial contracts calling for the purchase or sale of specifide quantities of commodities at specified future dates

'এটি এমন এক বাণিজ্যিক চুক্তি যার উদ্দেশ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো তারিখের সাথে সম্পৃক্ত করে ক্রয় কিংবা বিক্রয় করা।'

এই সংজ্ঞার সারকথা হলো, এই লেনদেনের মধ্যে যে বস্তুর বিক্রয় সম্পাদিত হয় তা অর্পণ ও গ্রহণ ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো তারিখে হয়ে থাকে। কিন্তু এ সংজ্ঞায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, 'অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়' (Forward sales)-এর সংজ্ঞাও এসব শব্দেই করা হয়। কেননা, এ ক্রয়-বিক্রয়েও পণ্যকে ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট কোনো তারিখে ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করা হয়।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ও 'অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হলো 'অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়'-এর মধ্যে ভবিষ্যৎ কোনো তারিখে পণ্য হস্তান্তর করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং বিক্রেতা ওই নির্দিষ্ট তারিখে বাস্তবেই পণ্য অর্পণ করতে চায়। আর ক্রেতা সেই নির্দিষ্ট তারিখে পণ্য গ্রহণ করতে চায়। ফলে ওই নির্দিষ্ট তারিখে বাস্তবেই পণ্য হস্তান্তর ও অর্পণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-এর মধ্যে পণ্য ও বস্তুকে কেবল ওই লেনদেনের ভিত্তি বানানো হয়। অধিকাংশ অবস্থায় এই চুক্তিতে পণ্যের অর্পণ ও গ্রহণ উদ্দেশ্য থাকে না, বরং এ ক্রয়-বিক্রয়ের আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হয়তো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের টাকা বিনিয়োগ কিংবা এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী কোনো অগ্রীম বিক্রিতে (Forwand) লোকসানের হাত থেকে বেঁচে থাকা। এজন্য ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পণ্য অর্পণ ও গ্রহণ করার বিষয়টি বিরল হয়ে থাকে। আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট ও বিশদ বিবরণ পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় (Future sales) ও অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (Forward sales)-এর মধ্যে যে পার্থক্য উপরে বর্ণনা করা হয়েছে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা'-এর মধ্যে Futures (ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়)-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর এই পার্থক্যও তুলে ধরা হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে—

'And the term commodity is used to define the underlying

asset. Even though the contract is frequently divorced from the product. It therefore differs from a simple forward purchase in the cashmarket, which involves actual delivery of the commodity at the agreed time in the future.'

'ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় (Futures)-এর মধ্যে পণ্যের (Commodity) ব্যবহার কেবল এ কারণে করা হয়, যাতে এ লেনদেনে সেসব বস্তুকে ভিত্তি বানানো যায়। অন্যথায় এ লেনদেনে পণ্যসামগ্রী মূলত উদ্দেশ্য হয় না, বরং সাধারণত এ লেনদেন বস্তুর (Commodity) আদান-প্রদান থেকে শূন্য থাকে। এজন্য ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সেই 'অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়' থেকে ভিন্ন যা বর্তমান বাজারে প্রচলিত রয়েছে। এই লেনদেনে বাস্তবিকভাবেই ভবিষ্যতের চুক্তিকৃত নির্দিষ্ট কোনো তারিখে পণ্য গ্রহণ ও অর্পণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে থাকে।'

দ্বিতীয়ত : এ সকল চুক্তির প্রয়োগ-পদ্ধতির বিবরণ

ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় (Futures)-এর প্রয়োগ-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ এই যে, এ লেনদেনটি ব্যাপকভাবে কেবল সেসব বাজারেই সম্পন্ন হয়ে থাকে যেসব বাজার কেবল এ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমন বাজারকে আরবিতে 'سوق تبادل السلع' এবং ইংরেজিতে Commodity Exchange বা 'পণ্য বিনিময় বাজার' নামে অভিহিত করা হয়। এসব বাজার মেম্বারশিপের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি এই বাজারে গিয়ে ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় (Futures) করতে চায়, তাহলে তার জন্য এ বাজারের সদস্য হওয়া জরুরি। আর এ মেম্বারশিপ এমন ব্যক্তির জন্য চালু করা হয়, যে বেশ কিছু পণ্য প্রস্তুতকারী বা কয়েক প্রকার পণ্য ব্যবসায় জড়িত অথবা ব্রোকারেজ সংস্থার সদস্য (দালাল) যদি কোনো ব্যক্তি এ বাজারের সদস্য না হয়ে এ বাজারে লেনদেন করতে চায়, তাহলে তাকে উক্ত বাজারের মেম্বার কোনো দালালের মাধ্যমে ব্যবসা করতে হবে। সরাসরি সে ব্যবসা করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি এ বাজারের মেম্বার তার জন্য জরুরি হলো সে ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় (Futures) করার আগে এ বাজারের ব্যাবস্থাপকদের কাছে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবে। এই অ্যাকাউন্টে

সবসময় নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা আমানত হিসেবে রাখতে হয়। বাজারের নিয়ম অনুযায়ী সেই টাকা লেনদেনের নিষ্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে থাকবে। আর সাধারণত সঞ্চিত এই অর্থ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার সময় ওই পণ্যের যে মূল্য ধার্য করা হয় তার ১০% এবং ভবিষ্যতে এ বস্তুর যে মূল্য দাঁড়াতে পারে তার ৭%-এর চেয়ে বেশি হয় না। আর এই টাকা সঞ্চিত রাখার আসল উদ্দেশ্য থাকে পরবর্তী সময়ে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় আর কোনো এক পক্ষ নিজের জিম্মায় অপরিহার্য হওয়া টাকা আদায় করতে অস্বীকার করে বসে, তাহলে এ অবস্থায় তার অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত থাকা টাকার মাধ্যমে অপরপক্ষের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

অ্যাকাউন্ট খোলার পর ভবিষ্যতের কোনো তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি লাভ হয় এবং যে বস্তুর চুক্তি করা হয় তার পরিমাণকে কয়েকটি ব্যবসায়িক ইউনিটে (Trading units) বিভক্ত করা হয়। এর প্রতিটি ইউনিট চুক্তিকৃত ওই বিশেষ বস্তুর পরিচিত পরিমাণকে প্রকাশ করে থাকে। যেমন গমের যে ইউনিট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত তা হলো পাঁচ হাজার বস্তা। সুতরাং এখন এ পরিমাণের চেয়ে কমে লেনদেন হবে না। আর যে ব্যক্তি এ লেনদেন-চুক্তি সম্পাদন করবে তার জন্য এই অধিকার অর্জিত হবে যে, সে এক ইউনিট গম বা দুই ইউনিট গম বা তার চেয়ে আরও অধিক ইউনিট গমের লেনদেন করবে। এমনিভাবে চুক্তিকৃত পণ্যের মান ভালো ও মন্দ হওয়ার বিবেচনায় এই বস্তুকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা হয়। এরপর এ প্রকারগুলোকে বিশেষ নম্বরসমূহের মাধ্যমে পরিচিত করানো হয়। যেমন বলা হয় 'প্রথম স্তরের গম', 'দ্বিতীয় স্তরের গম' ও 'তৃতীয় স্তরের গম।' আর প্রতিটি স্তরের গমের গুণাবলি সম্পর্কে লেনদেনকারীগণ সম্যক অবগত থাকেন।

অতএব, যে ব্যক্তি জানুয়ারি মাসে প্রথম স্তরের এক ইউনিট গম অক্টোবরের কোনো এক তারিখে অর্পণ করার শর্তে বিক্রয় করতে চায়, সে এই বাজারে প্রথম স্তরের এক ইউনিট গম অক্টোবরে অর্পণ করার ভিত্তিতে এত পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করার অফার করবে যার মধ্যে তার লাভ হওয়ার আশা থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি এক ইউনিট গম এত দামে ক্রয় করার জন্য তৈরি হবে সে তার এই অফার গ্রহণ করবে। এরপর ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটারও প্রয়োজন হবে না, বরং ওই প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষের শর্ত পূরণ করার জিম্মাদার হবে। এজন্য বিক্রেতা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তার পণ্য বাজারে পেশ করাবে এবং ক্রেতাও এই

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বিক্রেতার এই অফার গ্রহণ করবে। আর পণ্য অর্পণ করার সময় এলে প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ের জিম্মাদার হবে যে, বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করবে এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ করবে।

আর বাস্তবে এ লেনদেনটি এত সহজ-সরল নয় যেভাবে আমরা এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছি। কখনো এমন হয় না যে, ক্রেতা বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য হস্তান্তরের প্রতীক্ষা করতে থাকে এবং নির্দিষ্ট তারিখ এলে সে পণ্য গ্রহণ করে। বরং এই এক চুক্তি যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে; জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রস্থল হতে থাকে। আর কোনো কোনো সময় কেবল এই এক চুক্তির ওপর দৈনন্দিন বহুবার বিক্রয় হয়ে থাকে। এভাবে হস্তান্তরের দিন আসা পর্যন্ত চলে। যেমন : জায়েদ এক ইউনিট গম অক্টোবরে হস্তান্তর করার শর্তে বিক্রয় করেছে। এখন আমর এই একই গম খালিদের কাছে বিক্রয় করে দেবে, আর খালিদ হামিদের কাছে বিক্রয় করে দেবে। আর প্রতিটি ব্যক্তিই আপন মুনাফা রেখে অধিক মূল্যে বিক্রয় করতে থাকবে। ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যে যে পার্থক্য হবে তা সেই ঝুঁকির মুনাফা হবে যা তারা বহন করেছে। এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি সেই গম কম মূল্যে ক্রয় করে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তি উভয় মূল্যের মধ্যকার প্রভেদকে নিজের মুনাফা স্বরূপ পাওয়ার অধিকার রাখে। আর ক্রেতা হওয়ার কারণে না তার জন্য বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে আর না বিক্রেতা হওয়ার সুবাদে পণ্য হস্তান্তর করা তার জন্য অপরিহার্য হবে। এজন্য আলোচ্য উদাহরণটিতে আমর যদি জায়েদের কাছ থেকে এক ইউনিট গম অক্টোবরে অর্পণ করার ভিত্তিতে দশ হাজার ডলার দিয়ে ক্রয় করে এবং পরবর্তী সময়ে খালিদের কাছে এগারো হাজার ডলারে ওই গম বিক্রয় করে দেয়, তাহলে এখন আমর না জায়েদকে পণ্যের মূল্য আদায় করবে আর না খালিদকে পণ্য হস্তান্তর করবে। অবশ্য এই দুই চুক্তির ভিত্তিতে এক হাজার ডলার মুনাফা সে উসুল করে নেবে।

ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি (Futures) তদারকি করার জন্য প্রতিষ্ঠান বাজারে একটি অফিস নির্ধারণ করে দেয়, যাকে মার্কেটের পরিভাষায় Clearing house (নিষ্পত্তি কক্ষ) বলা হয়। আর বাজারে যেসব লেনদেন হয়ে থাকে সবগুলো এই Clearing house-এর মধ্যেই রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। এই Clearing house এই বিষয়ের দায়িত্বশীল হয়ে থাকে যে, সারাদিন যেসব লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে সবগুলোকে সে সন্ধ্যায় শেষ করে। যেমন :

আলোচ্য উদাহরণে আমর ওই দিনের সন্ধ্যায় নিজের মুনাফার এক হাজার ডলার Clearing house থেকে উসুল করে নেবে। এর মাধ্যমে সে এই লেনদেন-চুক্তি থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

মোটকথা, এই চুক্তিতে পণ্য হস্তান্তর করার মাস আসা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন লেনদেন হতেই থাকে। আর যখন অক্টোবর মাস আসবে তখন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সর্বশেষ ক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়া হবে, পণ্য হস্তান্তরের তারিখ সমাগত। এখন আপনার ইচ্ছা কী? আপনি কী ওই তারিখে এই গমে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান নাকি এ লেনদেনকে সামনে বিক্রয় করে দিতে আগ্রহ রাখেন? এখন যদি ক্রেতা ওই গমে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে এ অবস্থায় বিক্রেতা সেই নির্দিষ্ট গম গুদামে পৌঁছে দিয়ে এর প্রত্যয়ন-পত্র গ্রহণ করবে। আর সে এই প্রত্যয়ন-পত্র পণ্য গ্রহণে প্রত্যাশী ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে এর ভিত্তিতে গমের মূল্য উসুল করে নেবে।

আর সর্বশেষ ক্রেতা যদি পণ্যের মধ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী না হয়, বরং এ লেনদেন চুক্তিকে বিক্রয় করে দিতে চায়, তাহলে এ অবস্থায় সর্বশেষ ক্রেতা পুনরায় সর্বপ্রথম বিক্রেতার সঙ্গে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে। এখন এই লেনদেনের পরিসমাপ্তি ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে। আর এই পার্থক্য-মূল্যের পরিশোধ এই ভিত্তিতে হবে যেভাবে পণ্য হস্তান্তরের তারিখ আসার আগের লেনদেনসমূহ সম্পন্ন হয়েছিলো। আর এভাবে এই লেনদেন-চুক্তির শেষ পর্যন্ত পণ্য গ্রহণ ও হস্তান্তরের বিষয়টি পাওয়া যায় না।

এসব বাজারের অধিকাংশ আদান-প্রদানে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই পাওয়া যায়। এজন্য পণ্য হস্তান্তরের বিষয়টি খুব কমই সামনে আসে। আর তা হয়তো শতকরা ১% হবে।

সাধারণত যেসব ব্যক্তি এসব লেনদেনে অংশগ্রহণ করে তারা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এই দুই প্রকার ব্যক্তির প্রত্যেকের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন থাকে।

এক. কোনো কোনো লোক এমন হয়ে থাকে যারা মুনাফা পাওয়ার আশায় নিজেদের টাকা বিনিয়োগ করে। পরিভাষায় এসব লোককে (Speculator) বলা হয়। এই লেনদেনের মাধ্যমে এসব লোকের উদ্দেশ্য না ক্রয় করা হয়ে থাকে আর না বিক্রয় করা। পণ্য কিংবা মূল্যও তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। তাদের উদ্দেশ্য কেবল এই থাকে যে, ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে

পার্থক্য; তা যেন তারা উসুল করতে পারে। ইতোপূর্বে আমরা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তাই এসব লোক সাধারণত বাজারদরের উত্থান-পতন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের লেনদেন চুক্তি এই আশায় করে নেয় যে, কিছুদিন পর যখন দাম বেড়ে যাবে তখন অধিক মূল্যে একে বিক্রয় করে দেবে। আর এই চুক্তির ফলে ক্রেতা-বিক্রেতার পণ্য অর্পণ ও গ্রহণের ঝক্কি-ঝামেলায় জড়ানো ছাড়াই নিরেট মুনাফা হাসিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় অনেক চুক্তিতে তাদের এই আশা পূরণ হয় আবার অনেক চুক্তিতে অপূর্ণ থেকে যায়।

দুই. কোনো কোনো ব্যক্তির এই চুক্তির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সে যে চুক্তি এখন সম্পাদন করছে ভবিষ্যতে যাতে তার মুনাফা সংরক্ষণ করতে পারে এবং ক্ষতি থেকে বেঁচে যেতে পারে। একে পরিভাষায় 'تامين الربح' (HeIging) হেজিং নামে অভিহিত করা হয়।

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে অনুধাবন করা অনেক সহজ হবে। যেমন : জায়েদ সাধারণ বাজার থেকে গমের দশ হাজার বস্তা প্রতি বস্তা পাঁচ ডলারে ক্রয় করেছে। এখন এটি এমন এক সাধারণ বিক্রয় যার মধ্যে পণ্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বাজারের অবস্থা দেখে তার এই খেয়াল হয়েছে যে, সে এই গম তিনমাস পর বিক্রয় করে দেবে। কিন্তু জায়েদের এই আশঙ্কা এবং ঝুঁকিও রয়েছে যে, তিনমাস পর গমের দরপতন ঘটে কি না যার কারণে তার লোকসান হয়ে যাবে। যেমন : যদি প্রতি বস্তায় অর্ধ ডলার দাম কমে যায়, তাহলে তার পাঁচ হাজার ডলার লোকসান হয়ে যাবে।

অতএব, সে লোকসান থেকে আত্মরক্ষার জন্য Future market-এ যায় এবং এই গম মুক্ত বাজারের দর অনুযায়ী তিন মাস পর হস্তান্তর করার ভিত্তিতে বিক্রয় করে দেয়। এভাবে সে দুইটি চুক্তি সম্পাদন করে, গম ক্রয় করার লেনদেন মুক্তবাজারে করে আর বিক্রয় করার চুক্তি ফিউচার মার্কেটে করে। আর এভাবে সে এক লেনদেনের মুনাফার মাধ্যমে অন্য লেনদেনের ক্ষতি পূরণ করে নেয়। এজন্য এখন যদি তিন মাস পর এই গমের দাম প্রতি বস্তায় অর্ধ ডলার কমে যায়, তাহলে জায়েদের প্রথম চুক্তির মধ্যে পাঁচ হাজার ডলার লোকসান হয়ে যাবে। কিন্তু এই সময়ে জায়েদ অন্য যে চুক্তি Future market-এ সম্পাদন করেছিলো তার মাধ্যমে প্রায় একই পরিমাণ মুনাফা হাসিল হয়ে যাবে। কেননা, এই অবস্থায় ফিউচার মার্কেটের মধ্যেও এই গমের দাম প্রতি বস্তায় প্রায় অর্ধ ডলার কমে

যাবে। তাই এখন ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, জায়েদ তিন মাস আগে Future market-এ অধিক মূল্যে যে গম বিক্রয় করেছিলো এখন সে এই গমই কমদামে ক্রয় করবে। আর এভাবে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হবে তা মুনাফার আকৃতিতে হাসিল হয়ে যাবে। সেই মুনাফা হলো পাঁচ হাজার ডলার। এভাবে সাধারণ মুক্তবাজারে যে ব্যক্তি গম ক্রয় করেছিলো আর এর মধ্যে গমের মূল্য কম হয়ে যাওয়ার কারণে তার যে লোকসান হয়েছিলো তার ক্ষতিপূরণ এই বিক্রয়চুক্তির মুনাফার মাধ্যমে হয়ে যাবে যা সে Future market-এ করেছে। নিচের চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ক্র	মুক্তবাজার	ফিউচার মার্কেট
১	সেপ্টেম্বর, দশহাজার বস্তা গম	সেপ্টেম্বর, দশহাজার বস্তা গম
২	প্রতি বস্তার বিক্রয় মূল্য পাঁচ ডলার	প্রতি বস্তার বিক্রয় মূল্য পাঁচ ডলার
৩	ডিসেম্বর, দশহাজার বস্তা গম	ডিসেম্বর, দশহাজার বস্তা গম
৪	প্রতি বস্তার বিক্রয় মূল্য ৪.৫০ ডলার	প্রতি বস্তার বিক্রয় মূল্য ৪.৫০ ডলার
৪	প্রতি বস্তায় লোকসান, ০০.৫০ ডলার	প্রতি বস্তায় লাভ, ০০.৫০ ডলার

আর ডিসেম্বর মাসে যদি প্রতি বস্তা গমের মূল্য অর্ধ ডলার করে বেড়ে যায়, তাহলে ফিউচার মার্কেটে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং খোলাবাজারে সে লাভমান হবে। উভয় অবস্থায় সে এক চুক্তির লোকসান অন্য চুক্তির মুনাফার মাধ্যমে পূরণ করতে পারবে। আমাদের বর্ণিত 'تامين الربح' (Helging)-এর মূলতত্ত্ব এটিই।

মোটকথা, এটিই হলো ফিউচার মার্কেটিং এর সারসংক্ষেপ। আজকাল এর লেনদেন আরও হযবরল হয়ে গেছে এবং এর লেনদেন বস্তুর গণ্ডি পেরিয়ে 'মুদ্রা' ও 'অধিকার স্বত্বে' বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু আমরা এর যে সারসংক্ষেপ ইতোপূর্বে পেশ করেছি তা এ বিষয়টির মূলতত্ত্ব অনুধাবন করা এবং এর শরয়ি বিধান বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়ত : ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার শরয়ি বিধান

শরিয়তের নিয়ম-কানুন ও বিধিবিধানের ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিও যদি ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার লেনদেনটিতে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার কাছে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ ও সংশয় থাকতে পারে

না যে, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ লেনদেনটি সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা শরিয়তের বহু বিধিবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

প্রথমত, এ কারণে যে, এই লেনদেনে এমন বস্তু বিক্রয় করা হয় যা ব্যক্তির মালিকানায় নেই। আর শরিয়তের মূলনীতি হলো ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক নয় তা বিক্রয় করা তার জন্য জায়েজ নয়। হাকিম ইবনু হিজাম রা. বর্ণনা করেন, একবার আমি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি কোনো ব্যক্তি আমার কাছে এমন কোনো বস্তু ক্রয় করার জন্য আসে যা আমার মালিকানায় নেই; তাহলে আমার জন্য কি এটি জায়েজ হবে যে, প্রথমে আমি এই বস্তু বিক্রয় করবো এরপর বাজার থেকে বস্তুটি ক্রয় করে এনে তাকে দিয়ে দেবো? মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এমন বস্তু বিক্রয় করো না যা তোমার কাছে নেই।'[১৯১]

আর এই লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয়ের যে চুক্তি পণ্য অর্পণ করার আগেই একের পর এক হয়ে থাকে তা পণ্য হস্তগত করার আগেই পূর্ণ হয়ে যায়। আর ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.

'যে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করলো নিজের আয়ত্তে আনার আগে সে যেন একে বিক্রয় না করে।'[১৯২]

কোনো কোনো ব্যক্তি 'বায়ে সালাম' এর ভিত্তিতে এ বিক্রয় পদ্ধতিকেও জায়েজ বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণসমূহের দরুন 'বাইয়ে সালাম'-এর নিরিখে ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার লেনদেনটিকে জায়েজ বলে অভিমত ব্যক্ত করা সঠিক নয়।

এক. 'বায়ে সালাম'-এর মধ্যে পুরো মূল্য অগ্রীম আদায় করা ওয়াজিব। এই মূল্যকে 'رأس مال السلم' বায়ে সালামের মূলধন বলে অভিহিত করা হয়। যেমন : আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. 'বায়ে সালাম' সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন—

(وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ،

[১৯১] জামিউল উসুল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫৭, তিরমিজি ১২৭৬,১২৩২, আবু দাউদ ৩৫০৩।
[১৯২] সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ قَبْضُهُ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ لَا يَخْرُجُ بِتَأْخِيرِ قَبْضِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَلَمًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَأَخَّرَ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ. وَلَنَا، أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، لَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ تَأْخِيرِ الْعِوَضِ الْمُطْلَقِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالصَّرْفِ.

'বায়ে সালাম' সম্পাদন করার সময় মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগেই পূর্ণ মূল্য পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তগত করতে হয়। এটি ষষ্ঠ শর্ত। অর্থাৎ, 'বায়ে সালাম'-এর মূল্য মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগেই নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেবে। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা আয়ত্ত করার আগেই মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফিয়ি রহ.-এরও অভিমত। আর ইমাম মালিক রহ. বলেন—দুই বা তিনদিন কিংবা আরও অধিক সময় পর্যন্ত মূল্য গ্রহণ বিলম্বিত করা জায়েজ আছে, যে পর্যন্ত তা শর্ত বলে গণ্য না হবে। কেননা, এটি একটি বিনিময়-চুক্তি যার মূল্য গ্রহণ বিলম্বিত করলে তা 'বায়ে সালাম' থেকে বের হবে না। ফলে তা এমন চুক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেলো যা মজলিসের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। আর আমাদের প্রমাণ হলো—এটি এমন এক বিনিময়-চুক্তি যার মধ্যে পণ্যের মূল্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিলম্বের শর্তারোপ করা সাধারণভাবেই জায়েজ নেই। ফলে পণ্যের মূল্য গ্রহণ করার আগে মজলিস ত্যাগ করা জায়েজ হবে না। সুতরাং 'বায়ে সালাম' চুক্তির মধ্যে বায়ে সরফের মতো আগে মজলিস থেকে পৃথক হওয়া জায়েজ নেই।

উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের মতে বায়ে সালামের মধ্যে পণ্যের মূল্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মজলিসেই নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া بیع سلم সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত। অবশ্য ইমাম মালিক রহ.-এর মতে পণ্যের মূল্য গ্রহণ করা দুই অথবা তিনদিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো মূল চুক্তির মধ্যে পণ্যের মূল্য বিলম্বিত করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। এজন্য যদি মূল চুক্তির মধ্যেই পণ্যের মূল্য বিলম্বিত করার শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে এই চুক্তি কারও মতেই সঠিক হবে না।

কিন্তু ফিউচার মার্কেট বা ভবিষ্যৎ বাজারের লেনদেনে মূল চুক্তির মধ্যেই পণ্যের মূল্য বিলম্বিত করার শর্ত আরোপ করা হয়। এজন্য চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর কারও মতেই এ লেনদেন চুক্তি সঠিক নয়। অবশ্য এ লেনদেনের ব্যাপারে কেউ এটি বলতে পারে যে, এর মধ্যে পণ্য-মূল্যের একটি অংশ চুক্তির সময়ই বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেবল এতটুকু বিষয় এ চুক্তিটি সঠিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

- প্রথমত, এ কারণে যে, পণ্য-মূল্যের অংশ বিশেষ বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া এই লেনদেন চুক্তিটি সঠিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং চুক্তি সম্পাদন করার সময়ই পণ্যের পুরো মূল্য আদায় করে দেওয়া জরুরি।
- দ্বিতীয়ত, ফিউচার মার্কেটের ব্যবস্থাপকদের কাছে যে টাকা-পয়সা সঞ্চিত রাখা হয় তা পণ্যমূল্যের অংশ হয় না। অনুরূপভাবে তা বিক্রেতাকেও দেওয়া হয় না। এই টাকা আমানত হিসেবে তৃতীয় পক্ষের কাছে এ উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখা হয় যে, এই টাকা ক্রেতার পক্ষ থেকে এই চুক্তি সম্পাদন করার জন্য জামিন ও ক্ষতিপূরক হয়ে থাকে।

দুই. দ্বিতীয় কারণ হলো ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে লেনদেনের মধ্যে চুক্তির সময় মূল্য বিক্রেতাকে দেওয়া হয় না, বরং মূল্য ক্রেতার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকে। যেমনিভাবে পণ্য বিক্রেতার দায়িত্বে ঋণ থাকে। এই অবস্থায় এটি 'بيع الكالى بالكالى' বা ঋণ দ্বারা ঋণের বিক্রয় হয়ে যায় যা হাদিসের আলোকে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। হাকেম ও বায়হাকি রহ. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন—

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالى بالكالى.

'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ দ্বারা ঋণের বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[১৯৩]

কেউ এটি বলতে পারে মার্কেটের ব্যবস্থাপনা পরিষদ পণ্যমূল্য আদায় করার যে গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে এই গ্যারান্টির কারণে যেন একরকম পণ্যের

---

[১৯৩] সুনানে বায়হাকি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৮৬।

মূল্য বিক্রেতাকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা, বায়ে সালাম সহিহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো চুক্তির মজলিসেই সরাসরি পণ্যের মূল্য আদায় করা। তৃতীয় কোনো পক্ষের তরফ থেকেও এই মূল্য আদায় করার জন্য প্রত্যয়ন ও জামানত যথেষ্ট নয়। কেননা, তৃতীয় কোনো পক্ষের গ্যারান্টি এই মূল্যকে ঋণ হওয়া থেকে বের করতে পারে না। এ কারণে তা ঋণের বিনিময়ে ঋণের মতো হয়ে যাবে, যা নাজায়েজ।

তিন. 'বায়ে সালাম' সহিহ্ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত থাকার ওপর সকল ফকিহ্ ঐকমত্য পোষণ করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি শর্ত হলো বিক্রয়ের সময় পণ্যের সকল গুণ পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হবে। এজন্য পণ্যের গুণাবলি যদি অজ্ঞাত ও সংশয়পূর্ণ হয়—যা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হতে পারে—তাহলে এ অবস্থায় কারও মতেই এই বিক্রয়টি সহিহ্ নয়।

ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেনে যদিও পণ্যের বিভিন্ন স্তর সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করে তার সমুদয় গুণাবলি স্পষ্ট করা জরুরি, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এমন হয় যে, কতক সময় বিক্রেতা একই চুক্তির মধ্যে একাধিক স্তর বর্ণনা করে দেয়। এরপর বিক্রেতার এই অধিকারও থাকে যে, এসব স্তরের মধ্য থেকে যে-কোনো স্তরের পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করতে পারে। যেমন : 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায়' আছে—

Futures markets, on the other hand generally permit trading in a number of grades of the commodity to protect hedger sellers from being cornrd by speculators buvers who might othre msist on delivery of a particular grade whose stocks are small. Sincea number suitable for the acquisition of the physical commodity. For this reason physical deliveryof the commodities in fulfilment of the futures contract generally does not take place, and thee contract is usually settled between boyers and sellers by paying the fifference between the buying and selling price.

'অন্যদিকে ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার এই অবকাশ রাখে যে, তাতে বিভিন্ন শ্রেণি ও গ্রেডের বস্তুর ব্যবসা করা হবে। আর এভাবে যে আশাবাদী

ব্যবসায়ী লোকসান থেকে বাঁচতে চায়, তার এই ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয় যে, মুনাফা প্রত্যাশী ক্রেতা তার কাছ থেকে এমন কোনো গ্রেডের বস্তু আদায় করার ওপর পীড়াপীড়ি করতে পারে না যার মজুদ অল্প হয়। ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে বিভিন্নধর্মী গ্রেড পেশ করার অবকাশ থাকে এজন্য ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার বিশেষ কোনো পণ্য হাসিল করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয়। এ কারণেই ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি পূরণ করার জন্য সাধারণত বস্তুর প্রকৃত আদান-প্রদান হয় না। বরং ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে চুক্তিটি সাধারণত এভাবে শেষ হয় যে, তারা পরস্পরে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য সামনে রেখে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেন।

'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা'-এর উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ চুক্তিতে বিক্রেতার জন্য এই অধিকার থাকে যে, চুক্তির সময় পণ্যের বিভিন্ন প্রকারের যে গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো এক গুণের পণ্য সে প্রদান করবে। ক্রেতা পণ্যের গুণ সম্পর্কে ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পণ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে না নেয়। পণ্যের মধ্যে এ প্রকারের অজ্ঞতা প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। অতএব, 'বায়ে সালাম'ও এ জাতীয় অজ্ঞতার কারণে যে বাতিল হয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চার. চতুর্থ কারণ হলো ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে এ বিষয়টি মীমাংসিত যে, সাধারণত ক্রেতা কর্তৃক পণ্যের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না। বরং সর্বশেষ ক্রেতার এ বিষয়ের অধিকার থাকে যে, যদি সে চায় তাহলে বিক্রেতা থেকে পণ্য হস্তান্তর করার আবেদন করতে পারে। আবার সে চাইলে দ্বিতীয়বার এই পণ্যই বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে দিতে পারে। এই দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে লেনদেন এভাবে শেষ হয় যে, ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে তফাত সৃষ্টি হয় সেই তফাতমূল্যের লেনদেন করে চুক্তি নিষ্পত্তি করা হয়। আর এ বিষয়টি চুক্তির শুরুতেই শর্তযুক্ত থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই শর্ত 'বায়ে সালাম'-এর চুক্তিকে ফাসেদ করে দেয়। আর 'বায়ে সালাম' চুক্তির মধ্যে যদি এই শর্ত নাও থাকে, তাহলেও 'বায়ে সালাম'-এর মধ্যে এই মাসআলা রয়েছে যে, বিক্রেতার কাছেই পণ্যটি বিক্রয় করা জায়েজ নেই। ইবনু কুদামা রচিত 'আলমুগনি' গ্রন্থে আছে—

وَبَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ بَائِعِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، قَبْلَ قَبْضِهِ، فَاسِدٌ.

'بيع سلم-এর মধ্যে পণ্য নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই বিক্রেতা কিংবা অন্য কারও কাছে তা বিক্রয় করে দেওয়া জায়েজ নয়।'[১৯৪]

পাঁচ. যদি আমরা এটি মেনে নিই যে, প্রথম বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সর্বপ্রথম যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিলো তা আপন শর্তাবলির ভিত্তিতে 'বায়ে সালাম' ছিলো, তাহলে এ অবস্থায়ও প্রথম ক্রেতার জন্য এটি জায়েজ ছিলো না যে, সে চুক্তিকৃত পণ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার আগেই অন্যের কাছে তা বিক্রয় করে দেবে। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. লেখেন—

أَمَّا بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَا نَعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ خِلَافًا، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ» ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. وَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، كَالطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

'بيع سلم-এর পণ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার আগে তা বিক্রয় করা হারাম হওয়ার মধ্যে কোনো ধরনের মতভেদ নেই। আর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো খাবারে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং এমন বস্তুর মুনাফা গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছেন যা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে নেই। তাছাড়া 'বায়ে সালামে'র পণ্যে ক্রেতার নিয়ন্ত্রণও নেই। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মতো তাতেও হস্তগত করার আগে বিক্রয় করা কোনো ক্রমেই জায়েজ হবে না।'[১৯৫]

ইতোপূর্বে আমরা ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের কর্মপন্থার আলোচনায় এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যে, এর মধ্যে পণ্য গ্রহণ ও হস্তান্তর করার আগেই একই চুক্তির মধ্যে অগণিত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। অতএব, ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি জায়েজ হওয়ার কোনো পথ নেই।

উল্লিখিত পাঁচটি কারণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায়ে সালাম' অভিহিত করে একে জায়েজ বলার কোনো সুযোগ নেই।

---

[১৯৪] আলমুগনি, খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ৩৪১।

[১৯৫] আলমুগনি, খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ৩৪১।

যখন ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তিকে 'বায়ে সালাম' অভিহিত করা সম্ভব নয়। কেননা, এটি এমন এক চুক্তি যা ভবিষ্যতের কোনো তারিখের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আর সকল ফকিহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, বিক্রয়চুক্তি ভবিষ্যতের কোনো তারিখের সাথে সম্পৃক্ত করে ঝুলিয়ে রাখা জায়েজ নেই। এজন্য ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে প্রথম বিক্রয় যা প্রথম ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে হয়েছিলো তা সঠিক নয়। সুতরাং পরবর্তী সময়ে যে বিক্রয়গুলো প্রথম বিক্রয়ের ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো কীভাবে জায়েজ কিংবা সঠিক হতে পারে?

ফিকহি দৃষ্টিকোণে এ চুক্তিটির আরেকটি ধরন এমন হতে পারে যে, এই চুক্তিকে বিক্রয় বলা হবে না, বরং বিক্রয়ের অঙ্গীকার বলা হবে। এখানে বিক্রেতা যেন এই অঙ্গীকার করছে যে, সে অমুক বিশেষ পণ্য অমুক তারিখে এতটাকা মূল্যে বিক্রয় করবে। এর ফলে ক্রেতার এই অধিকার অর্জিত হবে যে, সে অঙ্গীকার অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে পণ্য ক্রয় করতে পারবে। এখন এই ক্রেতা তার এই অধিকার তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করতে পারবে আর তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করতে পারবে। আর এভাবেই চলতে থাকবে পণ্য হস্তান্তরের নির্ধারিত তারিখ আসা পর্যন্ত।

কিন্তু আমার ধারণায় এ ধরনটি উক্ত চুক্তিটি জায়েজ হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ হতে পারে না। এর কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো—

এক. ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃত ধরনটি উল্লিখিত ধরনের অনুকূল নয়। কেননা, চুক্তিকারী ক্রেতা ও বিক্রেতা ফিউচার মার্কেটে কেবল এজন্য যায় না যে, তারা ক্রয় ও বিক্রয় করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে। বরং চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য আবশ্যকীয়ভাবে এই হয় যে, তারা কার্যত বিক্রয়চুক্তিই সম্পাদন করবে। সুতরাং এই চুক্তিকে বিক্রয়ের অঙ্গীকার বলা কোনোক্রমেই সঠিক নয়।

দুই. অধিকাংশ ফিকহ্শাস্ত্রবিদের মতে অঙ্গীকার কেবল আইনগতভাবে অপরিহার্য হয় না। আর যেসব ফকিহ্ অঙ্গীকারকে আইনগতভাবে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন তারাও বিশেষ কোনো প্রয়োজনের নিরিখে অপরিহার্য বলেছেন। আর এখানে বিশেষ কোনো প্রয়োজন পাওয়া যায়নি।

তিন. ক্রেতার সঙ্গে বিক্রয় করার যে অঙ্গীকার করার কারণে তার যে অধিকার অর্জিত হয়েছে তা এমন কোনো অধিকার নয় যাকে বিক্রয় করা বা এর

বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা, এটি এমন কোনো অধিকার নয় যা আইনগতভাবে ওয়াজিব। বরং এটি একটি 'নিরেট অধিকার'। আর অধিকাংশ ফকিহের মতে 'নিরেট অধিকার'-এর বিক্রয় বেশ কিছু শর্তের ভিত্তিতে জায়েজ। আর সেসব শর্ত এই ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে নেই।

কোনো কোনো সময় বলা হয়ে থাকে, যদি ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি শরয়ি দৃষ্টিকোণে জায়েজ না হয়, তাহলে এর এমন কোনো বিকল্প পদ্ধতি বললে ভালো হয় যা শরয়ি দৃষ্টিকোণে জায়েজ এবং বৈধ হবে।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো কোনো লেনদেনের বিকল্প পদ্ধতি তখনই তালাশ করা হয় যখন সেই লেনদেনের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ঠিক থাকে। তাহলেই কেবল এর বিকল্প পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যায় যাতে এর মাধ্যমে বৈধ পন্থায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

আর ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যা পূরণ করার জন্য শরয়ি পদ্ধতি তালাশ করা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হলো ফিউচার মার্কেটে যেসব লেনদেন হয়ে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে মূলত বাণিজ্য উদ্দেশ্য হয় না, বরং মুনাফা লাভের আশায় নিজের টাকা বিনিয়োগ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এ উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে জুয়ার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেয়।

আমরা আগে বর্ণনা করে এসেছি যে, ফিউচার মার্কেটে লেনদেনকারী ব্যক্তি দুই ধরনের হয়ে থাকে :

এক. কোনো কোনো লোক এমন হয়ে থাকে যারা মুনাফা পাওয়ার আশায় নিজেদের টাকা বিনিয়োগ করে থাকে। পরিভাষায় এসব লোককে Speculator বলা হয়। এই লেনদেনের মাধ্যমে এসব লোকের উদ্দেশ্য ক্রয় কিংবা বিক্রয় করা নয়। পণ্য গ্রহণ কিংবা অর্পণও তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। বরং তাদের উদ্দেশ্য কেবল এই হয়ে থাকে যে, তারা ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা যেন তারা উসুল করতে পারে। অন্যভাষায় বলা যায় পরস্পরের মধ্যকার ডিফারেন্সকে সমান করে নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। স্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্যটিই এমন যা শরয়ি দৃষ্টিকোণে নাজায়েজ। কেননা, এ ক্ষেত্রে কার্যত ব্যবসা করা ও পণ্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া ছাড়াই মুনাফার অধিকারী হয়ে যায়। আর এটি শরয়ি বিধানের আলোকে হারাম।

দুই. আর কোনো কোনো ব্যক্তির এই চুক্তির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে যে চুক্তি এখন সম্পাদন করছে ভবিষ্যতে যাতে তার মুনাফা সংরক্ষণ করতে পারে এবং লোকসান থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। একে পরিভাষায় Helging (হেজিং) নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, এসব লোক মুক্তবাজারে বস্তু ক্রয় করে। কিন্তু দরের উত্থান-পতনের কারণে যে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয় তা থেকে বাঁচার জন্য ফিউচার মার্কেটে গিয়ে সেই বস্তুটি বিক্রয় করে দেয়। ইতোপূর্বে আমরা বিষয়টি বর্ণনা করে এসেছি। কিন্তু এ প্রকার জামানত ও হেফাজতের প্রয়োজন সেসব লোকের হয়ে থাকে যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য পণ্য গুদামজাত করে থাকে। কারণ তারা যদি কোনো বস্তু ক্রয় করার পরই তা বিক্রয় করে দিতো, তাহলে মুনাফার জামানতের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যখন এই ব্যক্তি কোনো বস্তু ক্রয় করার পর অধিক মুনাফা লাভ করার নিমিত্তে দীর্ঘ সময়ের জন্য মজুত করে রাখে তখন তার ফিউচার মার্কেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কেননা, এসব লোকের ভয় থাকে যে বস্তু ক্রয় করে আমরা গুদামজাত করছি কিছুদিন পর তার মূল্য কমে গিয়ে মুনাফা লাভ করার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই কি না? এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ফিউচার মার্কেটে গিয়ে সে এই পণ্য বিক্রয় করে থাকে। জনাব জেরাল্ড গোল্ড এ বিষয়ে লেখেন—

'যদি কোনো ব্যবসায়ী কোনো কৃষকের কাছ থেকে দশ হাজার বস্তা ভুট্টা ক্রয় করার পর তাৎক্ষণিকভাবেই নির্দিষ্ট কোনো দামে তাকে বিক্রয় করে দিতে চায়; যেমন এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করতে চায় তাহলে এমন ব্যবসায়ীর জন্য এ বিষয়ের প্রয়োজন পড়ে না যে, সে ফিউচার মার্কেটে গিয়ে মুনাফা লাভের গ্যারান্টির ব্যবস্থা করবে। কেননা, ভুট্টার মূল্য কমে যাওয়ার যে ঝুঁকি ছিলো সেই ঝুঁকি তা বিক্রয় করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।'

কিন্তু কতক সময় ব্যবসায়ী এই গম ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয় করতে চায় না। সে এই পণ্যকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজের কাছে গুদামজাত করে রাখতে চায়। কিন্তু তার এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে, বিক্রয় করার সময় এর মূল্য কমে যাবে; যার ফলে তার লোকসান হবে। তাই এই ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য সে ফিউচার মার্কেটে যায়। আর এর মাধ্যমে সে যে মুনাফা লাভ করার ইচ্ছা করেছিলো তাকে সংরক্ষণ করে নেয়।'

এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো, ফিউচার মার্কেটে প্রবেশ করে চুক্তি করার প্রয়োজন কেবল সেসব ব্যবসায়ীর হয়ে থাকে যারা পণ্যকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেদের কাছে আটকে রাখতে চায়। আর এসব ব্যবসায়ী সাধারণত গুদামজাত করার নিয়তে পণসামগ্রীকে নিজেদের কাছে আবদ্ধ করে রাখে যা শরয়ি বিধিবিধানের পরিপন্থি। যেহেতু ফিউচার মার্কেটে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যই শরিয়ত-বহির্ভূত তাই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না যে, ফিউচার মার্কেটের বিকল্প শরয়ি পদ্ধতি কী? অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তবিকভাবেই চায় যে, আমি এমন একটি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবো যার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করতে হবে না; তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য শরিয়ত অনুমোদিত লেনদেন 'বায়ে সালাম' রয়েছে। ফিকহের গ্রন্থসমূহে এই চুক্তির যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে সেগুলো অনুযায়ী সে 'বায়ে সালাম' চুক্তি সম্পাদন করে নেবে। যার ফলে এভাবে তাকে আর ফিউচার মার্কেটে প্রবেশ করতে হবে না। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) ইসলামি ফিকহ্ অ্যাকাডেমি জেদ্দার জন্য হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি প্রসঙ্গে আরবি ভাষায় الطرق المشروعة للتمويل العقاري (হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি) শিরোনামে একটি বিশদ প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছিলেন। তার প্রস্তুতকৃত প্রবন্ধটি 'بحوث في قضايا فقهية معاصرة' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

—আবদুল্লাহ মায়মান
ইসলামিক পাবলিশার্স

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি

হামদ ও সালাতের পর, বাসস্থান মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। ঘরবাড়ি ছাড়া মানুষের জন্য জীবন ধারণ করা মুশকিল এবং অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন—

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا.

'মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য ঘর-বাড়িকে অবস্থানের জায়গা করে দিয়েছেন।'[১৯৬]

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস[১৯৭] রা. বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَنْزِلُ الْوَاسِعُ، وَالْمَرْكَبُ.

'তিনটি বস্তুর মালিক হওয়া সৌভাগ্য লাভের কারণ। সতীসাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাসস্থান ও আরামদায়ক বাহন।'[১৯৮]

আজকের যুগে একটি উপযুক্ত ও প্রশস্ত বাসস্থান হাসিল করার জন্য বহু ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। বিশেষত, জনবহুল বসতিপূর্ণ শহরে তা লাভ করা আরও বেশি কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল। এর কারণ হলো আজকের জীবন বহু সঙ্কটময়

[১৯৬] সুরা নাহল, আয়াত : ৮০।

[১৯৭] উর্দু তরজমায় ভুলে আয়শা রা. লেখা হয়েছে।

[১৯৮] মুসনাদে বাজ্জার।

হয়ে পড়েছে। জনবসতিতে ধারাবাহিকভাবে পরিবৃদ্ধি ঘটছে এবং বাসস্থানের মূল্যবৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে। আর নিজের জন্য নতুন বাড়ি ক্রয় করা বা নির্মাণ করার ক্ষমতা রাখে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম।

এসব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আজকের যুগে বড়ো বড়ো বহু শহরে 'হাউস ফাইন্যান্সিং'-এর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান লোকদের জন্য বাসস্থান ক্রয় করা বা নির্মাণ করার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই সুদি ব্যবস্থাপনায় কাজ করে। এসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ক্রেতাদেরকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এরপর সেই ঋণ থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করে, যে হারের ওপর উভয় পক্ষ চুক্তি করার সময় ঐকমত্য পোষণ করে।

যেহেতু এ লেনদেনটি সুদি বুনিয়াদের ওপর করা হয়; আর সুদি লেনদেন ইসলামি শরিয়তে এমন মারাত্মক পর্যায়ের হারামের অন্তর্ভুক্ত যাকে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নিষেধ করেছেন। এজন্য কোনো মুসলিমের জন্য সংগত নয় এমন কোনো চুক্তি করা যা সুদি লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এজন্য আলেমগণের ওপর অবশ্য কর্তব্য হলো তারা লোকদেরকে হাউস ফাইন্যান্সিং-এর এমন কোনো সহজ ও শরিয়ত অনুমোদিত পন্থা বাতলে দেবেন, যা শরিয়তের নিরিখে বৈধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদি লেনদেনের বিকল্প বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে হাউস ফাইন্যান্সিং-এর কয়েকটি শরিয়ত অনুমোদিত পন্থা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো জায়েজ হওয়ার দলিল-প্রমাণও পেশ করবো। এরপর এসব পদ্ধতির ওপর আমল করার পরিণাম এবং ফলাফলও তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

আসল বিষয় হলো ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, সে জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো মুনাফার প্রত্যাশা না করে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে দেবে এবং সমুদয় মূল প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থা করবে। যেহেতু বাসস্থান প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত তাই প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার আর্থিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যের আওতায় থেকে নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আর্থিক সঙ্গতি কম থাকার কারণে বাসস্থান ক্রয় কিংবা নির্মাণ করতে সক্ষম নয় তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নিম্নোক্ত তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে তার এই মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা।

১. ওই ব্যক্তি যদি জাকাত গ্রহণ করার হকদার হয়, তাহলে জাকাত ফান্ডের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করে তার প্রয়োজন পূরণ করবে।

২. কেবল বাস্তবিক খরচ ও ব্যয়ের ভিত্তিতে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে এবং এর ওপর কোনো মুনাফা প্রত্যাশা করবে না।

৩. রাষ্ট্র তাকে সুদবিহীণ ঋণ ও করজে হাসান প্রদান করবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র তাকে এমন ঋণ প্রদান করবে যার ফলে সে সুদ ও মুনাফা কামনা করবে না।

হাউস ফাইন্যান্সিং-এর এই তিন পদ্ধতিই মূল—যেগুলো ইসলামের প্রাণ ও মুসলিম সমাজের মেজাজের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, ইসলামি সমাজব্যবস্থা একে অপরের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং নেক ও কল্যাণকর কাজে একে অপরকে সাহায্য করার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় অন্যের কষ্ট-ক্লেশকে নিজের কষ্ট-ক্লেশ এবং অপরের শান্তিকে নিজের শান্তি বলে মনে করা হয়। ইসলামে দুর্বলকে সাহায্য করা হয় যাতে সেও একজন মধ্যম স্তরের ব্যক্তির মতো সুখ-শান্তির জীবন যাপন করতে পারে।

কিন্তু সমস্যা এই যে, উল্লিখিত তিন পদ্ধতির মধ্য থেকে কোনো এক পদ্ধতির ওপর আমল করা এমন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব যার কাছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কেননা, এই তিনটি পদ্ধতির কোনো একটি বাস্তবায়ন করার জন্য অঢেল সম্পদের প্রয়োজন। বিশেষত, আমাদের এই যুগে যেখানে জনবসতি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং জায়গা-জমির দামও আকাশচুম্বি হয়ে গেছে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্র নিজের অনুন্নয়নশীল প্রকল্পসমূহের ব্যয়ে হ্রাস ঘটিয়ে এখান থেকে আয় হওয়া অর্থ হাউস ফাইন্যান্সিং-এ ব্যবহার করতে পারে। এমনিভাবে সেসব ব্যয়বহুল প্রকল্পে হ্রাস ঘটিয়েও হাউস ফাইন্যান্সিং-এর উপায়-উপকরণ বাড়াতে পারে যেগুলোর উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে কেবল লৌকিকতা, আড়ম্বর ও প্রদর্শনী। কিন্তু এসব ব্যয়ে হ্রাস ঘটানোর পরও বহু মুসলিম দেশ এমন রয়েছে যারা এভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য রাখে না।

তাই এসব অবস্থায় এমন উপায় ও কর্মপন্থা অবলম্বন করা জরুরি যার মধ্যে রাষ্ট্রকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কেবল অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয় না এবং ব্যয়ের ভারি বোঝাও বহন করতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তা সুদ এবং

অন্যান্য শরিয়ত অননুমোদিত বিষয় থেকেও পবিত্র থাকে। এমন উপায় ও কর্মপন্থাগুলো নিম্নরূপ—

بيع مؤجل বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়

প্রথম পদ্ধতি হলো, পুঁজি বিনিয়োগকারী কোম্পানি বাসস্থান ক্রয় করে এর মালিক হয়ে যাওয়ার পর, একে কিছু মুনাফা সহকারে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে দেবে এবং পরবর্তী সময়ে কোম্পানি গ্রাহকের কাছ থেকে চুক্তির সময় ধার্যকৃত কিস্তির মাধ্যমে এর মূল্য উসুল করে নেবে। এই চুক্তির মধ্যে মুনাফার হার বর্ণনা করা ছাড়াই বাকিতে লেনদেন-চুক্তি সম্পাদন করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারণের অধিকার একমাত্র বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে।। আর এটিও সম্ভব যে, বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন চুক্তি মুরাবাহা পদ্ধতিতে করা হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তির মধ্যেই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, কোম্পানি এই বাসস্থানের নির্মাণ ব্যয়ের প্রকৃত অর্থের চেয়ে এত পরিমাণ মুনাফা গ্রাহকের কাছ থেকে উসুল করবে।

এরপর উল্লিখিত পদ্ধতিটির বেশ কয়েকটি ধরন হতে পারে—

১. যদি চুক্তি করার সময় ওই বাসস্থান প্রস্তুত অবস্থায় থাকে, তাহলে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী কোম্পানি ওই স্থান খরিদ করে নিয়ে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে দেবে।

২. যদি চুক্তি করার সময় ওই বাসস্থান না থাকে এবং কোম্পানি বাসস্থান তৈরি করতে চায়, তাহলে এ অবস্থায় কোম্পানি ওই গ্রাহককেই বাসস্থান নির্মাণ করার জন্য নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে। এ অবস্থায় নির্মাণ কাজ কোম্পানির মালিকানায়ই হবে; তবে গ্রাহক কেবল কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করবে। এরপর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কোম্পানি ওই বাসস্থানকে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে দেবে।

৩. আমরা যে পদ্ধতি বর্ণনা করলাম তা ওই অবস্থায় যখন গ্রাহক বাসস্থান ক্রয় কিংবা নির্মাণ করার মধ্যে অর্থ দিয়ে সামান্য পরিমাণ অংশগ্রহণ করারও সামর্থ্য রাখে না।

৪. অবশ্য গ্রাহকের যদি বাসস্থান ক্রয় কিংবা নির্মাণ কাজের ব্যয়ের মধ্যে নগদ অর্থ দিয়ে অংশগ্রহণ করার সামর্থ্য থাকে কিন্তু তার কাছে এত পরিমাণ টাকা নেই যে, সে এই টাকার মাধ্যমে বাসস্থান ক্রয় ও নির্মাণ করার সকল ব্যয় পূরণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে গ্রাহক বাসস্থান ক্রয় ও নির্মাণ কাজে তার টাকা ব্যয় করার পর অতিরিক্ত যে টাকার প্রয়োজন পড়ে কেবল সেই পরিমাণ টাকা কোম্পানির কাছ থেকে গ্রহণ করবে। আজ বর্তমান সময়ের হাউস ফাইন্যান্সিং-এর মধ্যে এ পদ্ধতিই অধিক প্রচলিত। এর ব্যবহারিক পদ্ধতি এই যে, কোম্পানি এবং গ্রাহক উভয়ে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাসস্থান ক্রয় করবে। যেমন একটি বাসস্থানের অর্ধেক মূল্য গ্রাহক পরিশোধ করবে এবং অর্ধেক মূল্য কোম্পানি আদায় করবে। এরপর এই বাসস্থান অর্ধেক অর্ধেক করে কোম্পানি ও গ্রাহকের মালিকানায় থাকবে। এখন কোম্পানি তার অর্ধেক অংশ ক্রয়মূল্যের চেয়ে কিছু বেশি দামে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে দেবে এবং কিস্তির মাধ্যমে তার থেকে মূল্য উসুল করে নেবে।

৫. যদি কোনো গ্রাহক প্রথমে খালি জমি ক্রয় করে তাতে বাসস্থান নির্মাণ করতে চায় এবং তার কাছে কিছু নগদ টাকা থাকে, তাহলে এ অবস্থায় জমি ক্রয় করার পরিধি পর্যন্ত ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হবে যা আমরা বাসস্থান ক্রয় করার ব্যাপারে আলোচনা করেছি। আর তা হলো গ্রাহক এবং ক্রেতা উভয়ে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে জমি ক্রয় করে নেবে; এরপর কোম্পানি নিজের অংশকে ক্রয়মূল্যের চেয়ে কিছু বেশিতে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে দেবে।

৬. আর জমি যদি আগে থেকেই গ্রাহকের মালিকানায় থাকে অথবা উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে জমিন তার মালিকানায় আসে, এরপর গ্রাহক এই জমিনের মধ্যে হাউস ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে বাসস্থান নির্মাণ করতে চায় (এবং গ্রাহকের কাছে কিছু নগদ টাকা থাকে) তাহলে এ অবস্থায় এটি সম্ভব যে, কোম্পানি এবং গ্রাহক উভয়ে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করবে। যেমন : নির্মাণ ব্যয়ের অর্ধেক গ্রাহক বহন করবে এবং অর্ধেক কোম্পানি বহন করবে। এর ফলে নির্মাণকৃত এই বাসস্থানের মালিক কোম্পানি ও গ্রাহক অর্ধাধী হারে হবে। অতএব, যখন নির্মাণ পূর্ণ হয়ে যাবে তখন কোম্পানি তার অংশটুকু নির্মাণমূল্যের চেয়ে কিছু বেশি মূল্যে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে দেবে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে

যৌথ মালিকানা বস্তুর এক অংশীদারের জন্য আপন অংশ অন্য অংশীদারের কাছে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। অবশ্য অংশীদার নয় এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. রদ্দুল মুহতারে লেখেন—

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ وَلِشَرِيكِهِ جَازَ.

'যৌথ মালিকানা বিশিষ্ট কোনো বিল্ডিংয়ের দুই শরিকের মধ্য থেকে কোনো এক শরিক যদি তার নিজের অংশ তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। তবে অপর শরিকের কাছে বিক্রয় করলে জায়েজ হবে।'

উল্লিখিত পদ্ধতির মধ্যে মূল্য আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে কোম্পানির জন্য জায়েজ আছে যে, সে গ্রাহকের কাছ থেকে বন্ধক চাইবে। কোম্পানির জন্য এটিও জায়েজ আছে যে, সে বাসস্থানের কাগজপত্র নিজের কাছে বন্ধক হিসেবে সংরক্ষণ করবে।

উল্লিখিত পদ্ধতি শরয়ি দৃষ্টিতে শতভাগ ত্রুটিমুক্ত। অবশ্য কোম্পানি এ প্রকারের লেনদেন ওই সময় পর্যন্ত করে না যে পর্যন্ত তার এ বিষয়ে পূর্ণ আস্থা না হয় যে, যে বাসস্থান কোম্পানি ক্রয় করছে বা যে বাড়ি কোম্পানি নির্মাণ করছে গ্রাহক বা ক্রেতা এ বাসস্থান অবশ্যই ক্রয় করবে। কেননা, কোম্পানি যদি নিজের প্রচুর টাকা খরচ করে এই বাসস্থান ক্রয় করে এবং পরবর্তী সময়ে গ্রাহক এ বাসস্থান ক্রয় করতে অস্বীকার করে বসে, তাহলে এ অবস্থায় কেবল কোম্পানির লোকসানই হবে না, বরং পুরো ব্যবস্থাপনাই উলট-পালট হয়ে যাবে।

আর ভবিষ্যতের কোনো তারিখের দিকে সম্পৃক্ত করে ক্রয়-বিক্রয় করা যেহেতু জায়েজ নেই তাই উল্লিখিত পদ্ধতিকে সঠিক বানানোর জন্য সহিহ পন্থা এই হবে যে, ক্রেতা বা গ্রাহক এ বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে, সে এই বাসস্থান ও জমি অবশ্যই ক্রয় করবে।

গ্রাহকের পক্ষ থেকে কোম্পানির অংশকে ক্রয় করার নিশ্চয়তা দেওয়া একটি অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখে। আর অধিকাংশ ফকিহের মতে অঙ্গীকার পূরণ করা আইনগতভাবে অপরিহার্য নয়। কিন্তু ফকিহগণের একটি বড়ো অংশ এমনও রয়েছেন যারা এ জাতীয় অঙ্গীকার পূরণ করাকে ধর্ম ও আইনগত উভয় দৃষ্টিকোণে অপরিহার্য মনে করেন। ইমাম মালিক রহ.-এর প্রসিদ্ধ অভিমত এটিই। তিনি

অঙ্গীকার পূরণ করাকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেন। বিশেষত, ওই সময় যখন অঙ্গীকারের কারণে অঙ্গীকার প্রদানকৃত ব্যক্তিকে আর্থিক খরচের সম্মুখীন হতে হয়। শায়খ মুহাম্মাদ উলাইশ রহ. এ প্রসঙ্গে লেখেন—

فَالْوَفَاءُ بِالْعِدَةِ مَطْلُوبٌ بِلَا خِلَافٍ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ حَكَاهَا ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ جَامِعِ الْبُيُوعِ وَفِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ وَفِي كِتَابِ الْعِدَةِ وَنَقَلَهَا عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَقِيلَ يُقْضَى بِهَا مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا يُقْضَى بِهَا مُطْلَقًا وَقِيلَ يُقْضَى بِهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى سَبَبٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْمَوْعُودُ بِسَبَبِ الْعِدَةِ فِي شَيْءٍ كَقَوْلِكَ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ..... فَأَسْلِفْنِي كَذَا وَالرَّابِعُ يُقْضَى بِهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى سَبَبٍ.... وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ بِسَبَبِ الْعِدَةِ فِي شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْأَقْوَالِ.

'অঙ্গীকার পূরণ করা কোনোরূপ মতভেদ ছাড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে আইনগতভাবে এই অঙ্গীকার পুরা করা ওয়াজিব কি না এ ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। ইবনু রুশদ রহ. সেগুলোকে কিতাবু জামিইল বুয়ূ, কিতাবুল আরিয়াহ, ও কিতাবুল ইদাহ-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তার সূত্রে অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

১. বলা হয়েছে, এ অঙ্গীকার অনুযায়ী নিঃশর্তভাবেই ফায়সালা করা হবে।

২. অন্য একটি অভিমতে বলা হয়েছে, এই অঙ্গীকার অনুযায়ী আইনগতভাবে ফায়সালা করা হবে না।

৩. আরেক অভিমত হলো এ অঙ্গীকার অনুযায়ী আইনগতভাবে ফায়সালা করা হবে যদি অঙ্গীকারটি কোনো কারণের ওপর ভিত্তিশীল হয়; যদিও যার জন্য অঙ্গীকার করা হয়েছে সে এই অঙ্গীকারের কারণে কোনো কাজের মধ্যে প্রবেশ না করে থাকে। যেমন : তুমি বললে 'আমি বিয়ে করতে চাই', অতএব, আপনি আমাকে ঋণ প্রদান করুন।

৪. আর চতুর্থ অভিমত হলো এই অঙ্গীকার অনুযায়ী আইনগতভাবে ফায়সালা দেওয়া হবে যদি তা কোনো কারণের ওপর ভিত্তিশীল হয় এবং অঙ্গীকারের কারণে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর্মে প্রবেশ করে। অভিমতসমূহের মধ্যে এটি (চার নম্বরটি) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত।'[১৯৯]

---

[১৯৯] ফাতহুল আলিয়িল মালিক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫২।

ইমাম কারাফি রহ. লেখেন—

وَأَمَّا سَحْنُونٌ فَقَالَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْوَعْدِ قَوْلُهُ اهْدِمْ دَارَكَ، وَأَنَا أُسْلِفُكَ مَا يُبْنَى بِهِ أَوْ اُخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنَا أُسَلِّفُكَ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةً أَوْ تَزَوَّجْ امْرَأَةً، وَأَنَا أُسْلِفُكَ لِأَنَّكَ أَدْخَلْته بِوَعْدِك فِي ذَلِكَ أَمَّا مُجَرَّدُ الْوَعْدِ فَلَا يَلْزَمُكَ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ الْوَفَاءُ بِهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

'ইমাম সাহনুন রহ. বলেন—যে অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব তা হলো তুমি কাউকে বললে, তুমি তোমার ঘর ভেঙে ফেলো আমি তোমাকে এমন ঋণ প্রদান করবো যার মাধ্যমে তুমি গৃহ নির্মাণ করতে পারবে। অথবা তুমি হজে যাও, আমি তোমাকে ঋণ প্রদান করবো যার মাধ্যমে তুমি হজে যেতে পারবে। অথবা তুমি পণ্য ক্রয় করো কিংবা বিয়ে করো আমি তোমাকে ঋণ প্রদান করবো। কেননা, তুমি তোমার অঙ্গীকারের মাধ্যমে তাকে এই কাজে প্রবেশ করালে। আর যদি নিরেট অঙ্গীকার করা হয়, তাহলে পূরণ করা অপরিহার্য নয়। অবশ্য তা পূরণ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।'[২০০]

আর আল্লামা ইবনুশ শাত রহ. আল ফুরুক গ্রন্থের টীকায় লেখেন—

الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا فتعين تأويل ما يناقض ذلك.

'আমার মতে নিঃশর্তভাবে অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য বলাই অগ্রগণ্য। অতএব, এ মূলনীতির বিপরীত যা হবে তার ব্যাখ্যা করা হবে।'[২০১]

এমনিভাবে পরবর্তীযুগের হানাফি ফকিহগণও অঙ্গীকার পূরণ করাকে আইনগতভাবে অপরিহার্য বলেছেন। যেমন : অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির بيع بالوفاء মাসআলায় আল্লামা কাজিখান রহ. লেখেন—

وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة لحاجة الناس.

'যদি প্রথমে বিনাশর্তে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির উল্লেখ করে এরপর অঙ্গীকারের ভিত্তিতে শর্ত উল্লেখ করে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং সাথে সাথে

[২০০] আল ফুরুক, কারাফি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫।

[২০১] হাশিয়াতুল ফুরুক, ইবনু শাত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৪, ২৫।

অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবে। কেননা, অঙ্গীকার পূরণ করা কখনো কখনো মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।'[২০২]

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. লেখেন—

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا: لَوْ ذَكَرَا الْبَيْعَ بِلَا شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَا الشَّرْطَ عَلَى وَجْهِ الْوَعْدِ جَازَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ، إِذِ الْمَوَاعِيدُ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ لَازِمًا لِحَاجَةِ النَّاسِ ..

'জামিউল ফুসুলাইন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা কোনোরূপ শর্ত আরোপ করা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির উল্লেখ করে এরপর অঙ্গীকারের ভিত্তিতে শর্ত উল্লেখ করে, তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি জায়েজ হবে এবং অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবে। কেননা, অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করা অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ অঙ্গীকারকেও মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে অপরিহার্য জ্ঞান করা হবে।'[২০৩]

উল্লিখিত ফিকহি উদ্ধৃতিসমূহের নিরিখে এ জাতীয় অঙ্গীকার পূরণ করা আইনগতভাবে জরুরি সাব্যস্ত করা জায়েজ আছে। এজন্য আলোচ্য মাসআলায় যে এগ্রিমেন্টের ওপর ক্রেতা ও বিক্রেতার দস্তখত সম্পন্ন হবে সেই এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী জমি বা বিল্ডিং-এর যে অংশ কোম্পানির মালিকানাধীন রয়েছে তা ক্রয় করার যে অঙ্গীকার গ্রাহক করেছে তা পূরণ করা আইনগতভাবেও জরুরি এবং ধর্মগতভাবেও জরুরি।

অবশ্য এটি জরুরি যে, কোম্পানির অংশের বিক্রয় ওই সময় সম্পন্ন হবে যখন সেই কোম্পানি আপন অংশের মালিক হয়ে যাবে। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তিকে ভবিষ্যৎ সময়ের দিকে সম্পৃক্ত করা জায়েজ নয়। এজন্য যখন কোম্পানি আপন অংশের মালিক হয়ে যাবে তখন সে স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে গ্রাহকের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন করবে।

شركت متناقصة বা ক্রম হ্রাসমান শরিকানা লেনদেন

হাউস ফাইন্যান্সিং-এর দ্বিতীয় পদ্ধতি شركت متناقصة তথা ক্রম-হ্রাসমান

[২০২] ফাতাওয়া খানিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৮।

[২০৩] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

শরিকানা লেনদেনের ওপর ভিত্তিশীল। এটি নিম্নোক্ত বিষয়াবলির সমন্বয়ে সম্পন্ন হবে।

১. সর্বপ্রথম গ্রাহক এবং কোম্পানি যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে বাসস্থান ক্রয় করবে। এই ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর বাসস্থানটি গ্রাহক ও কোম্পানির যৌথ মালিকানাধীন থাকবে। আর উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই বিল্ডিং ক্রয়ে যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে অংশগ্রহণ করেছে সেই পরিমাণ টাকার হার অনুযায়ী এই বিল্ডিং-এর মালিক সাব্যস্ত হবে। অতএব, উভয় পক্ষই যদি বিল্ডিং ক্রয়ে অর্ধেক অর্ধেক হারে টাকা প্রদান করে থাকে, তাহলে এই বাসস্থান তাদের উভয়ের মাঝে আধাআধিভাবে যৌথ মালিকানাধীন হবে। যদি তাদের এক পক্ষ একতৃতীয়াংশ টাকা প্রদান করে এবং অপর পক্ষ দুই তৃতীয়াংশ টাকা প্রদান করে, তাহলে উক্ত বাসস্থান এই হারেই উভয় পক্ষের যৌথ মালিকানাধীন হবে।

২. এরপর কোম্পানি মাসিক কিংবা বার্ষিক ভাড়া নির্ধারণ করে নিজের অংশ গ্রাহকের কাছে ভাড়ার ভিত্তিতে প্রদান করবে।

৩. এরপর এই বাসস্থানে কোম্পানির যতটুকু অংশ থাকবে তাকে নির্ধারিত কতিপয় অংশে বিভক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একে দশভাগে বিভক্ত করা হবে।

৪. এরপর উভয়পক্ষ পরস্পরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করবে। যেমন : ছয় মাস বা এক বছর। অতঃপর গ্রাহক বা ক্রেতা এই নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানির পূর্ণ মালিকানার এক অংশকে তার মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নেবে। যেমন : এই বাসস্থানের মধ্যে কোম্পানির যে অংশ রয়েছে তার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। এরপর যখন কোম্পানির অংশকে দশভাগে বিভক্ত করা হবে তখন প্রতি অংশের মূল্য হবে বিশ হাজার টাকা। সে ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর কোম্পানিকে বিশ হাজার টাকা প্রদান করে এক একটি অংশের মালিক হতে থাকবে।

৫. গ্রাহক কোম্পানির যতটুকু অংশ ক্রয় করবে সেই হিসাব অনুপাতে তার মালিকানায় বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে এবং কোম্পানির মালিকানা হ্রাস পেতে থাকবে।

৬. যেহেতু গ্রাহক কোম্পানির অংশকে ভাড়ায় নিয়েছিলো তাই যে পরিমাণ

অংশ সে ক্রয় করতে থাকবে সেই পরিমাণ অংশের ভাড়াও ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে। যেমন : কোম্পানির অংশের ভাড়া যদি এক হাজার টাকা ধার্য করা হয়ে থাকে, তাহলে গ্রাহক যে পরিমাণ অংশ ক্রয় করবে প্রতিটি অংশ ক্রয় করার পর একশো টাকা করে ভাড়াও হ্রাস পেতে থাকবে। এজন্য এক অংশ ক্রয় করার পর কোম্পানিকে প্রদেয় ভাড়া নয়শত টাকা হয়ে যাবে তদ্রূপ দুই অংশ ক্রয় করার পর কোম্পানিকে প্রদেয় ভাড়া আট শত টাকা হয়ে যাবে।

৭. এমনকি যখন গ্রাহক কোম্পানির দশ অংশই ক্রয় করে নেবে তখন সে পুরো বিল্ডিং-এর মালিক হয়ে যাবে। আর এভাবে এই অংশীদারত্ব ও ইজারাদারির লেনদেন চুক্তিটি একই সময়ে তার শেষসীমায় পৌঁছে যাবে।

মোটকথা, হাউস ফাইন্যান্সিং-এর উল্লিখিত পদ্ধতি নিম্নোক্ত তিনটি লেনদেন চুক্তির সমন্বয়ে ঘটিত—

১. কোম্পানি ও ক্রেতার মাঝে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

২. কোম্পানির অংশকে গ্রাহক কর্তৃক ভাড়ায় গ্রহণ করা।

৩. কোম্পানির অংশকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে গ্রাহকের কাছে এক-এক অংশ বিক্রয় করে দেওয়া। এই তিনটি লেনদেন-চুক্তির হুকুম পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর আমরা সামগ্রিকভাবে হাউস ফাইন্যান্সিং-এর এই পদ্ধতির শরয়ি দৃষ্টিকোণ পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম লেনদেন চুক্তি তথা গ্রাহক ও কোম্পানি যৌথভাবে বাসস্থান ক্রয় করায় শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা, এই ক্রয়ের ফলে উভয় পক্ষের মাঝে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর ফকিহগণ যৌথ মালিকানার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন—

> شركة ملك هى أن يملك متعدد عينا أو دينا بإرث أو بيع أو غيرهما.
>
> 'যৌথ মালিকানা বলা হয় উত্তরাধিকার, বিক্রয় কিংবা অন্যকিছুর মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বস্তু কিংবা ঋণের মালিক হওয়া।'[২০৪]

মোটকথা, আলোচ্য মাসআলায় ওই বাসস্থানটি কোম্পানি ও গ্রাহকের যৌথ অর্থায়নে ক্রয় করার কারণে তার মধ্যে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[২০৪] রদ্দুল মুহতার সংযোজিত তানবিরুল আবসার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬৪।

দ্বিতীয় লেনদেন চুক্তি তথা ওই বাসস্থানের কোম্পানির অংশকে গ্রাহক কর্তৃক ভাড়া হিসেবে নেওয়াও শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ। কেননা, যৌথ মালিকানাধীন বস্তু শরিকদার ছাড়া তৃতীয় পক্ষকে ভাড়া হিসেবে দেওয়া জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণের মাঝে যদিও মতভেদ রয়েছে কিন্তু যৌথ মালিকানাধীন বস্তুকে অপর শরিকদারের কাছে ভাড়া দেওয়া জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. লেখেন—

وَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، إِلَّا أَنْ يُؤْجِرَ الشَّرِيكَانِ مَعًا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَزُفَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلَمْ تَصِحَّ إِجَارَتُهُ.... وَاخْتَارَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ جَوَازَ ذَلِكَ. وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَجَازَتْ إِجَارَتُهُ كَالْمُفْرَدِ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ فِي مِلْكِهِ، يَجُوزُ مَعَ شَرِيكِهِ، فَجَازَ مَعَ غَيْرِهِ.

'শরিকদার ছাড়া অন্য কারও কাছে যৌথ মালিকানাধীন বস্তু ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই। তবে উভয় শরিক মিলে যদি ভাড়া দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম জুফার রহ.-এর অভিমত। এমন ইজারা জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো বস্তুটিতে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে এক শরিক একে ইজারাগ্রহীতার কাছে অর্পণ করার ক্ষমতা রাখে না। তাই তার ভাড়া দানের চুক্তি জায়েজ হবে না। অবশ্য আবু হাফস আলউকবুরি রহ. এ জাতীয় ইজারা জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। আর এটি জায়েজ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.। এটিই ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত। এই ইজারা-চুক্তি জায়েজ হওয়ার কারণ হলো যৌথ মালিকানার অংশটুকু জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট রয়েছে। আর যখন এই নির্দিষ্ট অংশের বিক্রয় জায়েজ তাই তার ইজারাও জায়েজ। যেমন : পৃথককৃত স্থানের ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়াদান জায়েজ আছে। তাছাড়া এই শরিক আপন মালিকানায়ই লেনদেন করছে। এজন্য যেভাবে সে আপন শরিকদারের সঙ্গে এই লেনদেন করতে পারে ঠিক তেমনিভাবেঅপরপক্ষের সঙ্গেও এই লেনদেন করা তার জন্য জায়েজ হবে।'[২০৫]

[২০৫] আল মুগনি-ইবনু কুদামা, পৃষ্ঠা : ১৩৭।

আল্লামা হাসকাফি রহ. আদ্দুররুল মুখতারে লেখেন—

وتفسد (اجارة) أيضا بالشيوع إلا إذا أجر كل نصيبه أو بعضه من شريكه فيجوز وجوازه بكل حال.

'যৌথ মালিকানার কারণে ইজারা ফাসেদ হয়ে যায়। অবশ্য যৌথ অংশে যদি একজন শরিকদার নিজের পূর্ণ অংশ অথবা তার অংশের অংশবিশেষ অন্য শরিকের কাছে ভাড়ায় দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। এর প্রতিটি প্রকৃতিই জায়েজ।'[২০৬]

আর যেহেতু আলোচ্য পদ্ধতিতে এক অংশীদার অপর অংশীদারকে নিজের অংশ ভাড়া হিসেবে প্রদান করে তাই ফকিহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এই পদ্ধতি জায়েজ।

তৃতীয় লেনদেন চুক্তি তথা কোম্পানি নিজের অংশকে এক এক অংশ করে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে দেওয়ার লেনদেন চুক্তিটিও শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ। কেননা, যদি এই বাসস্থানের জমি ও বিল্ডিং-এর উভয়টি পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি জায়েজ হওয়ার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য যদি এই বাসস্থানের এমারতটি কেবল পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে জমিন অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে ইমারতকে শরিকদারের কাছে বিক্রয় করা ফকিহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী জায়েজ। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন : আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. রদ্দুল মুহতারে লেখেন—

'দুই শরিকদারের কোনো একজন যদি তার ইমারতের অংশকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না; তবে তার শরিকদারের কাছে বিক্রয় করলে জায়েজ হবে।'[২০৭]

আর আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ওই বিল্ডিং শরিকদারের কাছে বিক্রয় করা হচ্ছে তাই তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো মতবিরোধ নেই।

মোটকথা, উল্লিখিত বিশদ বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যৌথ মালিকানা, ভাড়া প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির প্রত্যেকটিই মৌলিকভাবে বৈধ।

---

[২০৬] আদ্দুররুল মুখতার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৪৮।

[২০৭] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬৫।

যদি এসব লেনদেন-চুক্তি আলাদা আলাদাভাবে সম্পাদন করা হয় এবং এক লেনদেনের ভিতর অন্য লেনদেন-চুক্তিকে শর্তযুক্ত না করা হয়, তাহলে তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই।

অবশ্য এসব লেনদেন-চুক্তি যদি আগে সম্পাদিত কোনো চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হয়, তাহলে এক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে অন্য ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি (صفقة في صفقة) অনুপ্রবেশ করার কারণে বা এক চুক্তির ভিতর অন্য চুক্তি শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এই তিনটি লেনদেন চুক্তিই নাজায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, ফকিহগণের কাছে এক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে অন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি জায়েজ নেই। এমন কি এমন সব ফকিহের কাছেও এই লেনদেন নাজায়েজ যারা বিক্রয়চুক্তির মধ্যে কোনো কোনো শর্ত জায়েজ হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। যেমন : হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণের মধ্যে আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. লেখেন—

'শর্তের দ্বিতীয় প্রকারটি ফাসেদ। এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) উভয় পক্ষের মধ্য থেকে একপক্ষ অপর পক্ষের ওপর এই লেনদেন চুক্তির সঙ্গে অন্য একটি লেনদেন চুক্তিরও শর্তারোপ করবে। যেমন : বিক্রয়ের সঙ্গে ঋণ, করজ, বিক্রয়, ইজারা অথবা মূল্যব্যয় কিংবা অন্যকিছুর শর্তারোপ করলো। এই শর্তারোপ এ ক্রয়চুক্তি বাতিল করে দেবে। আর এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কেবল শর্তটিই বাতিল হবে। মাজহাবের প্রসিদ্ধ কথা হলো এই শর্ত বিক্রয়চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। কেননা, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—বিক্রয় ও ঋণকে একত্রিত করা হালাল নয়। আর বিক্রয়চুক্তির মধ্যে শর্ত আরোপ করাও হালাল নয়। ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন—হাদিসটি সহিহ। তাছাড়া মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে আরেক ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এটি সহিহ হাদিস। আর উপরে বর্ণনাকৃত হাদিসটিও এই অর্থেই এসেছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. বলেন—প্রত্যেক ওই শর্ত যা এই অর্থে হবে তাও এই ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তিকে বাতিল করে দেবে। যেমন : এক পক্ষ বললো, আমি এই শর্তে লেনদেন করছি যে, তুমি নিজের মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে অথবা এই শর্তে করছি যে, আমি আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবো। এই সবগুলো শর্তই সহিহ নয়। ইবনু মাসউদ রা. বলেন—এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি সম্পাদন করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ. ও অধিকাংশ ফকিহের অভিমত।

ইমাম মালিক রহ. একে জায়েজ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর শর্তের ভিতর যে বিনিময় উল্লেখ করা হয় তাকে ফাসেদ বলে রায় দিয়েছেন।'[২০৮]

কিন্তু এক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে অন্য ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির অনিষ্ট তখনই দেখা দেবে যখন এক চুক্তির ভিতর অন্য চুক্তি শর্তযুক্ত থাকবে। যখন আলোচ্য মাসআলায় উভয় পক্ষ পরস্পরের মধ্যে এই অঙ্গীকার করে যে, তারা উভয়ে অমুক তারিখে ইজারা-চুক্তি সম্পন্ন করবে এবং অমুক তারিখে বিক্রয়-চুক্তি নিষ্পন্ন করবে—এরপর উভয় লেনদেন-চুক্তি আপন আপন সময়ে কোনো শর্ত করা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যাবে—তখন এ অবস্থায় এক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে অন্য ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির অনিষ্ট কোনো অবস্থাতেই অপরিহার্য হবে না। এজন্য ফকিহগণ কয়েকটি মাসআলায়—বিশেষত, অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মাসআলায়—এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন : ইতোপূর্বে ফতোওয়ায়ে তাতার খানিয়া-এর উদ্ধৃতি অতিক্রান্ত হয়েছে—

وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة لحاجة الناس.

'যদি প্রথমে বিনাশর্তে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির উল্লেখ করে এরপর শর্তকে অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবে। কেননা, অঙ্গীকার পূরণ করা কখনো কখনো মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।'[২০৯]

মালিকি মাজহাবের আলেমগণও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি 'بيع بالوفاء' যাকে তারা بيع الثنايا বলে অভিহিত করে থাকে এর মাসআলায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি তাদের মতে জায়েজ নয়। যেমন : আল্লামা হাত্তাব রহ. লেখেন—

لا يجوز بيع الثنايا وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أن آتيك بالثمن إلى مدة كذا أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني.

'بيع الثنايا জায়েজ নেই। بيع الثنايا এর স্বরূপ হলো বিক্রেতা বলবে যে, আমি আমার এই মালিকানা অথবা পণ্যসামগ্রী এই শর্তে বিক্রয় করছি

[২০৮] আশ শারহুল কাবির, শামসুদ্দিন ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩, মুগনি, মুয়াফফাকুদ্দিন ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৯০।

[২০৯] ফতোওয়ায়ে খানিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৮।

যে, আমি যদি এত সময়ের মধ্যে তোমার কাছে এর মূল্য নিয়ে আসি অথবা যখনই আমি তোমার কাছে এর মূল্য নিয়ে আসব তখনই এই বিক্রয় আমার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।'[২১০]

অবশ্য বিক্রয় যদি কোনো শর্ত করা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যায়, এরপর ক্রেতা বিক্রেতার সঙ্গে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে, সে যখন মূল্য নিয়ে আসবে তখন বিক্রেতা এই পণ্য পুনরায় বিক্রয় করে দেবে তাহলে এ অবস্থায় এই অঙ্গীকার পূরণ করা জরুরি হয়ে যাবে। আল্লামা হাত্তাব রহ. লেখেন—

قال فى معين الحكام: ويجوز للمشترى أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له ويلزم المشترى متى جائه بالثمن فى خلال الأجل أو عند انقضائه أو بعده على القرب منه ولا يكون للمشترى تفويت فى خلال الأجل فان فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد اليه.

'তিনি মুইনুল হুক্কাম গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতার জন্য জায়েজ আছে অনুগ্রহ করে বিক্রেতাকে এ কথা বলা যে, যদি সে এত সময়ের মধ্যে মূল্য নিয়ে আসে, তাহলে এই পণ্য তার মালিকানায় চলে যাবে। অতএব, যদি এই সময়ের মধ্যে অথবা সময় পূর্ণ হলে কিংবা সময় পূর্ণ হওয়ার পরপরই বিক্রেতা মূল্য নিয়ে আসে, তাহলে ক্রেতার জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অপরিহার্য। ক্রেতার জন্য জায়েজ নেই যে, এই সময়ের মধ্যে পণ্যকে বিক্রয় কিংবা কাউকে দান করার মাধ্যমে সামনে চালিয়ে দেবে। যদি ক্রেতা এমনটি করে, তাহলে তার এই লেনদেন চুক্তি ভেঙে যাবে। তবে শর্ত হলো বিক্রেতা যদি তাকে ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী হয় এবং মূল্য ফেরত প্রদান করে।'[২১১]

আমরা যা বল্লাম, তা ওই সময় যখন বিক্রয় কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই অস্তিত্বে এসে যায় এবং তাদের মধ্যকার প্রতিশ্রুতি ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পরে করা হয়। কোনো কোনো ফকিহ এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে বিক্রেতা ও ক্রেতা পরস্পরের মধ্যে কোনো অঙ্গীকার করে নেয়,

---

[২১০] তাহরিরুল কালাম, পৃষ্ঠা : ২৩৩।

[২১১] তাহরিরুল কালাম, পৃষ্ঠা : ২৩৯।

এরপর কোনো শর্ত করা ছাড়াই বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে তা জায়েজ আছে। যেমন : কাজি ইবনু সামাওয়া রহ. লেখেন—

شرطا شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ويبطل لو تقارنا.

'যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা লেনদেন-চুক্তি সম্পন্ন করার আগেই ফাসেদ শর্ত আরোপ করে এরপর চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। অবশ্য শর্তটি যদি চুক্তির সাথে সাথেই হয়, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে।'[২১২]

(بيع بالوفاء) অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির ব্যাপারে কাজি ইবনু সামাওয়া বলেন—

وكذا لو توضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة بالمواضعة السابقة.

'যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদনের আগে কোনো অঙ্গীকার করে নেয়, এরপর তা পূরণ করার শর্ত করা ছাড়াই বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে এই চুক্তি জায়েজ আছে। আর পূর্ব অঙ্গীকারের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।'[২১৩]

অবশ্য আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. জামিউল ফুসুলাইনের এ উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন—

فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا: لَوْ شَرَطَا شَرْطًا فَاسِدًا قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدَا لَمْ يَبْطُلِ الْعَقْدُ. اهـ قُلْتُ: وَيَنْبَغِي الْفَسَادُ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَيْعِ الْهَزْلِ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبُيُوعِ.

'জামিউল ফুসুলাইন গ্রন্থেও আছে, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা তাদের লেনদেন সম্পন্ন করার আগেই তাতে ফাসেদ শর্ত আরোপ করে এরপর চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে এই লেনদেন চুক্তি বাতিল হবে না। আমার অভিমত হলো লেনদেন চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাওয়া সমীচীন; যদি ক্রেতা বিক্রেতা এই চুক্তিকে পূর্বকৃত শর্তের বুনিয়াদের ওপর করে। যেমনটি ফকিহগণ বিদ্রূপের ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে এ বিষয়টি বলেছেন। এটি কিতাবুল বুয়ু-এর শেষে আসবে।'[২১৪]

---

[২১২] জামিউল ফুসুলাইন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৭।

[২১৩] জামিউল ফুসুলাইন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৭।

[২১৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড :. ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

কিন্তু আল্লামা খালিদ আতাসি রহ. ইবনু আবিদিন রহ.-এর এই প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন—

هذا بحث مصادم للمنقول (أى ما هو منقول فى جامع الفصولين) كما علمت وقياسه على بيع الهزل كما فى المنار هو أن يراد بالشيئ مالم يوضع له ولا ما يصلح له اللفظ استعارة ونظيره بيع التجلئة وهو كما فى الدر المختار أن يظهرا عقدا وهما لا يريد أنه وهو ليس ببيع فى الحقيقة فاذا اتفقاه على بناء العقد عليه فقد اعترفا بأنهما لم يريدا انشاء بيع أصلا وأين هذا من مسئلتنا ؟ وعلى كل حال فاتباع المنقول أولى.

‘এই আলোচনা জামিউল ফুসুলে বর্ণিত বিবরণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক; যেমনটি আপনি অবগত হয়েছেন। একে আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. কর্তৃক বিদ্রূপাত্মক বিক্রয়ের ওপর তুলনা করা অযৌক্তিক। আল মানার গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী الهزل শব্দের মর্ম হলো কোনো বস্তুর মাধ্যমে এমন কিছু চাওয়া যার জন্য একে গঠন করা হয়নি। আর এ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে না। এর দৃষ্টান্ত হলো بيع التجلئة আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থে بيع التجلئة এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে, দুজন চুক্তি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কোনো চুক্তি করার বিষয়টি প্রকাশ করবে, কিন্তু তাদের চুক্তি করার আগ্রহ নেই। এটি প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় চুক্তি নয়। এজন্য যদি চুক্তিকারীদ্বয় এই চুক্তির ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় কোনো চুক্তি সম্পাদন করে নেয়, তাহলে এমনটি করা চুক্তিকারীদ্বয়ের পক্ষ থেকে এ কথার স্বীকৃতি যে, তারা প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতেই চায়নি। এখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এই মাসআলার সঙ্গে আমাদের মাসআলার কোনো সম্পর্ক নেই। মোটকথা, জামিউল ফুসুলাইনে আলোচিত মাসআলাটিকে অনুসরণ করাই অধিকতর সংগত।’

এ কারণে হানাফি মাজহাবের পরবর্তী যুগের ফকিহগণের একটি দল এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি কোনো অঙ্গীকার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি থেকে একেবারেই পৃথক থাকে; চাই সেই অঙ্গীকার ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির আগে করা হোক কিংবা পরে উভয় অবস্থায় এই অঙ্গীকার ক্রয়-বিক্রয়চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হবে না। আর এ অঙ্গীকারের কারণে এটি অপরিহার্য হবে না যে, এই ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি শর্তসাপেক্ষে হয়েছে। আর এটিও জরুরি হবে না যে, এখানে ‘এক ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে অন্য ক্রয়-

বিক্রয়-চুক্তি পাওয়া গিয়েছে।' অতএব, এই লেনদেন চুক্তি জায়েজ হওয়ার মধ্যে আর কোনো বাধা রইলো না।[২১৫]

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন বাকি রয়ে যায় যে, যে অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের আগে চুক্তিকারীদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে কোনো অঙ্গীকার করে নেওয়া হয় ওই অবস্থায় যদিও ইজাব কবুলের সময় এই অঙ্গীকারকে ভাষায় উল্লেখ করা হয় না কিন্তু এটি বাস্তব যে, এই অঙ্গীকারের প্রতি ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করার সময় অবশ্যই লক্ষ রাখা হয় এবং পূর্বকৃত অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করেই চুক্তিকারীদ্বয় এই বর্তমান চুক্তি সম্পন্ন করে। অতএব, এ অবস্থায় তো এমন লেনদেন যার মধ্যে বিক্রয়-চুক্তির আগে কোনো অঙ্গীকার করা হয়েছে আর এই লেনদেনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না যার মধ্যে স্পষ্টভাবে অন্য কোনো চুক্তি শর্ত করা হয়। আর কোনো লেনদেনের হুকুম তার বাস্তবতার ওপর হওয়া উচিত। এর বাহ্যিক অবস্থার ওপর হওয়া উচিত নয়। এজন্য পূর্বকৃত অঙ্গীকারও শর্তের রূপ লাভ করে এই বিক্রয়-চুক্তিকে নাজায়েজ করে দেবে।

আমার জানামতে এই প্রশ্নের উত্তর হলো : আলোচ্য দুই মাসআলার মধ্যে কেবল বাহ্যিক ও শাব্দিক পার্থক্যই নয় বরং প্রকৃতপক্ষে এই দুই মাসআলার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদও রয়েছে। আর তা হলো একটি চুক্তি অন্য একটি চুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত হওয়া; যাকে পরিভাষায় 'ছাফাকা ফি ছাফাকা' (صفقة في صفقة) বলা হয় তার মধ্যে প্রথম চুক্তি স্বতন্ত্র ও অকাট্য হয় না। বরং প্রথম চুক্তি দ্বিতীয় চুক্তির ওপর এভাবে নির্ভরশীল হয় যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি ছাড়া পূর্ণাঙ্গই হতে পারে না। যেমনভাবে একটি ঝুলন্ত চুক্তি অন্য চুক্তির ওপর নির্ভর করে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এজন্য যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আমি এই বাসস্থান তোমার কাছে এই শর্তে বিক্রয় করছি যে, তুমি তোমার নিজের অমুক জায়গা আমাকে এত টাকা ভাড়ায় প্রদান করবে। এর উদ্দেশ্য হলো, এই বিক্রয়-চুক্তি ভবিষ্যতে সম্পাদিতব্য ইজারার ওপর ভিত্তিশীল হবে এবং যখন কোনো চুক্তি ভবিষ্যতের চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয় তখন এই চুক্তিকে স্বতন্ত্র চুক্তি বলে অভিহিত করা যায় না, বরং একে ঝুলন্ত চুক্তি বলা যায়। আর বিপরীতমুখী লেনদেনের একটিকে অপরটির ওপর ঝুলন্ত রাখা জায়েজ নেই।

আর বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করার পর যদি ক্রেতা ইজারাচুক্তি সম্পন্ন করতে

---

[২১৫] ইতরে হেদায়া, পৃ. ১০৯।

অস্বীকার করে, তাহলে এই অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পাদিত না হওয়ার মতো হয়ে যাবে। কেননা, এই ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তিটি ইজারাচুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত ছিলো। আর প্রসিদ্ধ একটি মূলনীতি হলো শর্ত যখন হারিয়ে যায় তখন শর্তযুক্ত চুক্তিটিও নিঃশেষ হয়ে যায়।

এজন্য যখন এক চুক্তি অন্য চুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত হবে তখন এর অর্থ হলো প্রথম চুক্তিটি দ্বিতীয় চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। বিক্রেতা যেন ক্রেতাকে বললো, যদি তুমি তোমার অমুক বাসস্থান এত টাকা ভাড়ায় প্রদান করো, তাহলে আমি তোমার কাছে আমার এই বাসস্থান এত টাকায় বিক্রয় করে দেবো। স্পষ্ট যে, এই চুক্তি কোনো ইমামের কাছেই জায়েজ নয়। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পৃক্ত বা ঝুলন্ত রাখা জায়েজ নয়।

তবে এ বিষয়টি ভিন্ন যে, বিক্রেতা ও ক্রেতা প্রথম দিকেই যদি ইজারা-চুক্তিকে একটি অঙ্গীকারের আকৃতিতে ধার্য করে নেয়, এরপর কোনো শর্ত করা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে এ অবস্থায় এই ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি একটি স্বতন্ত্র ও শর্তহীন চুক্তি হবে। এটি ইজারা-চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে না। এজন্য ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি ক্রেতা ইজারা-চুক্তি সম্পন্ন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তা ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরং এই ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি আপন স্থানে পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ হবে।

বেশির থেকে বেশি এটি বলা যাবে, যেহেতু অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য তাই ক্রেতাকে এটি করতে বাধ্য করা হবে যে, সে যেন তার অঙ্গীকার পূরণ করে। কেননা, সে এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে বিক্রেতাকে এই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেছে। মালিকি মাজহাবে আইনগতভাবেও এই অঙ্গীকার পূরণ করা ক্রেতার জিম্মায় জরুরি। অবশ্য অঙ্গীকারের কারণে এই ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদনে কোনো প্রভাব পড়বে না যা কোনোরূপ শর্তারোপ করা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, ক্রেতা যদি তার অঙ্গীকার পূরণ না করে, তাহলেও ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি আপনস্থানে পূর্ণ হয়ে যাবে।

এ বিশদ বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি বিক্রয়চুক্তির মধ্যে অন্য কোনো চুক্তি শর্তযুক্ত থাকে, তাহলে এই চুক্তি পূর্ণ হওয়া এবং বাতিল হওয়ার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে; আর এই সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে এই চুক্তির মধ্যে ফাসাদ দেখা দেয়। তবে বিক্রয়-চুক্তিটি সাধারণ ও নিঃশর্ত হলে ভিন্ন কথা।

অবশ্য এই বিক্রয়-চুক্তির আগে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা নিজেদের মধ্যে কোনো অঙ্গীকার করে নেয়, তাহলে বিক্রয়-চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার মধ্যে কোনো সংশয় বাকি থাকে না; তা সর্বাবস্থায় পূর্ণ হয়ে যাবে। বেশির চেয়ে বেশি এটি হবে যে, যেসব ফকিহের অভিমত অনুযায়ী অঙ্গীকার পূরণ করা জরুরি তাদের মতে এই পূর্বকৃত অঙ্গীকার পূরণ করা ক্রেতার জিম্মায় অপরিহার্য হবে।

মোটকথা, ক্রম-হ্রাসমান শরিকানা লেনদেন জায়েজ ও সঠিক হওয়ার সহিহ পদ্ধতি এটিই যে, এই তিনটি লেনদেনই আপন আপন সময়ে অন্যসব লেনদেন থেকে আলাদাভাবে সম্পন্ন করা হবে এবং একচুক্তি অন্য চুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত হবে না। হ্যাঁ, এটি হতে পারে যে, ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে একটি অঙ্গীকার ও এগ্রিমেন্ট হবে যার অধীনে ভবিষ্যতের লেনদেনসমূহ সম্পন্ন হবে।

অতএব, গ্রাহক ও কোম্পানি এ বিষয়ে একমত হয়ে যাবে যে, অমুক স্থান উভয়ে মিলে যৌথভাবে ক্রয় করবে। এরপর কোম্পানি তার অংশটুকু গ্রাহককে ভাড়া হিসেবে প্রদান করবে। এরপর গ্রাহক কোম্পানির অংশকে বিভিন্ন প্রিমিয়ামের মাধ্যমে ক্রয় করতে থাকবে যে পর্যন্ত না সে পুরো বাসস্থানের মালিক হয়ে যায়।

কিন্তু এটি অবশ্যই জরুরি যে, গ্রাহক ও কোম্পানির মধ্যে এই চুক্তি কেবল অঙ্গীকারের আকৃতিতেই হবে এবং প্রতিটি চুক্তি আপন আপন সময়ে স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। এই অবস্থায়ই চুক্তিটি শর্তহীন হবে। সে ক্ষেত্রে ইজারাদারির মধ্যেও ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির লেনদেন শর্তযুক্ত হবে না আবার বিক্রয়ের ভিতরও ভাড়া দেওয়ার লেনদেন শর্তযুক্ত হবে না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

সুদমুক্ত কাউন্টার—পিএলএস অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সূচনা করে রাষ্ট্র সকল ব্যাংকে 'পিএলএস' বা প্রফিট এন্ড লস শেয়ারিং (লাভ ও লোকসানের যৌথ হিসাব) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এর জন্য সুদমুক্ত কাউন্টার খুলে দেয়। যেহেতু এই কার্যক্রমের সবই সুদি বুনিয়াদের ওপর ভিত্তিশীল ছিলো তাই শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) সুদমুক্ত কাউন্টার-এর বাস্তবতা লোকদের সামনে তুলে ধরার জন্য 'সুদমুক্ত কাউন্টার—পিএলএস অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। এর মধ্যে তিনি বলে দিয়েছেন, রাষ্ট্রকর্তৃক জারিকৃত সুদমুক্ত কাউন্টারও সুদি লেনদেনের ওপরই ভিত্তিশীল। তাই এর মধ্যে টাকা রেখে মুনাফা গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম
মাকতাবাতুল ইসলাম

সুদমুক্ত কাউন্টার—পিএলএস অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি থেকে পাকিস্তান সরকার সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সূচনা করার ঘোষণা দেয় এবং প্রতিটি ব্যাংকে 'সুদমুক্ত কাউন্টার' খুলে দেওয়া হয়। সরকার ঘোষণা করেছিলো, সুদমুক্ত ব্যাংকিং-ব্যবস্থাপনার দিকে অভিযাত্রার প্রতি এটি আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। অদূর ভবিষ্যতে আমরা ব্যাংকিং-এর পুরো ব্যবস্থাপনাকে ক্রমে ক্রমে সুদমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন করে দেবো।

সুদের অভিশাপ থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ করা ইসলামি রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর যে দিন আমাদের অর্থনীতি এই শয়তানি বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভ করবে সেদিন কেবল পাকিস্তানের জন্যই নয়, বরং পুরো ইনসানিয়াত ও মানবতার জন্যই সৌভাগ্যময় দিন হবে। বর্তমান সরকার বারবার নিজের এই প্রত্যয় ঘোষণা করেছে যে, সে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে সুদমুক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চায়। আর এই ঘোষণা এমন এক পরিবেশে যেখানে ব্যাংকসমূহ সুদকে হালাল ও পবিত্র বলে অভিহিত করার লজ্জাজনক অপপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই প্রত্যয়ের ঘোষণাও মুসলিমদের মনে আশার আলো সঞ্চার করেছে। তারা এই ঘোষণাকে গনিমত মনে করেছে। এই নেক কর্মের যে পদক্ষেপই সামনে বাড়ানো যাবে তাকে অতীতের যে-কোনো সময়ের মোকাবিলায় উত্তম বলেই গণ্য করা হবে। এজন্য এই নতুন 'সুদমুক্ত কাউন্টার' সূচনা লাভ করার পর

মুসলিমদের একটি বড়ো অংশ একে খোশ আমদেদ জানিয়েছে এবং নিজেদের অ্যাকাউন্ট এসব কাউন্টারের মধ্যে খুলতে শুরু করেছে।

ব্যক্তিগতভাবে যদিও আমি এই কর্মপদ্ধতির তীব্র বিরোধী ছিলাম যে, সুদি ও সুদমুক্ত কাউন্টার একই সঙ্গে পরিচালিত হবে। কিন্তু এরপরও যখন এসব কাউন্টার খোলা হলো তখন এই পদক্ষেপকে অতীত সময়ের মোকাবিলায় সর্বাবস্থায় গনিমত মনে করে আমাদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি ছিলো, এসব কাউন্টারকে সফল করে তোলার প্রয়াস চালানো উচিত। কেননা, দীর্ঘসময়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর এই কর্মের সূচনা করা হচ্ছে যার জন্য আমাদেরকে শতাব্দির একতৃতীয়াংশ কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। ধারণা এই ছিলো, কর্মকৌশল যাই হোকনা কেন, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন সর্বাবস্থায় একটি ভালো কাজ। এর মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করা কল্যাণ ও মঙ্গলজনক। তাই এই কল্যাণকর কাজে সাহায্য করার আগ্রহ নিয়ে আমরা এর স্কিম অধ্যয়ন করি। কিন্তু পরিতাপ ও আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, স্কিম অধ্যয়ন করার মাধ্যমে এসব কাউন্টারের বিশদ কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আমাদের আগ্রহ একেবারেই নির্বাপিত হয়ে যায়।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারির পর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লিখিত ও মৌখিকভাবে আমাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হচ্ছিলো যে, প্রকৃতপক্ষেই এসব কাউন্টার সুদমুক্ত কি না? আর কোনো মুসলিমের জন্য কোনো ধরনের সুদের ঝুঁকি গ্রহণ করা ছাড়াই এসব কাউন্টারে টাকা রাখা যাবে কি না?

এসব প্রশ্নের দায়িত্বশীল জবাব দেওয়ার জন্য যখন আমরা এই স্কিম অধ্যয়ন করি যা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি চালু করা হয়েছিলো এবং এর কর্মপন্থা যাচাই বাছাই করে তখন আমাদের কাছে মনে হয়েছে, সুদের ছত্র-ছায়ায় লালিত পালিত মানসিকতা এত সহজে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। বরং সে এর ওপর কিছু সুবাস ছড়িয়ে চিত্তাকর্ষক করে এই ব্যবস্থাপনার ওপরই আরও কিছুদিন কাজ চালাতে চায়। এজন্য মুসলিমদেরকে এখন কেবল অপেক্ষা করলে হবে না, বরং সুদি ব্যবস্থাপনায় গড়ে-ওঠা দেওয়ালকে যা ইনশাআল্লাহ একদিন ধ্বসে পড়বেই—সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য এখনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যেহেতু সাধারণভাবে মুসলিমদের কাছে এমনকি অধিকাংশ আলেমের কাছেও

এই নতুন স্কিমের বিশদ বিবরণ পৌঁছেনি, তাই আমরা একে নিজের দায়িত্ব মনে করছি যে, আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিধি অনুযায়ী এই স্কিমের পর্যালোচনা পেশ করবো; যাতে সাধারণ জনগণ ও আলেমগণ এর আলোকে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেন।

ব্যাংকসমূহকে সুদমুক্ত ব্যবস্থাপনার ওপর কীভাবে পরিচালিত করা যায় এবং অর্থনীতির জন্য সুদের বিকল্প ভিত্তি কী হবে? এই মাসআলার ওপর দীর্ঘসময় ধরে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অংশে গবেষণা করা হচ্ছে এবং এর ওপর বহু জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে। চিন্তা ও গবেষণার এসব ফলাফল সামনে রাখলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সুদের বিকল্প পদ্ধতি মূলত দুটি। এক হলো লাভ লোকসানের বণ্টন তথা শিরকাত ও মুদারাবা-ব্যবসা পদ্ধতি। আর অন্যটি হলো করজে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ।

এজন্য সুদ খতম করার পর ব্যাংকিং-এর পুরো ব্যবস্থাপনার ভিত্তি মৌলিকভাবে এ দুই পদ্ধতির ওপরই নির্ভরশীল হবে। অবশ্য ব্যাংককে এমন কিছু কাজও করতে হয় যেগুলো সম্পাদন করার জন্য ব্যাংক শিরকাত ও মুদারাবা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারে না, আবার করজে হাসানাও সরবরাহ করতে পারে না। এ জাতীয় অবস্থায় আনুষাঙ্গিকভাবে আলেমগণ ভিন্ন কিছু কর্মপন্থার কথাও প্রস্তাব করেছেন। অবশ্য তাদের এই পদ্ধতিগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি হতে পারে না, বরং এগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে বা দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য অবলম্বন করা যায়।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর জন্য এখন পর্যন্ত যে জ্ঞানগত ও সন্ধানী কর্ম সামনে এসেছে সেগুলোর মধ্য থেকে অধমের জানার পরিধি অনুযায়ী সবচেয়ে অধিক ব্যাপক, বিশদ ও তথ্যবহুল রিপোর্ট হলো যা ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিলের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলেমগণের সাহায্য-সহযোগিতায় রচনা করা হয়েছে। এই রিপোর্টের সারমর্মও হলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর আসল ভিত্তি লাভ লোকসানের বণ্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ব্যাংকের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য শিরকাত ও মুদারাবা চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হবে। অবশ্য যেসব কাজে শিরকাত ও মুদারাবা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সেসব কাজের জন্য এই রিপোর্টের মধ্যে এমন কিছু বিকল্প পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে যেগুলোকে প্রয়োজনকালে ও দুর্যোগের সময় অবলম্বন করা যায়। এসব বিকল্প পদ্ধতির মধ্য থেকে যে পদ্ধতিকে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম بيع مؤجل বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়।

এই কর্মপদ্ধতির সারমর্ম এভাবে অনুধাবন করুন। যেমন : একজন কৃষক একটি ট্রাক্টর ক্রয় করতে চায়। কিন্তু তার কাছে এর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ টাকা নেই। বক্ষ্যমাণ অবস্থায় ব্যাংক এমন ব্যক্তিকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ অবস্থায় সুদের পরিবর্তে শিরকাত ও মুদারাবা-চুক্তি এজন্য চলতে পারে না যে, কৃষক ট্রাক্টর ব্যবসা করার জন্য নয়, বরং নিজের জমি চাষ করার জন্য ক্রয় করছে। এ অবস্থার আদর্শিক সমাধান এটিই যে, ব্যাংক এমন ব্যক্তিকে সুদমুক্ত ঋণ তথা করজে হাসানা প্রদান করবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ব্যাংকের আর্থিক সঙ্গতি এতটুকু না থাকবে যে, সে করজে হাসানা দিয়ে কাউকে সাহায্য করতে পারে ততদিন পর্যন্ত তার জন্য এই প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে যে, ব্যাংক কৃষককে টাকা দেওয়ার পরিবর্তে ট্রাক্টর ক্রয় করে তাকে প্রদান করবে এবং বাকিতে একে তার কাছে বিক্রয় করে দেবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজের কিছু মুনাফা রেখে এর মূল্য নির্ধারণ করে কৃষককে এই অবকাশ দেবে, সে ব্যাংককে ট্রাক্টরের নির্ধারিত মূল্য কিছুদিন পর আদায় করে দেবে। এই কর্মপদ্ধতিকে ইসলামি কাউন্সিলের রিপোর্টে بيع مؤجل বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় নামে অভিহিত করা হয়েছে। ট্রাক্টর ক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যাংক ট্রাক্টরের বাজারমূল্যের ওপর যে মুনাফা নির্ধারণ করেছে তাকে অর্থনীতির পরিভাষায় Mark up বা সাধারণ বাজারমূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সুদ থেকে বেঁচে থাকার উত্তম কোনো পদ্ধতি এটি নয়। কিন্তু আলোচ্য অবস্থায় যেহেতু ব্যাংক ট্রাক্টরকে নিজের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকির মধ্যে আনার পর বিক্রয় করে তাই ফিকহি দৃষ্টিকোণে এই লাভ সুদ নয়। ফকিহগণ বিশেষ কিছু শর্তের সঙ্গে এর অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, যেসব অবস্থায় ব্যাংকের সামনে বিকল্প কোনো পদ্ধতি খোলা নেই সেসব অবস্থায় কাউন্সিলের রিপোর্টে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, প্রয়োজনের সময় স্পষ্ট সুদ থেকে বাঁচার জন্য এই কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কখনোই এটি নয় যে, এই কর্মপদ্ধতিকে সুদের প্রাণ বাকি রাখার আইনি অপকৌশল বানিয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার পুরো ইমারতকে Mark up বা সাধারণ বাজারমূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যের ওপর দাঁড় করানো হবে। অতএব, কাউন্সিলের আলোচ্য রিপোর্টের মধ্যে যেখানে সুদের বিকল্প পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে একটি পদ্ধতি بيع مؤجل বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটিও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এই কর্ম-পদ্ধতি কোন কোন

অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। রিপোর্টের মুখবন্ধে লেখা হয়েছে—

‘কাউন্সিল প্রথমেই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি মনে করে যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুদের সর্বোত্তম বিকল্প সমাধান হলো ‘লাভ ও লোকসানে অংশগ্রহণ করা কিংবা করজে হাসানা ও সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করা। যদিও এই রিপোর্টে উত্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহের অধিকাংশই লাভ লোকসানে অংশগ্রহণের মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল তা সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রস্তাবনার মধ্যে অন্যান্য বিকল্প পদ্ধতি যেমন, ইজারাদারি, মালিকানাধীন বস্তুর ভাড়াদান, বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি এবং নিলামের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগকেও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিকল্প পদ্ধতি যে প্রক্রিয়ায় আলোচ্য রিপোর্টে পেশ করা হয়েছে যদিও সেগুলো সুদের উপাদান থেকে মুক্ত তা সত্ত্বেও ইসলামের আদর্শিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণে এগুলো কেবল ‘দ্বিতীয় বিকল্প সমাধান’। তাছাড়া এই আশঙ্কাও রয়েছে যে, এই কর্মপদ্ধতি পরিশেষে সুদি লেনদেন এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অনিষ্টসমূহকে নতুনভাবে প্রচলন দেওয়ার জন্য গুপ্ত দরজার আকৃতিতে ব্যবহার হতে থাকবে। এজন্য এ বিষয়টি জরুরি যে, যথাসম্ভব এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ না করা। আর করার প্রয়োজন হলেও কেবল সেসব অবস্থা ও বিশেষ ক্ষেত্রে করা যেখানে এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। আর কোনো অবস্থায়ই এর অনুমতি দেওয়া হবে না যে, এই পদ্ধতিকে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা হবে।’[২১৬]

তাছাড়া বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তির ধরন স্পষ্ট করতে গিয়ে এ রিপোর্টে লেখা হয়েছে, যদিও ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগের এই পদ্ধতি জায়েজ তা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় একে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক হবে না। কেননা, এর যত্রতত্র ব্যবহারে এই আশঙ্কা রয়েছে যে, নতুন করে সুদি লেনদেনের চোরাই পথ উন্মুক্ত হবে। এজন্য এমন সতর্কতামূলক পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে যে, এই পদ্ধতি কেবল ওই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে যেখানে এ ছাড়া আর বিকল্প কোনো পথ নেই।[২১৭]

আলোচনার এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা যখন পয়লা জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত স্কিমের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলাম তখন দেখতে পেলাম, এখানে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই স্কিমে কেবল Mark up বা সাধারণ

[২১৬] সুদের ওপর ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিলের উর্দু রিপোর্টের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা : ১৩

[২১৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৬।

বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্যকেই সুদমুক্ত কাউন্টারের বাণিজ্যের ভিত্তি বানানো হয়নি, বরং Mark up এর কর্মপদ্ধতিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সেসব শর্তের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়নি, যেগুলো এই Mark up কে সীমিত ফিকহি আকারে বৈধতা দান করতে পারে। যার ফলে তাতে নিম্নোক্ত মারাত্মক দোষ ও অনিষ্টগুলো পরিলক্ষিত হয়—

এক. বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় (بيع مؤجل) জায়েজ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো বিক্রেতা যে বস্তু বিক্রয় করবে তা তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। ইসলামি শরিয়তের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো যে বস্তু কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসেনি এবং যে বস্তুর কোনো ঝুঁকিও (Risk) মানুষ বহন করেনি তা বিক্রয় করে মুনাফা লাভ করা জায়েজ নেই। আর আমাদের পর্যবেক্ষণকৃত স্কিমে বিক্রয়কৃত বস্তু ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে আসার ব্যাপারে কোনো কথা উল্লেখ নেই। স্কিমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ব্যাংক Mark up এর অধীনে কোনো বস্তু (যেমন : চাল) নিজের গ্রাহককে সরবরাহ করবে না, বরং এই চালের ওই বাজারমূল্য প্রদান করবে যার মাধ্যমে সে চাল ক্রয় করে নেবে। স্কিমে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যে সব বস্তু ক্রয় করার জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে সেগুলোর ব্যাপারে মনে করা হবে, ব্যাংক নিজের বিনিয়োগকৃত টাকার মাধ্যমে এগুলো ক্রয় করেছে। এরপর নববই দিন পর আবশ্যকীয়ভাবে আদায়যোগ্য মূল্যে সেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে এগুলো বিক্রয় করে দিয়েছে; যারা ব্যাংকের কাছে অর্থ নেওয়ার জন্য এসেছে।'[২১৮]

এর মধ্যে এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই যে, এসব বস্তু ব্যাংকের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কখন এবং কীভাবে এসেছে। আর কোনো ব্যক্তির কাছে অর্থ সরবরাহ করার মাধ্যমে এটি কীভাবেই বা বুঝা যেতে পারে যে, যে বস্তু সে ক্রয় করতে চায় সেই বস্তু ব্যাংক প্রথমে ক্রয় করে তার কাছে বিক্রয় করেছে? কেবল কাগজে কলমে কোনো বস্তু সম্পাদিত হওয়ার দ্বারা বাস্তবিকভাবে তা কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা না হবে? বেশির চেয়ে বেশি যা হতে পারে তা হলো ব্যাংক প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে যাতে সে কাঙ্ক্ষিত বস্তু ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রয় করে নেয়। এরপর যখন সে ওই বস্তু ক্রয় করে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সেটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে

---

[২১৮] স্টেট ব্যাংক নিউজ, পয়লা জানুয়ারি, ১৯৮১ পৃষ্ঠা : ৯।

নিয়ে নেবে তখন ব্যাংক সেটা তার কাছে বিক্রয় করে দেবে। কিন্তু প্রথমে তো এই কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া সমীচীন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত বস্তু ক্রয় করে ব্যাংকের পক্ষ থেকে এর ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের সরবরাহকৃত টাকা তার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে নয়, বরং আমানত হিসেবে থাকবে। এই স্কিমে কেবল এ প্রকার কর্মপদ্ধতির উল্লেখ নেই তা নয়, বরং এখানে এ কথা বলা হয়েছে, চাল ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য ব্যাংক যে টাকা রাইস কর্পোরেশনের কাছে প্রথমে দিয়েছিলো ২৮ মার্চ মনে করা হবে কর্পোরেশন এই টাকা সুদসহ ব্যাংককে ফিরিয়ে দিয়েছে। এরপর ব্যাংক ওই দিনেই ওই টাকা পুনরায় কর্পোরেশনকে Mark up বা সাধারণ বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্যের ভিত্তিতে দিয়ে দিয়েছে। আর যে বস্তু ক্রয় করার জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়েছিলো মনে করা হবে যে, সেই বস্তু ব্যাংক ক্রয় করে নিয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে কর্পোরেশনের কাছে তা Mark up বা সাধারণ বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয় করে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যেসব টাকা দিয়ে কর্পোরেশন প্রথম চাল বা অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করেছে এবং সম্ভবত ক্রয় করে পরবর্তী সময়ে বিক্রয়ও করে দিয়েছে তার ব্যাপারে কোন যুক্তির আলোকে মনে করা যায় যে, একে ব্যাংক প্রথমে ক্রয় করে পুনরায় কর্পোরেশনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে?

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করার পদ্ধতিটি বাস্তবিকপক্ষে বাস্তবায়ন করার দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং কৃত্রিমভাবে এর নাম নেওয়াই এখানে মুখ্য বিষয়। আর পরিশেষে এখানে নামও বহাল থাকতে পারেনি, বরং ব্যাংকের প্রদত্ত অর্থকে ঋণ এবং এ কর্মতৎপরতাকে ঋণ প্রদান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২১৯]

দুই. এই স্কিমে মারাত্মক পর্যায়ের আরেকটি ভুল রয়েছে। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় (بيع مؤجل) জায়েজ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় একটি শর্ত হলো চুক্তি করার সময় বিক্রয়কৃত বস্তুর মূল্যও স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটিও নির্দিষ্ট হতে হবে যে, এই মূল্য কতদিনের মধ্যে আদায় করা হবে? এরপর যদি ক্রেতা এই মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় না করে, তাহলে

[২১৯] স্টেট ব্যাংক নিউজ, পয়লা জানুয়ারি, ১৯৮১ পৃষ্ঠা : ৭।

তার কাছ থেকে এই মূল্য উসুল করার জন্য আইনি সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাবে। কিন্তু মূল্য আদায় করা বিলম্বিত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট মূল্যে পরিবর্ধন ঘটানো শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ হবে না। কেননা, বিলম্বিত করার ওপর ভিত্তি করে যদি মূল্যের পরিমাণও বাড়ানো হয়, তাহলে তো তা সুদ বলে গণ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের পর্যালোচনাধীন স্কিমে এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তের প্রতি লক্ষ রাখা হয়নি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে এই শর্তের বিরোধিতা করা হয়েছে। যেমন : স্কিমে বলা হয়েছে, ইমপোর্ট বিলসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে ব্যাংক যে অর্থ ব্যয় করবে তার ওপর প্রথমত, বিশদিন পর্যন্ত সময়ের জন্য শতকরা ৭৮% হারে Mark up বা সাধারণ বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্য উসুল করা হবে। আর যদি এই অর্থ বিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহলে আগামী চৌদ্দ দিনের জন্য শতকরা ৫৮% হারে Mark up পরিবর্ধিত হবে। যদি ৩৪ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও ব্যাংকের ব্যয়কৃত অর্থ পরিশোধ করা না হয় তাহলে এই মূল্যের ওপর শতকরা ৬২% হারে Mark up বা সাধারণ বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্য বৃদ্ধি করা হবে। আর যদি ৪৮ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও এই অর্থ আদায় করা না হয়, তাহলে আগামী পনেরো দিনের বিলম্বের ওপর শতকরা ৭৯% হারে Mark up এর পরিবর্ধন ঘটানো হবে। আর এভাবেই এর হার দিনদিন বাড়তে থাকবে।

চিন্তা করুন, এই কর্ম-পদ্ধতি স্পষ্টভাবে সুদ ছাড়া আর কী? যদি সুদের পরিবর্তে Mark up নাম রেখে দেওয়া হয় এবং বাকি সকল বৈশিষ্ট্য আগের মতোই বলবৎ থাকে, তাহলে এর মাধ্যমে কীভাবে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

একে অবশ্যই গনিমত বলতে হয় যে, সময় বাড়তে থাকার কারণে Mark up এর হারের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটা আলোচ্য স্কিমের ইমপোর্ট বিলের মধ্যেই কেবল উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য লেনদেনসমূহে একে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু স্কিম রচয়িতাগণের দৃষ্টিতে যদি এ পদ্ধতি সুদমুক্ত হয়, তাহলে সম্ভবত তারা অন্যান্য লেনদেনেও এমন করা দোষণীয় মনে করবে না।

তিন. রাষ্ট্রীয় হুন্ডি এবং বিল অফ এক্সচেঞ্জের লেনদেন করার জন্য যে পদ্ধতি স্কিমে পেশ করা হয়েছে তা অবিকল সেটিই যা আজকাল ব্যাংকসমূহে প্রচলিত রয়েছে। এর সামান্যতম পরিবর্তন পরিবর্ধনও করা হয়নি। কেবল ওই ছাড় যাকে আগে (Discount) বলা হতো এখন তাকে Mark down

নামে নামকরণ করা হয়েছে। অথচ হুন্ডি লেনদেনের একটি শরয়ি কর্ম-পদ্ধতিও ইসলামি নজরিয়াকি কাউন্সিলের মধ্যে পেশ করা হয়েছে।

চার. শরিয়তের দৃষ্টিতে যেসব দোষ-ত্রুটি রয়েছে সেগুলো যদি স্কিম থেকে দূর করা হয়, তাহলেও মৌলিক বিষয় এই যে, এই স্কিমে শিরকাত এবং মুদারাবা পদ্ধতিকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মৌল ভিত্তি সাব্যস্ত করার পরিবর্তে মার্ক আপকে স্কিমের আসল ভিত্তি দাঁড় করানো হয়েছে এবং সুদমুক্ত কাউন্টারের অধিকাংশ ব্যবসা এই আইনগত কৌশলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছে। এ মুহূর্তে স্টেট ব্যাংক পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'স্টেট ব্যাংক নিউজ' আমাদের সামনে রয়েছে। এর পয়লা জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় সেসব খাত ও কর্মপদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যেগুলো সুদমুক্ত কাউন্টারে অবলম্বন করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী সুদমুক্ত কাউন্টারে জমাকৃত টাকা বিভিন্ন ধরনের সাতটি খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই সাতটি খাতের মধ্য থেকে কেবল একটি খাতে শিরকাত (অংশীদারত্বমূলক বাণিজ্য) ও মুদারাবা পদ্ধতিকে অবলম্বন করা হয়েছে। আর বাকি অন্য খাতসমূহে মার্ক আপ বা মার্ক ডাউনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। আর শিরকাত ও মুদারাবা বিশিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করার জন্যও নতুন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করার স্থলে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই অর্থ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, এনআইটি ইউনিট, পার্টি মুভিশন টার্ম সার্টিফিকেট ক্রয়, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন এবং ব্যাংকার ইকুইউটির সেসব লেনদেনে বিনিয়োগ করা হবে যেগুলো লাভ লোকসানের অংশিদারত্বের ওপর ভিত্তিশীল।

এই কর্মপন্থার সারমর্ম এই যে, রাষ্ট্রে শিরকাত (অংশীদারত্বমূলক বাণিজ্য) ও মুদারাবার পরিধিকে বিস্তৃতিদানের কোনো প্রোগ্রাম রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নেই, বরং যেসব প্রতিষ্ঠান বর্তমান সময়ে শিরকাত (অংশীদারত্বমূলক বাণিজ্য) ও মুদারাবা পদ্ধতিতে নিজেদের কর্ম পরিচালনা করছে সুদমুক্ত কাউন্টারসমূহে সঞ্চিত যে পরিমাণ অর্থ এসব প্রতিষ্ঠানের কাজে প্রয়োজন হতে পারে কেবল সেই পরিমাণ অর্থ এগুলোতে বিনিয়োগ করা হবে। আর অবশিষ্ট কারবার মার্ক আপ-এর ওপর ভিত্তি করে চলবে। আর বিষয়টি কেবল এমন নয় যে, ব্যাংকের আসল কারবার শিরকাত (অংশীদারত্বমূলক বাণিজ্য) ও মুদারাবার বুনিয়াদের ওপর করা হবে এবং অত্যধিক প্রয়োজনের মুহূর্তে মার্ক আপ নীতি অবলম্বন করা হবে, বরং

মার্ক আপই হবে কারবারের মূল ভিত্তি। আর শিরকাত ও মুদারাবা হবে প্রাসঙ্গিক হিসেবে। এর সারমর্ম হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করে তাকে আদর্শ ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত করার পরিবর্তে কতিপয় অপকৌশলের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেই বহাল রাখা হবে।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করার আলোচ্য পদ্ধতি যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ হয়ে থাকে এবং কতকস্থানে একে অবলম্বনও করা হয়, তাহলে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় (بيع مؤجل) নীতিতে পরিচালিত করতে অসুবিধা কোথায়? এটি জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও শিরকাত (অংশীদারত্বমূলক বাণিজ্য) ও মুদারাবা পদ্ধতির ওপর এতো জোর দেওয়া হয় কেনো?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করার উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো বস্তুকে বাকিতে বিক্রয় করা অবস্থায় এর মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও পারিভাষিকভাবে এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু ব্যাপকভাবে এর প্রচলন দেওয়ার কারণে সুদখোর মন-মানসিকতা উৎসাহিত হতে পারে। এজন্য এটি কোনো পছন্দনীয় কর্মপদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতিকে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি সাব্যস্ত করা নিম্নোক্ত কারণসমূহের দরুন ঠিক নয়।

এক. বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা অবস্থায় মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যদিও অধিকাংশ ফকিহ একে জায়েজ বলেছেন, কিন্তু সময় বাড়ার কারণে যেহেতু মূল্য বাড়ানো হয় এবং এভাবে তা পারিভাষিক দৃষ্টিকোণে সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তার মধ্যে সুদের সাদৃশ্য বা সুদখোরি মনোভাব অবশ্যই রয়েছে। এজন্য কোনো কোনো ফকিহ একে নাজায়েজ বলে অভিমত দিয়েছেন। যেমন : কাজি খানের মতো তত্ত্বানুসন্ধানী হানাফি আলেম একে সুদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম আখ্যা দিয়েছেন।

আর যে লেনদেনের মধ্যে ফকিহগণের মতভেদ রয়েছে, এবং যার মধ্যে সুদের ন্যূনতম সাদৃশ্য রয়েছে তাকে অত্যধিক প্রয়োজনের সময় অপারগতার কারণে গ্রহণ করার অবকাশ বের হতে পারে; কিন্তু এর ওপর কোটি কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগের বুনিয়াদ দাঁড় করানো এবং তাকে অর্থ বিনিয়োগের একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা কোনোভাবেই জায়েজ নয়।

দুই. মৌলিকভাবে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ব্যাংকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও কৃষিখাতে অর্থ বিনিয়োগ করা। যে প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই অস্তিত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যার কাছে ব্যবসায়-পণ্যসামগ্রীও স্টক রয়েছে, সে যদি বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে, তাহলে তার ধরন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু ব্যাংক যেহেতু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় এবং তার কাছে ব্যবসায়-পণ্যসামগ্রীও স্টক থাকে না তাই সে যদি এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে, তাহলে তা একটি কাগুজে কার্যক্রম ছাড়া এর আর কোনো বাস্তবতা থাকে না। অত্যধিক প্রয়োজনের সময় এ জাতীয় কৌশল অবলম্বন করার অবকাশ যদিও থাকতে পারে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের সমুদয় কর্ম তৎপরতাকে এ ধরনের হিলার ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না।

তিন. আমরা যখন সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর কথা বলি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামি নীতিমালার আলোকে পরিচালিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য এই থাকে না যে, কতিপয় হিলার মাধ্যমে আমরা ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান কর্মপন্থায় কিছুটা পরিবর্তন এনে তাকে আগের মতোই চলতে দেবো। বরং আমাদের উদ্দেশ্য থাকে অর্থনীতির পুরো ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে তাকে আমরা ইসলামি নীতিমালার আলোকে ঢেলে সাজাবো। পরিণামে এর প্রভাব সম্পদ বণ্টন নীতির ওপরও পড়বে। আর পুঁজি বিনিয়োগের ইসলামি চিন্তাধারা হচ্ছে যে ব্যক্তি কোনো কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায় সে হয়তো মুনাফা লাভ করার প্রত্যাশী হবে না অথবা মুনাফা লাভের প্রত্যাশী হলে সে লোকসানের ঝুঁকিও বহন করবে। এজন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মধ্যে মৌলিকভাবে এই চিন্তাধারার লালন ও সংরক্ষণ জরুরি। এখন যদি ব্যাংকিং-এর পুরো ব্যবস্থাপনা 'মার্ক আপ'-এর নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে অর্থ বিনিয়োগে এই মৌলিক ইসলামি চিন্তাধারার প্রতিফলন কোথায় হবে? তাহলে কি আমরা বিশ্ববাসীকে এই আশার বাণীই শুনিয়ে দেবো যে, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনিষ্টসমূহের ওপর পুরো মুসলিম বিশ্বে যে তোলপাড় চলছিলো তা কেবল এজন্য ছিলো যে, সুদের পরিবর্তে Mark up-এর কৌশল কেন প্রয়োগ করা হচ্ছে না? এ কৌশল ও টালবাহানার মাধ্যমে সম্পদ বণ্টন-নীতির প্রচলিত ক্ষতিকর দিক ও অনিষ্টসমূহের হাজার ভাগের একভাগও কি হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে? যদি সম্ভব না হয়, আর

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তা কখনোই সম্ভব নয়; তাহলে চিন্তা করুন Mark up-এর কৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে আমরা ইসলামি অর্থব্যবস্থার কি ধ্যান-ধারণা পৃথিবীবাসীকে উপহার দিতে যাচ্ছি?

আমাদের ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ক্ষেত্র বিশেষে ও কদাচিৎ আইনগত জটিলতা দূর করার জন্য কোনো শরিয়ত অনুমোদিত কৌশল অবলম্বন করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এমন কোনো কৌশল যা অবলম্বন করার কারণে শরিয়তের উদ্দেশ্যই তিরোহিত হয়ে যায় তার অনুমতি দেওয়া কোনোভাবেই সংগত হতে পারে না।

বাস্তব কথা হলো ইসলামে যে প্রকারের অর্থব্যবস্থা কাম্য তা কখনোই Mark up এর প্রলেপ দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। এজন্য কেবল আইনগত প্রলেপ নয়, বরং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য করতে হবে যে, তারা যেন শিরকাত (অংশীদারত্বমূলক বাণিজ্য) ও মুদারাবার ভিত্তিতে নিজেদের কর্ম পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে হিসাব-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে এবং ট্যাক্স ও বিশেষ করে ইনকাম ট্যাক্সের বিদ্যমান নিয়ম-কানুনে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। আর এর মাধ্যমে এসব নিয়ম-কানুন ধর্মহীনতা ও ঘুষখোরির দাওয়াত দেওয়ার পরিবর্তে লোকদের মধ্যে আমানতদারি, দীনদারি এবং দেশ ও জাতির সেবা করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেবে। আর বিশেষভাবে এই মন-মানসিকতার অপনোদন করতে হবে যে, আমি কোনোরূপ লোকসানের ঝুঁকি না নিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রতিটি টাকার মুনাফা লাভ করবো।

এজন্য আমরা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই আবেদন করছি যে, যখন আপনারা সুদের অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার পবিত্র উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, আর আপনাদের উদ্যোগ ও প্রত্যয়ে সংশয় পোষণ করার কোনো কারণ নেই; আর এই ময়দানে আপনারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতেও প্রস্তুত আছেন, তাই আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজটি কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে না করুন। কেননা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব এ জাতীয় মহৎ কাজে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিবর্তে আপনারা পূর্ণ হিম্মত ও সাহসিকতা নিয়ে একাগ্রচিত্তে ওইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করুন যেগুলো এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য জরুরি। সবেমাত্র সুদমুক্ত কাউন্টারসমূহের অভিযাত্রার সূচনা। এই অবস্থায় এর ক্ষতিকর দিকগুলো সংশোধন করা অধিকতর সহজ। সময় যতই

অতিক্রান্ত হবে এর জটিলতাও চরম আকার ধারণ করতে থাকবে। পরে আর ইচ্ছা করলেও সংশোধনী আনয়ন করা সহজসাধ্য হবে না। তাই আমাদের দৃষ্টিতে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। সেই পদক্ষেপগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি—

১. সুদমুক্ত ব্যবসার মূলভিত্তি Mark up বা সাধারণ বাজার দরের চেয়ে অধিক মূল্যের পরিবর্তে লাভ লোকসানের বণ্টন নীতির ওপর রাখতে হবে।

২. যেসব অবস্থায় Mark up এর পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই সেখানে এর শরয়ি শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ, মূল্য আদায়ে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহলে এর শতকরা হারে যে বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বিলুপ্ত করতে হবে। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি অনুমোদিত নয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিষয়টিও স্পষ্ট করতে হবে যে, Mark up পদ্ধতির ভিত্তিতে বিক্রয়াধীন পণসামগ্রীকে ব্যাংকের কবজায় এনে বিক্রয় করা হবে।

৩. বিল অফ এক্সচেঞ্জের লেনদেনের জন্য Mark up পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ওই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা ইসলামি নজরিয়াতি কাউন্সিল পেশ করেছে।

৪. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখন পর্যন্ত সুদমুক্ত কাউন্টারে টাকা-সঞ্চয়কারীদের বলা হয়নি যে, লভ্যাংশ অর্জিত হলে শতকরা কত হারে তারা মুনাফা পাবেন। অর্থাৎ, এ বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, ব্যাংক লভ্যাংশের কত অংশ রাখবে আর অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কত অংশ প্রদান করবে? এর পরিবর্তে সুদমুক্ত কাউন্টারের প্রসপেক্টাসে বলা হয়েছে, শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশের শতকরা কত হার দেওয়া হবে তা ব্যাংক নির্ধারণ করবে। এই পদ্ধতিটিও শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়। যখন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সঙ্গে শিরকাত বা শরিকানা কারবারের চুক্তি করা হচ্ছে তখন চুক্তি সম্পাদন করার সময়ই এ বিষয়টি ধার্য হয়ে যাওয়া সমীচীন যে, লভ্যাংশ অর্জিত হলে ব্যাংক শতকরা হারে কত অংশ পাবে এবং শেয়ার হোল্ডার কত অংশ পাবে? অন্যথায় লভ্যাংশ প্রাপ্তির হারটি অজ্ঞাত থাকার কারণে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ লেনদেনটি সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো ইতোমধ্যেই যেসব ভদ্রলোক চলমান আইনের আওতায় সুদমুক্ত কাউন্টারে নিজেদের অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেছেন, তারা যে লভ্যাংশ পাবেন তার শরয়ি বিধান কী? আর যেসব মহান ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ সুদের অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিয়েছেন, তারা ভবিষ্যতে এসব কাউন্টারে নিজেদের নগদ টাকা সঞ্চয় করতে পারবে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আরজ, সুদমুক্ত কাউন্টার এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার যে বিশদ বিবরণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার নিরিখে বলা যায় যে, এর কারবার তিন প্রকারে বিভক্ত—

এক. প্রথম প্রকারটি স্পষ্টভাবেই জায়েজ। অর্থাৎ, যেসব টাকা সাধারণ কোম্পানিসমূহের অনগ্রাধিকার যোগ্য শেয়ার অথবা এনআইটি ক্রয় করার মধ্যে বিনিয়োগ করা হয় অথবা অন্য এমন কোনো কারবারে লাগানো হয় যার মধ্যে শিরকাত (শরিকানা কারবার) ও মুদারাবা-এর ভিত্তিতে টাকা উসুল করা হয় এগুলোর মধ্যে মুনাফা অর্জিত হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে হালাল।

দুই. দ্বিতীয় প্রকারটি স্পষ্টভাবেই নাজায়েজ। অর্থাৎ, ইমপোর্ট বিলসমূহের ক্ষেত্রে Mark up-এর যে পদ্ধতি স্কিমে উল্লেখ করা হয়েছে—নির্ধারিত সময়ে টাকা পরিশোধ করা না হলে Mark up-এর হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে—এটি স্পষ্টভাবে নাজায়েজ। এই কারবার থেকে অর্জিত লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে হালাল হবে না। অনুরূপভাবে দেশীয় বিলসমূহের ক্ষেত্রে মার্ক ডাউন পদ্ধতির অনুকরণ করে মূল্য কেটে যে মুনাফা হাসিল করা হয় তাও শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

তিন. তৃতীয় প্রকারটি হলো : লাভ অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ হওয়া। অর্থাৎ, ইমপোর্ট বিলসমূহ ছাড়া অন্যান্য খাতের যেখানে Mark up পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেখানকার অবস্থাটি পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এখানেও মুনাফা গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো এখানেও মূল্য পরিশোধে বিলম্ব ঘটার কারণে Mark up val-এর হার বাড়ানো হয়। অথচ স্পষ্টভাবে এ বিষয়টির উল্লেখ স্কিমে নেই। আবার তাতে বিষয়টি খণ্ডনও করা হয়নি। আর দ্বিতীয় কারণ হলো ব্যাংক যে পণ্যসামগ্রী Mark up valo -এর ওপর ভিত্তি করে ক্রয় করছে তাতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বিক্রয় করে দিচ্ছে। যদি এখানে এ দুটি কারণের কোনো একটি না

থাকে, তাহলে ইসলামি ফিকহের দৃষ্টিতে তা থেকে অর্জিত মুনাফা লাভ করার অবকাশ থাকবে।

এভাবে আলাদা করে আলোচনা করার কারণে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সাম্প্রতিক কালে সুদমুক্ত কাউন্টারসমূহের কারবার জায়েজ এবং নাজায়েজ লেনদেনসমূহের দ্বারা মিশ্রিত। আর এগুলোর কোনো কোনো অংশ সন্দেহযুক্ত। এজন্য যতদিন পর্যন্ত এসব অপূর্ণাঙ্গতা ও অসম্পূর্ণতার সংশোধন করা না হবে ততদিন পর্যন্ত তার মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশকে হালাল বলা যাবে না এবং মুসলিমদের জন্য এ জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করা জায়েজ হবে না। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

রাষ্ট্র ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট চালু করলে তার শরয়ি বিধান জানার জন্য এক ব্যক্তি দারুল উলুম করাচির দারুল ইফতায় একটি প্রশ্নপত্র পাঠায়। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) 'ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান' শিরোনামে সেই প্রশ্নের একটি বিস্তারিত জবাব লিপিবদ্ধ করেন। পাঠকের খেদমতে আমরা এখন সেটি পেশ করছি।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান

প্রশ্ন : এ মাসআলার ব্যাপারে শরয়ি বিধিবিধান সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আলেমগণ কী অভিমত ব্যক্ত করেন, যেসব লোক দেশের বাইরে কর্মরত থাকেন এবং সেই দেশ থেকে ফিরে আসার সময় নিজেদের উপার্জিত মুদ্রা নিয়ে আসেন। তাদের জন্য রাষ্ট্র ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট নামে একটি স্কিম চালু করেছে যার মাধ্যমে তারা দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা মুদ্রার বিনিময়ে একটি সার্টিফিকেট লাভ করেন। এই সার্টিফিকেটের বাহক একে স্টক এক্সচেঞ্জে মুনাফা লাভের মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া খোদ পাকিস্তানি ব্যাংকেও একে এক বছর পর শতকরা ১৪.৫০ টাকা, দুই বছর পর শতকরা ৩১ টাকা এবং তিন বছর পর শতকরা ৫২ টাকা সুদ বা মুনাফায় বিক্রয় করতে পারে। আর যদি সে চায় তাহলে এর মাধ্যমে যখন তখন দেশীয় টাকাও উত্তোলন করতে পারে।

আমাদের জানার বিষয় হলো এ জাতীয় সার্টিফিকেট ক্রয় করা এবং এর মুনাফা হাসিল করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে এর এই বাস্তবতা আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি পাকিস্তান ভিন্ন অন্য কোনো দেশে চাকরি করে সে যদি ওই দেশের মুদ্রা নিয়ে দেশে আসে,

তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন হলো সে ওই দেশীয় মুদ্রা স্টেট ব্যাংকে জমা করবে এবং এর বিনিময়ে রাষ্ট্রকর্তৃক ধার্যকৃত মূল্য অনুযায়ী পাকিস্তানি টাকা উসুল করে নেবে। পাকিস্তানে অবস্থান করা অবস্থায় অন্য দেশের মুদ্রা নিজের কাছে রাখা আইনত দণ্ডনীয়। আর যখন এই মুদ্রা একবার স্টেট ব্যাংকে জমা করে দেওয়া হয় তখন এরপর আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আইনগতভাবে সম্ভব নয়। এখন রাষ্ট্র এই ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট এই উদ্দেশ্যে চালু করেছে যে, যে ব্যক্তি অন্য দেশ থেকে মুদ্রা এনে এর বিনিময়ে সার্টিফিকেট গ্রহণ করবে তার তিনটি উপকার অর্জিত হবে।

১. সার্টিফিকেট বাহকের প্রথম উপকার এই অর্জিত হয় যে, সে সার্টিফিকেট দেখিয়ে ওই দিনের বাজার দর অনুযায়ী যে-কোনো দেশের মুদ্রা উসুল করতে পারে।

২. সার্টিফিকেট বাহকের দ্বিতীয় উপকার এই হয়, যদি কোনো ব্যক্তি সারা বছর এই সার্টিফিকেট নিজের কাছে রাখে, তাহলে শতকরা ১২.৫০% মুনাফা লাভ করার মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রায় তা ভাঙাতে পারে।

৩. সার্টিফিকেট বাহকের তৃতীয় উপকার হলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে অথবা যে-কোনো সময় সে একে স্টক এক্সচেঞ্জে যে-কোনো মূল্যে বিক্রয় করে দিতে পারে।

যেহেতু এই সার্টিফিকেটের কারণে তার বাহকের জন্য মুদ্রা অর্জন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাই স্টক এক্সচেঞ্জে একে ব্যাপকভাবে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। যেমন : একশো টাকা দামের সার্টিফিকেট একশো দশ টাকায় বা এর কম বেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এজন্য শরয়ি দৃষ্টিকোণে এর পদ্ধতি দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ—

রাষ্ট্র বিদেশ থেকে আগত মুদ্রাকে পাকিস্তানি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছে। কিন্তু সে পাকিস্তানি টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করার পরিবর্তে একে নিজের দায়িত্বে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর নিজের ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সার্টিফিকেট চালু করেছে। এর মাধ্যমে সার্টিফিকেটের বাহককে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে সে যদি চায়, তাহলে ঋণকে পাকিস্তানি টাকার আকারে উসুল করে নেবে কিংবা ইচ্ছা করলে আদায় করার তারিখের বাজার দর অনুসারে যে-কোনো দেশের মুদ্রাও উসুল করতে পারবে।

মোটকথা, এই সার্টিফিকেট বাহকের ওই পাকিস্তানি টাকার প্রমাণ পত্র যা রাষ্ট্রের দায়িত্বে ঋণ। এখন যদি রাষ্ট্র এক বছর পর এই একশো টাকা মূল্যের প্রমাণ পত্রের দাম একশো বারো টাকায় পরিশোধ করে, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় সে তার ঋণের ওপর শতকরা সাড়ে বারো টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। আর এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে স্পষ্ট সুদ। অনুরূপভাবে বাহক যদি এই সার্টিফিকেট স্টক এক্সচেঞ্জে তার আসল মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় করে, তাহলেও এর অর্থ এটিই যে, সে তার প্রাপ্য ঋণকে অন্যের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় করছে। এই লেনদেন সুদ হওয়ার কারণে নাজায়েজ।

এখানে এই সংশয় পোষণ করা যাবে না যে, এই সার্টিফিকেট বৈদেশিক মুদ্রার রশিদ। আর এ কারণে একে পাকিস্তানি টাকায় ধার্যকৃত যে-কোনো মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ হওয়া চাই। কেননা, এই সার্টিফিকেট বৈদেশিক মুদ্রার রশিদ নয়। এর একটি প্রমাণ হলো এই সার্টিফিকেটের গায়ে বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে স্পষ্টভাবে পাকিস্তানি টাকার নাম লেখা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে যখন মুদ্রা গ্রহণ করা হবে তখন এত পরিমাণ মুদ্রা লাভ করা যাবে না যার বিনিময়ে এই সার্টিফিকেট লাভ হয়েছিলো। বরং বিনিময়ের দিন বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমান অনুযায়ী মুদ্রা দেওয়া হবে। যেমন : কোনো ব্যক্তি পঁচিশ রিয়াল (সৌদিয়ান মুদ্রা) দিয়ে একশো টাকা দামের একটি সার্টিফিকেট লাভ করেছে এবং ছয় মাস পর যখন রিয়ালের মূল্য কিছুটা বেড়ে গেছে তখন তাকে এত পরিমাণ রিয়ালই দেওয়া হবে যত পরিমাণ রিয়াল ওইদিন পাকিস্তানের একশো টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। যেমন : ওই দিনের বিনিময় হার অনুযায়ী যদি ২৩ রিয়াল ক্রয় করা যায়, তাহলে তাকে ২৩ রিয়ালই দেওয়া হবে। সুতরাং এটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, এই সার্টিফিকেট রিয়াল প্রাপ্তির প্রমাণপত্র নয়, বরং পাকিস্তানি টাকা প্রাপ্তির প্রমাণপত্র।

ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট এই ধারণায় ক্রয় করা হয় যে, একে অধিক মূল্যে স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রয় করা হবে কিংবা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছ থেকে শতকরা ১২% মুনাফা লাভ করা হবে। সুদি লেনদেন হওয়ার কারণে এটি অকাট্যভাবে নাজায়েজ ও হারাম। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি এই উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট ক্রয় করে যে, প্রয়োজনের সময় সে এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে এবং তাকে স্টক এক্সচেঞ্জে

বিক্রয় করা বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করার কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এ উদ্দেশ্যে একে ক্রয় করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ক্রয় করার পর একে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা বা এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি
দারুল ইফতা, দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান
২২. ০৮. ১৪০৮ হি.

কয়েকটি সন্দেহের অবসান

(ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের ব্যাপারে মাসিক আল বালাগে যখন পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করা হয় তখন জনৈক ব্যক্তি একে পর্যালোচনা করে বিস্তারিতভাবে একটি পত্র লেখেন। এরপর শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) এই পত্রের বিস্তারিত জবাব দেন। ওই ব্যক্তির পত্র এবং মাওলানার জবাব পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো।)

জনাব,

মাওলানা মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রায় এক বছর যাবৎ নজিবুল হক সিদ্দিকি সাহেবের অনুগ্রহে মাসিক আল বালাগ পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। আপনার লেখাগুলো খুবই আগ্রহ সহকারে পাঠ করি। এর ফলে দিন দিন আপনার জ্ঞানের গভীরতা, লেখনীর জোর ও লেখার ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারছি না। মহান আল্লাহ আপনার কলমকে আরও ক্ষুরধার করে দিন। আমিন।

মাসিক আল বালাগ ১৪০৮ হিজরি মোতাবেক, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন সংখ্যায় ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট বিষয়ে আপনার অনুসন্ধানী লেখা ও অভিমত আমি পাঠ করেছি। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য উপাত্ত আপনার সামনে তুলে ধরছি—

এক. পাকিস্তানের প্রবাসী কোনো নাগরিক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তার সঙ্গে আনীত সে দেশের মুদ্রা রাষ্ট্রের কাছে জমা করতে হবে মর্মে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। পাকিস্তান দীর্ঘদিন যাবৎ এই অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী পাকিস্তানী ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত নিজের কাছে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারবে। এরপর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে এই সময় বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, বিগত বছর যখন এই ফরেন কারেন্সি সার্টিফিকেট চালু করা হয় তখন সার্টিফিকেট ক্রয়কারী প্রতিটি ব্যক্তি এ ব্যাপারে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন রাষ্ট্রকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করবে না, বরং নিজের কাছে রেখে দেবে। আর যেসব লোক এসব সার্টিফিকেট ক্রয় করতো তাদের দৃষ্টি হয়তো অধিকহারে মুনাফা লাভ করার প্রতি আবদ্ধ ছিলো কিংবা তারা নিজের সার্টিফিকেট স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রয় করে রাষ্ট্রকর্তৃক ধার্যকৃত মুনাফার চেয়ে অধিক মুনাফা লাভ করার প্রত্যাশী ছিলেন।

দুই. ‘সার্টিফিকেটের বাহক যখন চায় তখন এর মাধ্যমে যে-কোনো দেশের মুদ্রা বিনিময়ের দিনের মূল্যের ভিত্তিতে উসুল করতে পারে।’ এই কথাটি কোনো ক্ষেত্রে সঠিক। কেননা, বাহককে এই মুদ্রা ভিনদেশ থেকেই পেতে হবে। কিন্তু সে যদি এর মাধ্যমে দেশের ভিতর ফরেন কারেন্সি একাউন্ট খুলতে চায়, তাহলে তাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে না। অবশ্য আগে থেকেই যে বাহকের ফরেন কারেন্সি একাউন্ট রয়েছে সে এই সার্টিফিকেট একাউন্টে জমা বা সঞ্চয় করতে পারে।

তিন. যদিও এটি সত্য যে, রাষ্ট্র বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তির মুদ্রা পাকিস্তানি টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবে তা আদায় করার পরিবর্তে নিজের জিম্মায় একে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছে কিন্তু বিক্রেতা বর্তমানের পরিবর্তে ভবিষ্যতের টাকায় এবং বাজার দরের চেয়ে কম রেটে গ্রহণ করার জন্য কেবল এ কারণে প্রস্তুত হচ্ছে যে, সে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। (অথচ মুদ্রামানের মূল্যস্ফীতির কারণে এর মূল্য দিন দিন কমে যাচ্ছে।)

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী কেবল একমাত্র Floating rate-ই প্রকৃত বিনিময়-মূল্য হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নির্ধারণকৃত রেটে কারেন্সির

সঠিক মূল্য প্রতিফলিত হয় না। এখন রাষ্ট্র যদি কৃত্রিমভাবে ফরেন কারেন্সির পরিবর্তে কম মূল্য প্রদান করে, তাহলে বাজারে তার প্রিমিয়াম বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজ রাষ্ট্র যদি জবরদস্তি করে ডলারের মূল্য দশ টাকা ধার্য করে, তাহলে মার্কেটে ডলার শতকরা দশ টাকা অধিহারের (বর্তমান) পরিবর্তে শতকরা ৯০ কিংবা শতকরা একশো অধিহারের ওপর বিক্রয় হবে যা তার প্রকৃত মূল্যমান।

আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে রাষ্ট্র যখন ডলারের বিনিময় হার ১৪.৭৫ টাকা নির্ধারণ করেছিলো তখন চৌদ্দ টাকায় বাজারে ডলার পাওয়া যেতো এবং খোদ রাষ্ট্র চৌদ্দ টাকার মূল্যকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই বোনাস ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে Support করে যাচ্ছিলো। বিভিন্ন কারেন্সির মধ্যে একটি অন্যটির মোকাবিলায় সেগুলোর দরে উত্থান-পতন ঘটতে থাকে। এটি মূলত এসব দেশে মুদ্রামানের মূলস্ফীতি এবং সুদের শতকরা হারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি function। কিন্তু যেসব দেশে কারেন্সির মূল্য ওঠানামার মধ্যে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই অথবা রাষ্ট্র যেখানে কৃত্রিমভাবে মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্ধারণ করে না সেখানে খোলাবাজারের রেট ও সরকারি রেটের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। কেননা, উভয় হার স্থানীয় কারেন্সির স্বকীয় মূল্যকে (Intrinsic value) প্রকাশ করে থাকে।

এখানে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফিকহি দৃষ্টিকোণে কোনো রাষ্ট্রের জন্য এই অধিকার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সে বিদেশে উপার্জিত জনসাধারণের কারেন্সির কম মূল্য প্রদান করবে? কাস্টম, পুলিশ, আদালতসমূহ ও ইনকাম ট্যাক্সের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তাদেরকে লুণ্ঠন করার জন্য প্রস্তুত থাকে। রাষ্ট্র যদি বৈদেশিক মুদ্রার কম মূল্য প্রদান করে, তাহলে জনসাধারণ এ বিষয়ের কতটুকু স্বাধীনতা রাখে যে, তারা নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত মূল্য (Intrinsic value) বাজার থেকে অর্জন করবে। বিশেষত, এই রাষ্ট্রই যখন খোলাবাজারে মুদ্রা বিক্রয়কে আইনগতভাবে বৈধতা দান করে?

চার. তাহকিক করার সময় অবশ্যই এ বিষয়টিও মহোদয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, হুন্ডি ব্যবসার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার লোকসান দিয়ে যাচ্ছিলো। কেননা, জনসাধারণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত

হার ছেড়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টাকা-পয়সা পাঠিয়ে যাচ্ছিলো। বেয়ারার ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট চালু করে এবং সেগুলো স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রয় করাকে আইনত বৈধতা দান করে মূলত সরকার হুন্ডি ব্যবসায় চপেটাঘাত করেছে এবং এ বিষয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যাতে লোকজন নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রার সঠিক মূল্য লাভ করতে পারে। (আমি কেবল এক বছর যাবৎ মাসিক আল বালাগ নিয়মিত পড়ছি। এজন্য আমি জানি না, হুন্ডির ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী? এ ব্যাপারেও অবহিত করার অনুরোধ রইলো।)

উক্ত আলোচনার নিরিখে এটি কী বলা যায় যে, সার্টিফিকেটটি খোলাবাজারে বিক্রয় করার মাধ্যমে শতকরা দশ বা বারো টাকার যে মুনাফা অর্জিত হয় তা জায়েজ ফরেন কারেন্সির প্রকৃত মূল্য হবার কারণে? ঠিক এমনিভাবে, যেমনিভাবে কোম্পানির শেয়ার ইত্যাদি বাজারে সমমূল্যের চেয়ে অধিক কিংবা কম মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। অবশ্য এ বিষয়ে পুরোপুরি ঐকমত্য পোষণ করা যায় যে, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই সার্টিফিকেটের ওপর শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে যে মুনাফা দেওয়া হয় তা সুদি লেনদেন হওয়ার কারণে অকাট্যভাবে হারাম ও নাজায়েজ।

লেখার শেষ দিকে মুহতারাম এই অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে এ সার্টিফিকেট ক্রয় করে যে, প্রয়োজনের সময় সে এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে, তাহলে তার জন্য এর অবকাশ রয়েছে। এই অনুমতিটিও সাধারণ লোকদের জন্য সমস্যা বয়ে আনতে পারে। যেমন : কোনো ব্যক্তি পাকিস্তানে আসার পর যদি কেবল এ উদ্দেশ্যেই এই সার্টিফিকেট গ্রহণ করে যে, প্রয়োজনের সময় সে এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে, কিন্তু তিন বছর পর যখন সে এর বিনিময়ে মুদ্রা গ্রহণ করতে চায় তখন একলক্ষ টাকার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে একলক্ষ বায়ান্ন হাজার প্রাপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে এই বায়ান্ন হাজার টাকা সুদ। এই ব্যক্তির জন্য এই সুদ না নিয়েও কোনো উপায় নেই। কেননা, রাষ্ট্র তাকে এই টাকা জোরপূর্বকভাবে দিয়ে দেবে। এ অবস্থায় সে সুদ গ্রহণ করার গুনাহে কি গুনাহগার হবে না? অপারগ অবস্থায় সে কি এই বায়ান্ন হাজার টাকা দান করে দেবে নাকি সে যে পরিমাণ ফরেন কারেন্সি রাষ্ট্রকে প্রদান করেছিলো

সেই পরিমাণ ফরেন কারেন্সি গ্রহণ করে বাকিগুলো সদকা করবে? কিন্তু এই অবস্থায় টাকার মূল্য কমে যাওয়ার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা কি সে সুদ থেকে পূর্ণ করতে পারবে?

উত্তর প্রত্যাশী

—মুনাসসিম মাসউদ

মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর জবাব

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

জনাব, আপনার পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। কিন্তু পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে যতটুকু একাগ্রতা প্রয়োজন ছিলো অতীত দিনগুলোতে তা আমার ছিলো না। এজন্য জবাব দিতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করছি।

আপনি বিস্তারিতভাবে ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের পুরো প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিদেশ থেকে পাকিস্তানে মুদ্রা নিয়ে আসার ব্যাপারে যে আইনগত বাধ্য-বাধকতা রয়েছে এবং যে কারণে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীগণকে প্রচুর কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এর কিছুটা ধারণা আগে থেকেই আমার ছিলো। আপনার বিস্তারিত বিবরণের কারণে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এসব কারণে ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের বর্তমান শরয়ি বিধানে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। এসব সমস্যার আসল সমাধান হলো রাষ্ট্র এসব মুদ্রা বাজারমূল্যে গ্রহণ করবে। অথবা শরয়ি দৃষ্টিকোণে এ বিষয়েরও অবকাশ হতে পারতো যে, রাষ্ট্র এসব সার্টিফিকেটকে পাকিস্তানি টাকার নয়, বরং সেসব বৈদেশিক মুদ্রার প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে যে মুদ্রা রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যদি এই সার্টিফিকেট মুদ্রার প্রতিনিধি হয়, তাহলে এর মর্ম এই দাঁড়ায় মুদ্রাই হলো রাষ্ট্রের দায়িত্বে ঋণ। এরপর রাষ্ট্র পরবর্তী যে-কোনো সময় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ধার্যকৃত মূল্যে ক্রয় করতে পারবে এবং এই মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশিও হতে পারবে। আর বিকল্প হিসেবে এটিও সম্ভব যে, সার্টিফিকেটের বাহক একে বাজারে হস্তান্তর করে এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে পাকিস্তানি টাকা অর্জন করবে।

কিন্তু শরয়ি দৃষ্টিকোণে সমস্যা এখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে, এই সার্টিফিকেটকে বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে পাকিস্তানি টাকার প্রমাণপত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্র বৈদেশিক মুদ্রাকে সরকার-নির্ধারিত মূল্যে পাকিস্তানি টাকায় ক্রয় করেছে এবং পাকিস্তানি টাকার পরিবর্তে এই সার্টিফিকেট চালু করেছে। এখন বৈদেশিক মুদ্রা এই ব্যক্তির মালিকানায় নেই যার ওপর ভিত্তি করে উল্লিখিত দুই পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে এর বিক্রয় সম্ভব হতে পারে।

রইলো এ বিষয়টি যে, বর্তমান অবস্থায় স্টক এক্সচেঞ্জের ভিতর শতকরা যে দশ বা বারো পার্সেন্ট মুনাফা অর্জিত হয় তা মুদ্রার প্রকৃত মূল্য হওয়ার ওপর ভিত্তি করে জায়েজ হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়টি দুটি কারণে সম্ভব নয়।

প্রথমত, এই সার্টিফিকেট বৈদেশিক মুদ্রার নয়, বরং পাকিস্তানি টাকারই মূল্যমান। কেননা, সার্টিফিকেটটি পাকিস্তানি টাকার প্রমাণপত্র। আর টাকার আদানপ্রদান তার সমশ্রেণির সাথে করার ক্ষেত্রে তাতে কম বেশি করা জায়েজ নেই।

দ্বিতীয়ত, বাজারে এই সার্টিফিকেটের ওপর শতকরা যে দশ বা বারো পার্সেন্ট মুনাফা অর্জিত হয় তা পুরোপুরিভাবে সরকারি এবং বাজারি মূল্যের পার্থক্যের ওপর ভিত্তিশীল হয় না, এবং এই পার্থক্যের বরাবরও হয় না। যদি এই মুনাফা দশ বা বারো পার্সেন্ট হয়, তাহলে সরকারি বাজারি মূল্যের পার্থক্য সাধারণত এর চেয়ে কম হয়ে থাকে। এ কারণেই সার্টিফিকেটকে বাজারে বিক্রয় করার দ্বারা হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর চেয়ে বাহকের অধিক লাভ হয়।

এই বিবেচনায় আপনার এ অভিমতটি আমার কাছে সঠিক নয় যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে খোলাবাজারে এই সার্টিফিকেট বিক্রয় করার অনুমতি বাজার থেকে মুদ্রার সঠিক মূল্য লাভ করার অনুমতি দেওয়ার অনুরূপ।

এর বিপরীতে সঠিক অবস্থা এই যে, রাষ্ট্র যদিও মুক্তবাজারে বাজার দরে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করাকে আইনতভাবে নিষিদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অনুমতিও প্রদান করে রেখেছে যে, বৈদেশিক মুদ্রা সরকারের কাছে কম মূল্যে বিক্রয় করে এই মূল্যের ওপর ভিত্তি করে সুদি লেনদেন করে নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে।

এ বিষয়টি সঠিক যে, বৈদেশিক মুদ্রার সরকারি মূল্য তার বাজার দরের চেয়ে কম নির্ধারণ করা—যখন খোলাবাজারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ—এক ধরনের জুলুম ও অন্যায় সাধারণ অবস্থায় যার

অনুমতি নেই। কিন্তু রাষ্ট্র যদি একটি ভুল কর্ম করতে থাকে, তাহলে এর কারণে সুদি লেনদেনে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো প্রভাব পড়ে না, বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা নাজায়েজই থেকে যায়।

অবশ্য রাষ্ট্র যেহেতু সার্টিফিকেটের বাহকের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রাকে জোরপূর্বকভাবে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করেছে, তাই রাষ্ট্র যদি তাকে এক বছর পর সার্টিফিকেটের মূল্যে ১২% হারে মুনাফা প্রদান করে, তাহলে যদিও এই মুনাফা গ্রহণ করা সুদ কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার জন্য এ পরিমাণ টাকা রেখে দেওয়ার অবকাশ আছে বলে মনে হয়, যে পরিমাণ টাকা সার্টিফিকেট ক্রয় করার দিন বৈদেশিক মুদ্রার সরকারি মূল্য ও বাজার দরের মধ্যে পার্থক্যের সমপরিমাণ হয়। যেমন : কোনো ব্যক্তি একশো ডলার দিয়ে ১৭০০ টাকা মূল্যের পাকিস্তানি সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। অথচ তখন তার বাজার মূল্য ছিলো ১৭৫০ টাকা। এ ক্ষেত্রে তাকে সরকারি জোর জবরদস্তির কারণে পঞ্চাশ টাকা লোকসান দিতে হয়েছে, যার ওপর সে সম্মত ছিলো না। এখন এক বছর পর রাষ্ট্র যদি তাকে সার্টিফিকেটের বিনিময়ে ২৪০০ টাকা প্রদান করে, তাহলে এই টাকাসমূহের মধ্য থেকে ৫০ টাকা যদি সে ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ হিসেবে উসুল করে নেয়, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এর অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু অন্য টাকাগুলোকে কোনোভাবেই ব্যবহার করার অনুমতি তার জন্য নেই।

কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জে সার্টিফিকেট বিক্রয় করে যদি ১২% মুনাফা লাভ হয়, তাহলে এর মধ্য থেকে পঞ্চাশ টাকা উসুল করার শরয়িভাবে অনুমতি নেই। এর কারণ হলো প্রথম অবস্থায় এই পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিপূরণ ওই পক্ষ থেকেই উসুল করা হচ্ছে যে এই ক্ষতি সাধন করেছিলো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় মুনাফা প্রদানকারী পক্ষ সে নয় যে পক্ষ এই ক্ষতি করেছিলো। এর উদাহরণ এরূপ : যদি আলিফ নাজায়েজ কোনো পন্থায় বায়েজিদের পঞ্চাশ টাকা লুট করে নেয়, এরপর এই আলিফই সুদের নামে তাকে নিজের পক্ষ থেকে ৫০ টাকা আদায় করে দেয়, তাহলে বায়েজিদের জন্য পঞ্চাশ টাকা সুদ হিসেবে নয়, বরং ক্ষতিপূরণ হিসেবে গ্রহণ করার অবকাশ আছে। কিন্তু জুনায়েদ যদি তার কোনো ঋণের ওপর ৫০ টাকা সুদ দেয়, তাহলে তার জন্য একে ব্যবহার করা এই কারণে জায়েজ হবে না যে, আলিফ তার পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি করেছিলো।

এই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আপনার সর্বশেষ প্রশ্নের সামাধানও হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো যদি কোনো ব্যক্তি কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট ক্রয় করে এবং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাষ্ট্র সুদ প্রদান করে, তাহলে তাকে কি করা উচিত? এর উত্তর হলো সে সার্টিফিকেটের আসল মূল্য (Face value) নিজের ব্যবহারে নিতে পারবে। এই মূল্যের চেয়ে এ পরিমাণ বেশিও গ্রহণ করার অনুমতি তার জন্য রয়েছে যা সার্টিফিকেট ক্রয় করার দিন (মুনাফা লাভ করার দিন নয়) তার আদায়কৃত মুদ্রার বাজারি মূল্য ও সরকার নির্ধারণকৃত মূল্যের সমপরিমাণ পার্থক্যের হয়। কিন্তু এর চেয়ে বেশি যে পরিমাণ টাকা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে তা নিঃসন্দেহে সুদ বলে গণ্য হবে। একে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েজ নেই, বরং তা থেকে জান বাঁচানোর নিয়তে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।

এখানে এটিও স্পষ্ট থাকা উচিত যা আপনি লিখেছেন যে, অপারগ অবস্থায় সে কি বায়ান্ন হাজার টাকা দান করে দেবে নাকি যত পরিমাণ ফরেন কারেন্সি সে রাষ্ট্রকে প্রদান করেছিলো এত পরিমাণ নিয়ে বাকিগুলো সদকা করে দেবে?

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, যে পরিমাণ ফরেন কারেন্সি সে রাষ্ট্রকে প্রদান করেছিলো সে পরিমাণ নেওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। বরং এই ফরেন কারেন্সি দেওয়ার সময় তার বাজার মূল্য সার্টিফিকেটের আসল মূল্যের (Face value) চেয়ে যে পরিমাণ অতিরিক্ত ছিলো কেবল সে পরিমাণ উসুল করার অবকাশ আছে। এর চেয়ে বেশি নয়। আর নিঃসন্দেহে সতর্কতা এর মধ্যে যে, আসল মূল্য (Face value) রেখে দিয়ে বাকিটুকু সদকা করে দেওয়া হবে।

এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা সংগত যে, এই টাকা দান করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে, বরং একে জাকাতের হকদার ব্যক্তিদের দান করতে হবে। অবশ্য এই টাকা নিজের পিতা, ছেলে, স্বামী ও স্ত্রীকেও দেওয়া যায়। তবে শর্ত হলো তারা জাকাত খাওয়ার হকদার হতে হবে।

পরিশেষে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আপনি এক জায়গায় মূল্যস্ফীতি ঘটার ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্যমান কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা মনে হয়, আদায় করার ক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্যমান কমে যাওয়ার প্রতিও লক্ষ রাখা চাই। শরয়ি দৃষ্টিকোণে করজ এবং অন্যান্য অবশ্য প্রদেয় ঋণের লেনদেনে মূল্যস্ফীতির হারের বিবেচনা করা হয় না, এজন্য আদায় করার সময় এ বিষয়টির

প্রতি লক্ষ রাখা যায় না। এই মাসআলার পূর্ণাঙ্গ তাহকিক আমি একটি বিস্তারিত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছি যা অচিরেই মাসিক 'আল বালাগে' প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

দুয়ায় স্মরণ রাখবেন বলে আশা করি। ওয়াস্‌সালাম।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি
০৩-১২-১৪০৮ হি.।

নির্বাচন ও ভোটের শরয়ি অবস্থান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

নির্বাচন ও ভোটের শরয়ি অবস্থান

বর্তমান যুগের নষ্ট রাজনীতি নির্বাচন ও ভোট শব্দ দুটিকে এতটাই কলুষিত করে দিয়েছে যে, শব্দদ্বয়ের সঙ্গে ধোকা, প্রতারণা, মিথ্যা, ঘুষ ও প্রবঞ্চনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এজন্যই অধিকাংশ ভদ্রলোক এই ঝামেলায় জড়ানোকে সংগত মনে করেন না। আর এই ভুল ধারণাও মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, নির্বাচন ও ভোটের রাজনীতির সঙ্গে দীন ও ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে বেশ কিছু ভুল ও ভ্রান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখানে আমরা সেগুলোর অপনোদন জরুরি মনে করছি।

শরয়ি দৃষ্টিকোণে ভোট দেওয়া জরুরি

প্রথম ভুল ধারণা সহজ-সরল লোকদের মধ্যে তাদের স্বভাবজাত ভদ্রতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ততটুকু ভয়াবহ নয়; এর পরিণাম যতটুকু ভয়াবহ। ভুল ধারণাটি এই যে, আজকের রাজনীতি ধোঁকা ও প্রতারণার রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাই ভদ্র লোকদের জন্য রাজনীতির ময়দানে পা রাখা সমীচীন নয়। নির্বাচনে দাঁড়ানোও কাম্য নয় এবং ভোট দেওয়ার ঝক্কি ঝামেলায় জড়ানোও বাঞ্ছনীয় নয়।

এই ভুল যত নেক নিয়তের ওপরই ভিত্তিশীল হোক না কেনো সর্বাবস্থায় তা ভুল এবং দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। অতীতের দিনসমূহে আমাদের রাজনীতি নিঃসন্দেহে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী লোকদের হাতে জিম্মি ছিলো। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কিছু সভ্য ও অভিজাত লোক একে পবিত্র করার মানসে সামনে অগ্রসর না

হবে, রাজনীতির নষ্টামি ও কদর্যতা দিনদিন বেড়েই চলবে। আর এভাবে একদিন এই অপবিত্রতা তাদের ঘরেও পৌঁছে যাবে। তাই ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার দাবি এই নয় যে, দূর থেকে রাজনীতির নষ্টামি ও কদর্যতার নিন্দা-মন্দ বলা হবে, বরং বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার দাবি হলো রাজনীতির ময়দানকে এসব লোকের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হবে যারা দিন দিন একে কলুষিত ও অপবিত্র করেই চলেছে।

আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ.

'মানুষ যখন জালেম কোনো ব্যক্তিকে জুলুম করতে দেখবে তখন তারা যদি সেই ব্যক্তির হাত ধরে জুলুম থেকে নিবৃত্ত না করে, তাহলে এটি বিচিত্র নয় যে, মহান আল্লাহ তাদের ওপর ব্যাপকভাবে আজাব নাজিল করবেন।'[২২০]

আপনি যদি চোখের সামনে জুলুম হতে দেখেন এবং নির্বাচনে অংশ নিয়ে কিছুটা হলেও এই জুলুমে হ্রাস ঘটাতে পারেন, তাহলে এই হাদিসের আলোকে আপনার জন্য অপরিহার্য হলো চুপ করে বসে না থেকে জালেমের হাতে ধরে তার জুলুমকে প্রতিহত করার যথাসাধ্য প্রয়াস চালানো।

বহু দীনদার লোক মনে করেন, আমরা যদি ভোট না দিই তাহলে কী এমন ক্ষতি হবে? কিন্তু মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন শুনুন, সাহল ইবনু হুনাইফ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ (١) عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যদি কোনো ব্যক্তির সামনে অপর কোনো মুমিন ব্যক্তিকে অপদস্থ করা হয় আর সেই ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাহায্য না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টজীবের সামনে অপদস্থ করবেন।'[২২১]

---

[২২০] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩৩৮।

[২২১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৫৯৮৫।

ভোট না দেওয়া হারাম

শরয়ি দৃষ্টিকোণে ভোটের অবস্থান সাক্ষ্যদানের। আর যেমনিভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া নাজায়েজ ঠিক তেমনিভাবে প্রয়োজনের সময় সাক্ষ্য গোপন করাও নাজায়েজ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.

'আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করবে তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে।'[২২২]

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ.

'সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হলে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে।'[২২৩]

সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ইসলাম এ বিষয়কে পছন্দ করেছে যে, কেউ আবেদন করার আগেই সাক্ষ্য প্রদান করে মানুষ নিজের দায়িত্ব পালন করবে। আর এ ক্ষেত্রে সে কারও দাওয়াত বা ডাকাডাকির অপেক্ষা করবে না। জায়েদ ইবনু খালিদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.

'আমি কি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যদাতার কথা বলবো না যে তার কাছে সাক্ষ্য জিজ্ঞেস করার আগেই সাক্ষ্যপ্রদান করে।'[২২৪]

নিঃসন্দেহে ভোট একটি সাক্ষ্যতুল্য। কুরআন সুন্নাহর উপরিউক্ত বিধানাবলি এর ওপর প্রয়োগ হতে পারে। এজন্য ভোটপ্রদানে বিরত থাকা দীনদারির পরিচায়ক নয়, বরং অধিক পরিমাণে একে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ। এ বিষয়টিও দুর্ভাবনার যে, যদি শরিফ, দীনদার ও ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের মানুষগুলো নির্বাচনের সকল তৎপরতা থেকে পুরোপুরিভাবে বিরত

---

[২২২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৩।

[২২৩] মুজামুল আওসাত তাবারানি, হাদিস : ৪১৬৭, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৩।

[২২৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৪৯৪, ১৭১৯।

থাকে, তাহলে এর অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তারা রাজনীতির পুরো ময়দান দুষ্ট প্রকৃতির ও ফেতনাবাজ লোকদের হাতে অর্পণ করেছে? এ অবস্থায় কখনো আশা করা যায় না যে, রাষ্ট্রক্ষমতা কখনো সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের হাতে আসবে। যদি দীনদার ব্যক্তিগণ রাজনীতি থেকে এতটুকু সম্পর্কহীন হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য দেশের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের ব্যাপারে মুখ খোলা বা অভিযোগ করার অধিকার থাকে না। ফলে এর জিম্মাদার খোদ তারাই হবেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের সকল দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। আর এই আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, আগামী প্রজন্মও এই কদর্যতা এবং বিপর্যয় থেকে সুরক্ষিত থাকবে না যা বন্ধ বা মূলোৎপাটন করার চেষ্টা তাদের পিতৃপুরুষগণ করেনি।

নির্বাচন কেবল ইহলৌকিক বিষয় নয়

নির্বাচনের ব্যাপারে অন্য একটি ভুল ধারণা প্রথমটির চেয়েও গুরুতর। আর তা হলো লোকজন যেহেতু দীন-ধর্মকে কেবল নামাজ-রোজার পরিধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে; তাই তারা রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয়গুলোকে দীনের গণ্ডির বাইরে মনে করে এসব বিষয়কে পুরোপুরিভাবে দীনের আওতামুক্ত ভেবে নিয়েছে। এজন্য বহু এমন লোক দেখা যায় যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ, রোজা ও জিকির আজকারের প্রতি যত্নবান থাকে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তারা না হালাল-হারামের চিন্তা করে আর না বিয়ে, তালাক ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীনি বিধিবিধানের পরোয়া করে।

এসব লোক নির্বাচনকেও নিরেট একটি পার্থিব বিষয় মনে করে এর মধ্যে বহু অন্যায়-অনাচারকে মেনে নেন। তারা মনে করেন না যে, নিজেরা অনেক বড়ো একটি অন্যায় কর্ম সম্পাদন করে চলেছেন। এ কারণেই বহু লোক নিজের ভোট ধর্মীয় অভিমতের পরিবর্তে নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকেও প্রদান করে থাকে। অথচ সে মনে মনে ভালোভাবেই জানে আমি যে ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করছি সে তা পাওয়ার যোগ্য নয়। অথবা তার চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি এই ভোট পাওয়ার অধিকতর যোগ্য। কিন্তু কেবল বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তা এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষায় প্রভাবান্বিত হয়ে তারা

নিজেদের পবিত্র ভোট ভুল স্থানে প্রয়োগ করে থাকে। তারা কখনো এই চিন্তা করে না যে, শরয়ি এবং দীনি বিবেচনায় কত বড়ো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, ভোট একটি সাক্ষ্য। আর সাক্ষ্যের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى.

> 'যখন তোমরা কথা বলো তখন ইনসাফপূর্ণ কথা বলো, যদিও সে তোমাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেনো।'[২২৫]

এজন্য যখন কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে অন্তর ও ধর্মের সিদ্ধান্ত এই হয় যে, যে ব্যক্তিকে আমি ভোট প্রদান করছি সে ভোটের যোগ্য নয় অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি তার বিপরীতে বেশি যোগ্য তখন কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তাকে ভোট দিয়ে দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার নামান্তর। আর পবিত্র কুরআনে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কদর্যতা এত কঠোরতার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকে মূর্তিপূজার সমান্তরালে দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছে—

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

> 'সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক।'[২২৬]

আর হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু জায়গায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে اكبر الكبائر বা সবচেয়ে বড়ো কবিরা গুনাহ সাব্যস্ত করে এর ওপর কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন—একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড়ো কবিরা গুনাহের কথা বলবো না? (তা হলো) আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না এবং পিতা-মাতার নাফরমানি করবে না। আর খুব ভালোভাবে মনে রেখো। মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানও মিথ্যা বলার নামান্তর। আবু বকর রা. বলেন—বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেক লাগিয়ে বসে ছিলেন, যখন মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা এলো তখন তিনি বসে গেলেন

---

[২২৫] সুরা আনআম, আয়াত : ১৫২।

[২২৬] সুরা হজ, আয়াত : ৩০।

এবং قَوْلَ الزُّوْرِ কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।'[২২৭]

এই সতর্কবাণী কেবল ভোটের সেই ভুল ব্যবহারের ওপর প্রয়োগ হয়ে থাকে যে ভোট ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। আর টাকা পয়সা নিয়ে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার গুনাহ্ ছাড়াও ঘুষগ্রহণ করার এক মারাত্মক গুনাহ্ও।

এজন্য ভোট দেওয়ার বিষয়টিকে কখনো এমন মনে করা সমীচীন নয় যে, এটি একটি পার্থিব বিষয়; দীনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বাস রাখুন, পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং অন্যান্য আমলের মতো এই আমলেরও জবাব দিতে হবে যে, সে নিজের এই ভোট কতটুকু ধার্মিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে?

অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া মারাত্মক গুনাহ্

কোনো কোনো ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, যদি অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া গুনাহ্ হয়, তাহলে আমরাই বা কতটুকু পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ মানুষ? আমরা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য গুনাহ্ করে যাচ্ছি। আমাদের গুনাহ্র সাগরে যদি আরেকটি গুনাহ্ যুক্ত হয় তাহলে কী এমন ক্ষতি?

কিন্তু খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, এটি নফস ও শয়তানের সবচেয়ে বড়ো ধোঁকা। প্রথমত, সকল মানুষ যদি প্রতিটি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সময় এই চিন্তা করে, তাহলে তারা কখনো কোনো গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তি সামান্য কোনো গুনাহেও লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তা থেকে পবিত্র হওয়ার চিন্তা করা উচিত। এই পথে অগ্রসর হওয়ার চিন্তাকে সমূলে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বিষয় হলো গুনাহের ধরনের মধ্যেও বেশ পার্থক্য আছে। যেসব গুনাহের মন্দ পরিণতি সমগ্র জাতিকে ভোগ করতে হয় সেসব গুনাহের কুপ্রভাব প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত গুনাহের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের অপরাধের কারণে

---

[২২৭] বুখারি ও মুসলিম।

ব্যক্তিগত ক্ষতি যত বেশিই হোক না কেনো তা দু-চারজনের গণ্ডি অতিক্রম করে না। এজন্য এসব অপরাধের ক্ষতিপূরণও সাধারণত ব্যক্তির এখতিয়ারে থাকে। এগুলো থেকে তাওবা এবং এস্তেগফার করে নেওয়া সহজ এবং এগুলো মাফ হয়ে যাওয়ার আশাও সবসময় করা যায়। এর বিপরীতে যে গুনাহের মন্দ পরিণতি সমগ্র জাতিকে ভোগ করতে হয় তার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হয় না। কামান থেকে তির বের হওয়ার পর তা আর কখনো ফিরে আসতে পারে না। এজন্য যদি কোনো সময় মানুষ এই মন্দ কর্ম থেকে তাওবা করেও নেয়, তাহলেও কমপক্ষে অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হয়। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিবেচনায় এ গুনাহটি চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও অন্যান্য গুনাহের চেয়েও বেশি মারাত্মক। একে অন্যান্য গুনাহের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

এ কথা অবশ্য সঠিক যে, আমরা সকাল-সন্ধ্যায় হাজারও গুনাহে লিপ্ত রয়েছি। কিন্তু এসব গুনাহ এমন যে, আল্লাহ যদি কোনো সময় তাওবা করার তাওফিক দান করেন, তাহলে এগুলো মাফ হয়ে যেতে পারে এবং ক্ষতিপূরণেরও আশাও করা যেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, আমরা নিজেদের মস্তক এমন এক গুনাহের সামনে অবনত করবো যার ক্ষতিপূরণ কখনো আশা করা যায় না এবং ক্ষমা হওয়াও সুদূর পরাহত।

কোনো কোনো লোক এমন চিন্তাও অন্তরে লালন করে যে, লক্ষ লক্ষ ভোটের মোকাবিলায় এক ব্যক্তির ভোটের কী-ই বা বাস্তবতা? তা যদি ভুলভাবে ব্যবহার হয়েও যায়, তাহলেও দেশ ও জাতির ওপর ভবিষ্যতে কী এমন প্রভাব পড়তে পারে?

কিন্তু খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, যদি সকল ব্যক্তিই ভোট দেওয়ার সময় এই চিন্তা করে, তাহলে সারাদেশের কোথাও একটি ভোটও সঠিকভাবে ব্যয় হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, ভোট গণনার যে ধারা আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে এর মধ্যে কেবল একজন মূর্খ ব্যক্তির একটি ভোটও জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধর্ম ও চরিত্রহীন এবং ভ্রান্ত আকিদা সম্পন্ন কোনো প্রার্থীর ব্যালট বাক্সে যদি কেবল একটি ভোট অন্যদের চেয়ে বেশি পড়ে যায়, তাহলে সে নির্বাচনে জয়লাভ করে পুরো জাতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসতে পারে। আর এভাবে কোনো কোনো সময় কেবল একজন মূর্খ ব্যক্তির সামান্য

উদাসীনতা, ত্রুটি ও ধর্মহীনতা সমগ্র জাতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এজন্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় একেকটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান। আর এটি প্রতিটি ব্যক্তির ধর্মীয়, জাতীয় ও নৈতিক দায়িত্ব যে, সে তার ভোটকে এতটাই গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করবে বাস্তবিক পক্ষে সেটা যার যোগ্য।

নির্বাচনী কার্যক্রমে বর্জনীয় দশটি বিষয়

নির্বাচনী কর্মতৎপরতা, প্রচারণা ও হাঙ্গামা আমাদের সমাজে অসংখ্য অন্যায়-অপরাধের এমন প্লাবন নিয়ে আসে যার নিকষ-কালো আঁধারে সমগ্র পরিবেশ-প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই তৎপরতা ও ঝামেলা শরিয়ত, আখলাক, ভদ্রতা ও মানবতার ভিত্তিমূলে ধারাবাহিকভাবে এমন চপেটাঘাত করে যার ফলে পুরো দেশ ও জাতি প্রকম্পিত হয়ে যায়। এসব অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহের নিতান্ত পরিতাপজনক দিক এই যে, অন্তরে এসব গুনাহের গুনাহ হবার অনুভব পর্যন্ত থাকে না এবং ক্ষমতা লাভের অন্ধ দৌড়ঝাঁপ সবকিছুকে বৈধ করে দেয়। আর যেহেতু সমাজে এসব অন্যায় অপকর্ম কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই এতটা ব্যাপক হয়ে গেছে যে, এখন কোনো ব্যক্তি এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ পর্যন্ত খোলে না। এজন্য সেসব সুশীল এবং অভিজাত ব্যক্তিদের মনেও এসব অন্যায়-অকল্যাণকর বিষয় গুনাহ হবার খেয়াল পর্যন্ত আসে না, যারা জেনে বুঝে মন্দ কর্মে জড়াতে চান না। এজন্য আজ আমি এমন কিছু মন্দ ও অহিতকর বিষয় নিয়ে এই আগ্রহে আলোচনা করবো যে, যেসব আল্লাহর বান্দা বাঁচতে চায় তারা যেন এগুলো থেকে বাঁচতে পারে এবং অন্য লোকদের মনেও কমপক্ষে এতটুকু অনুভব সৃষ্টি হয় যে, এগুলো গুনাহ এবং অন্যায় কাজ।

এক. নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার কারণে আমাদের সমাজে যে গুনাহ ও অন্যায়কর্ম বিস্তার লাভ করেছে সেগুলোর মূল ভিত্তি হলো ক্ষমতার লিপ্সা এবং পদ লাভের অপ্রতিরোধ্য মোহ। এর বৈধতা অনুসন্ধান করার জন্য কোনো কোনো সময় দেশ ও জাতির কল্যাণকামনার নিষ্পাপ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা হয়। অথচ রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা হলো এটি ফুলের কোনো তোড়া নয়, যা লাভ করার জন্য একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। বরং এটি ইহ ও পরকালের ওই জোয়াল যা নিজের স্কন্ধে রাখার আগে মানুষের কম্পিত

হওয়া উচিত এবং অত্যধিক অপারগ না হলে নিজেকে এই পরীক্ষায় না ফেলা উচিত। এ কারণেই উমর রা.-কে যখন তার স্থলাভিষিক্ত খলিফা হিসেবে নিজের সন্তান আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর নাম উল্লেখ করতে অনুরোধ করা হয় তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রক্ষমতার শৃঙ্খল খাত্তাব পরিবারের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির (উমর রা.) গলায়ই পরানো হয়েছে। আর এটিই যথেষ্ট। আমি আমার সন্তানের ঘাড়ে এই দায়ভার চাপিয়ে যেতে চাই না।'

যদি কোনো ব্যক্তির অন্তরে এই গুরুদায়িত্বের যথার্থ অনুভব থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বৈধ উপায়-উপকরণের মাধ্যমে তার নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা থেকেই হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সে দায়িত্বও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আর এর পরিণামে কখনো সেসব অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না যেগুলোর বিষাক্ত প্রভাব রাজনীতির ময়দানকে কলুষিত করে ফেলেছে।

কিন্তু ক্ষমতাকে যখন স্বার্থের বাহন ও পেশা বানানো হবে এবং বস্তু-স্বার্থের উপায় হিসেবে নির্ধারণ করা হবে এবং একে লাভ করার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করা হবে তখন সেটা হবে ক্ষমতালাভের ওই লোভ যার জঠর থেকে কল্যাণ ও মঙ্গল বের হতে পারে না। এর অপরিহার্য ভয়াবহ পরিণতি হলো তা অন্যায়, অপরাধ, ব্যক্তিস্বার্থ ও অপকর্মের জন্ম দিয়ে সমাজে অনিষ্ট ও বিপর্যয়ের প্রসার ঘটাবে।

দুই. অকল্যাণ ও বিপর্যয়ের একটি দিক এই যে, আমাদের নির্বাচনী প্রচারণায় এক প্রার্থী অন্য প্রার্থীর প্রতি দোষারোপ করে থাকে এবং একে অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে বৈধ মনে করে। প্রার্থী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে জয়মাল্য ছিনিয়ে আনার জন্য তার প্রতি কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই অপবাদ আরোপ করাকে বৈধ মনে করে। বরং এটি রাজনৈতিক যুদ্ধের ওই অপরিহার্য অনুষঙ্গ যা ছাড়া রাজনৈতিক সফলতাকে অসম্ভব মনে করা হয়।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, কোনো ব্যক্তি যত বড়ো অপরাধীই হোক না কেন, তার প্রতি এমন দোষারোপ করা কখনোই জায়েজ নয় যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার তদন্ত করা হয়নি। কিন্তু নির্বাচনী সমাবেশের কোনো ভাষণ সম্ভবত এমন নেই যার মধ্যে তদন্ত করা ছাড়াই দোষারোপ করা হয় না।

আর এমন দোষারোপ করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আবার কতক সময় এই দোষারোপের ক্ষেত্রে এমন নিম্নমানের বাজারি শব্দ ব্যবহার করা হয় যা অপবাদের গণ্ডিকেও অতিক্রম করে ফেলে। এক হাদিসে এসেছে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মুসলিমের জান-মাল, ইজ্জত ও আব্রুকে বাইতুল্লাহর চেয়েও অধিক পবিত্র এবং নিষ্কলুষ বলে অভিহিত করেছেন। এর মর্ম এটিই যে, কোনো মুসলিমের জান, মাল এবং ইজ্জত ও আব্রুতে হামলা করা বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় জোশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইজ্জতের বাইতুল্লাহকে প্রতিনিয়ত দলিত মথিত করা হয়। আর পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে নিয়ে নির্বাচনী সভা-সমাবেশ ও মিছিল মিটিং পর্যন্ত কোনো স্থান এমন থাকে না যা দোষারোপ ও কালিমা লেপনের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় না।

তিন. যেহেতু নির্বাচনের বিষয়টিই এমন যে, কোনো প্রার্থীর পরিচয় এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জনসম্মুখে আনার প্রয়োজন দেখা দেয়; যেন জনসাধারণকে ধোকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচানো যায় তাই এর জন্য প্রথমে এ বিষয়টি জরুরি যে, যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো কথা বলা হবে না এবং ধার্মিকতা ও ইনসাফের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে কাজ নেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ বিষয়টিও আবশ্যক যে, এই নাজুক প্রকৃতির কথা যথাসম্ভব কম এবং প্রয়োজনানুপাতেই বলা হবে। একে কেবল মজা নেওয়া বা সভার সৌন্দর্যের মাধ্যম বানানো হবে না। অন্যথায় এটি যদি অপবাদ নাও হয়, তাহলেও তা গীবতের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; পবিত্র কুরআনে যাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমার্থক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর মজলিসে এক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের নিন্দা-মন্দ বর্ণনা করতে শুরু করে। হাজ্জাজের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিষয়টি কারও অবিদিত ছিলো না। কিন্তু এখানে যেহেতু তার মন্দ বলার সঠিক কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না তাই ইবনু উমর রা. বললেন, 'এটি গিবত। যদিও হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ বহু লোকের ওপর অত্যাচার করেছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এখন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তার গিবত করা হালাল হয়ে গেছে। স্মরণ রেখো, মহান আল্লাহ যদি নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ত প্রবাহিত করার জন্য হাজ্জাজের বিচার করেন, তাহলে তার অকারণ গিবত করার বিচার করতেও তিনি ভুলবেন না।'

চার. অন্যদের প্রতি দোষারোপ করা এবং তাদের নিন্দা-মন্দ বর্ণনা করা ছাড়াও নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য একে জরুরি মনে করা হয় যে, প্রার্থী নিজেই নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায় এবং উন্নয়নের অলীক ফিরিস্তি জনসম্মুখে দাঁড় করায়। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, আত্মপ্রশংসা করা ও নিজের যশ-খ্যাতিকে লোকসম্মুখে বলে বেড়ানো ধর্মীয়ভাবে ও নৈতিক দৃষ্টিকোণে গুনাহ্। যদি গুনাহ্ নাও হয়, তাহলেও তা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের নির্বাচনী আচরণবিধিতে একে কোনো নিয়ম-নীতির অনুগামী করা হয়নি।

পাঁচ. জনসাধারণকে ভোট দিতে উৎসাহিত করার জন্য জরুরি মনে করা হয় যে, তাদেরকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতির বাণী শোনাতে হবে। অঙ্গীকার করার সময় এ বিষয়ে কোনো কথা বলা হয় না যে, এসব অঙ্গীকার কোন পন্থায় পূরণ করা হবে এবং ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার পর সেসব অঙ্গীকার কীভাবে বাস্তবায়িত হবে? 'আমরা ক্ষমতায় আসীন হয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাবো' 'অনুন্নত এলাকাসমূহকে প্যারিসের মতো আধুনিক শহরে রূপান্তর করবো' 'আমরা প্রতিটি জেলায় একেকটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করে বিচারব্যবস্থাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবো' 'আমরা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীভূত করবো' নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রতিটি বক্তৃতায় এ জাতীয় বাহারি প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে দেওয়া হয় এবং এসব মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সহজ-সরল লোকদেরকে বোকা বানানোর কসরত করা হয়।

ছয়. সভা-সমাবেশ এবং প্রচার-প্রচারণাও নির্বাচনী কর্মতৎপরতার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। যদি এসব সমাবেশ নৈতিকতা ও সভ্যতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতো, তাহলে সেগুলো বৈধও হতো। কিন্তু সভা-সমাবেশে গুন্ডামি ও মাস্তানি এক স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কাছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর কোনো মূল্য নেই। অতএব, যার সুযোগ হয় সে অন্যকে পরাজিত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না।

সাত. কোনো কোনো সময় নির্বাচনী সভার আয়োজন লোক চলাচলের এমন ব্যস্ততম রাস্তায় করা হয় যার ফলে জনবসতিপূর্ণ শহরের নাগরিকদের চলাফেরা স্থবির হয়ে পড়ে এবং ট্রাফিকের এমন সমস্যা সৃষ্টি হয় যা লোকদেরকে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন করে দেয়। এই ধারাবাহিকতায়

কতনা মুমূর্ষু রোগীকে এ্যাম্বুলেন্সে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। কতনা কর্মজীবি মানুষ তাদের কর্মস্থলে যথাসময়ে পৌঁছতে না পেরে কাঙ্ক্ষিত আয় রোজগার থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে রাজপথগুলো বলক করে দিয়ে কতনা মানুষকে অবর্ণনীয় কষ্টে নিপতিত করার মারাত্মক গুনাহ সমাবেশের আয়োজকদের ভাগে আসে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

আট. দেওয়ালসমূহকে নির্বাচনী শ্লোগানে শ্লোগানে কালো করে ফেলা এবং ব্যক্তিগত ও সরকারি ইমারতসমূহকে পোস্টার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ডে সজ্জিত করে ফেলা নির্বাচনী কর্ম তৎপরতার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে শহরের অধিকাংশ দেওয়াল বিপরীতমুখী শ্লোগান ও প্রচারপত্রে ছেয়ে যেতে দেখা যায়। আল্লাহর কোনো বান্দার এই খেয়ালও আসে না অন্য কারও ইমারতকে তার সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করে এর আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে চুরি ও ডাকাতির নামান্তর। মহানবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন জিনিস তার সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা হালাল নয়।

এসব ইমারত কারও না কারও মালিকানাধীনই হয়ে থাকে। অতএব, এগুলোকে মালিকের অনুমতি ছাড়া নিজের প্রচার-প্রচারণার জন্য ব্যবহার করা হারাম। এগুলোকে নষ্ট কিংবা বিকৃত করা আরও মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের দাবিদারগণ অবলীলায় এ জাতীয় চুরি ডাকাতির অপরাধে লিপ্ত হচ্ছেন। আর কোনো অভিজাত ব্যক্তি যদি এহেন গর্হিত কর্ম হতে বিরত রাখার প্রয়াস চালায়, তাহলে তাকে কখনো ইট-পাটকেল কিংবা গোলাগুলির মুখোমুখি হতে হয়।

নয়. ভোট ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এই উদ্দেশ্যে লোকদেরকে ঘুষ দেওয়া, যেসব লোকের অধীনে ভোট-ব্যাংক তাদের নাজায়েজ কাজ করে দেওয়া কিংবা এর ওয়াদা করা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ, যা আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন প্রার্থীদের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত রয়েছে। এ জাতীয় অপরাধ সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে।

দশ. নির্বাচনী কর্মতৎপরতা পরিচালিত করার জন্য এবং এর ব্যয়ভার বহন করার জন্য প্রতিটি দলের লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। আর এ মোটা অংকের টাকা যোগান দেওয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলোর মধ্যে

বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে তাদের বলে দেওয়া এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা এমন এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দেশ ও জাতিকে উইপোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে! আর যে সব লোক বিদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে না কিংবা করতে পারে না তারা দেশীয় বড়ো বড়ো পুঁজিপতির কাছ থেকে নিজ দলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে। অনেক সময় এই চাঁদা মূলত ওই বিষয়ের ঘুষ হয়ে থাকে যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর চাঁদাপ্রদানকারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। যদি এসব ব্যক্তি চাঁদা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে নানাভাবে নাজেহাল করা হয়। রাজনৈতিক যে দল অধিক শক্তিশালী হয় এবং তার ক্ষমতায় আসার যতটুকু বেশি সম্ভাবনা থাকে তার চাঁদাদাবির আবেদন বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

এই দশটি বড়ো বড়ো গুনাহ কেবল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো। কিন্তু আপনি যদি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন এগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি গুনাহই স্বতন্ত্রভাবে আরও বহু গুনাহের সমষ্টি। আর নির্বাচনী কর্মতৎপরতা পরিচালনা করার সময় এ জাতীয় আরও কত গুনাহের যে সম্মুখীন হতে হয় তা আল্লাহই ভালো জানেন। এখন চিন্তা করে দেখুন, যে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই রাজনীতিকদের মিথ্যারোপ, দোষারোপ, অপবাদ দেওয়া, পরনিন্দা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অন্যের সঙ্গে সন্ত্রাসপূর্ণ আচরণ, আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া ও অন্যের সম্পদে নাজায়েজ হস্তক্ষেপের মতো মারাত্মক গুনাহসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আর যে পরিবেশে এসব গুনাহের নিকষ-কালো অন্ধকার বিস্তার লাভ করেছে সেই সমাজ থেকে কল্যাণ ও মঙ্গলের আলো বিচ্ছুরণের আশা করা যায়?

কিন্তু এসব বিষয়ের উল্লেখ কেবল সমালোচনার জন্যই সমালোচনা নয়, বরং এগুলোর উদ্দেশ্য হলো যাতে সমাজের লোকজন নিজেদের অন্যায়-অপরাধ ও ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং তাদের মধ্যে যে পরিমাণ অন্যায়-অপরাধ বন্ধ করার সামর্থ্য থাকে তা যেন তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে প্রতিহত করতে পারে। কমপক্ষে তারা যেন সাধারণ মুসলিমদেরকে সেসব গুনাহের কালিমা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় যেগুলোতে তারা অনেক সময় নিজেদের অজান্তেই লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে, এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ তুফান ও প্লাবনের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি যদি কোনো অহিত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর কি এমন প্রভাব পড়বে? স্মরণ রাখুন, সমাজের

অন্যায়-অপরাধ যত ক্ষুদ্র পরিসরেই কমবে ততই কল্যাণ। কেননা, সমাজ মূলত একেকজন ব্যক্তির সমষ্টিরই নাম। এখানে প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে এবং আলো থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। এজন্য কোনো সময় কোনো এক ব্যক্তির দৃপ্ত প্রত্যয়ের সাহসী পদক্ষেপও সমাজ বিপলবের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা, প্রতিটি ব্যক্তিই সমাজের একেকটি সুপ্ত ঝলমলে উজ্জ্বল তারকা।

মামলার শুনানিকাল
আইনের শরয়ি অবস্থান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এক ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর কাছে পত্রযোগে এই প্রশ্ন পাঠান যে, মামলার শুনানিকাল সম্পর্কে যে আইন করা হয়েছে তা শরিয়ত সম্মত কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা একটি বিস্তারিত পত্র লেখেন। এটিই এখন আমরা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

মামলার শুনানিকাল আইনের শরয়ি অবস্থান

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

এ ব্যাপারে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অধুনা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণকারী কতিপয় রাষ্ট্রে সংরক্ষণ আইন (Limitation act)-এর নামে যে নীতি প্রচলিত ও কার্যকর রয়েছে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী? সরাসরিভাবে এগুলো কি অনৈসলামিক মূলনীতি? যদি এসব আইন ও মূলনীতি অনৈসলামিক হয়, তাহলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়াবলিতে মামলা করা এবং এর শুনানির সময় নির্দিষ্ট না থাকার কারণে যে প্রায়োগিক সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলোর প্রতিকার কীভাবে হবে? বিশেষত, সময়সীমা নির্ধারণ না করার বিষয়টিকে যদি স্বাভাবিক আইনি নির্দেশনার (Categomcal imperative) মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে জায়গা-জমি, বাড়িঘর ও স্থাবর সম্পদের বহু বছরের প্রাচীন বিষয়াবলি প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আর যদি এসব মূলনীতি অনৈসলামিক না হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো ইসলামিক হওয়ার প্রমাণ কী? অথচ বলা হয়ে থাকে ইসলামের ইতিহাসে প্রতিবেশি অধিকার বাদ দিয়ে এ প্রকার আইন কানুন কার্যকর হতে পারে না। যদি অচিরেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে পুরোপুরিভাবে ইসলামকে কীভাবে কার্যকর করা

যাবে? (Limitation act) মামলা করার মেয়াদ সম্পর্কিত আইনকে কীভাবে ইসলামিক করা হবে? অথবা কীভাবে এটি ইসলামি আইনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে? যথাসম্ভব দ্রুত জবাবদানে জনাবের মর্জি কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

—জাফর কাসেমি
মহল্লা রিখতি চিনউট
২২-০৮-১৯৭৭ খ্রি.

মুফতি তকি উসমানি-এর জবাবি পত্র

শ্রদ্ধেয় জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

মহান আল্লাহ আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। আপনি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন সে ব্যাপারে আমাদের অভিমত হলো মামলার শুনানিকাল সংক্রান্ত আইন (Limitation act) সরাসরি অনৈসলামিক নয়। আর এ কথা বলা একেবারেই ভুল যে, ইসলামের ইতিহাসে প্রতিবেশির অধিকার বাদ দিয়ে এ প্রকার আইন কখনো কার্যকর করা হয়নি। বাস্তব কথা হলো ইসলামি আদালতসমূহের মধ্যেও মামলার শুনানিকাল সংক্রান্ত আইনের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। বিশেষত, তুর্কি খিলাফতের সময় ইসলামি বিশ্বের সকল ফকিহ সমকালীন খলিফা কর্তৃক নির্ধারণকৃত মামলার শুনানিকাল সংক্রান্ত আইনের প্রতি আমল করেছেন। আর ইসলামি বিধিবিধানে প্রাজ্ঞ ফকিহগণ এই আমলকে কেবল সমর্থনই করেননি, বরং সমকালীন খলিফা উন্মুক্ত প্রজ্ঞাপন জারি করার পর এর ওপর আমল করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর গ্রন্থের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা হামাবি রহ. নিজ যুগের ব্যাপারে লেখেন—আমাদের যুগের রাজা-বাদশাহগণ সকল বিচারপতিকে এই হুকুম দিয়েছেন, তারা যেন ওয়াকফ এবং উত্তরাধিকার ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের মামলা ও অভিযোগ ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার পনেরো বছর পর দায়ের করার অবকাশ না দেন এবং শুনানির জন্য গ্রহণ না করেন। আর ফাতাওয়া হামিদিয়্যায় এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের ফকিহগণের অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। আর চার মাজহাবের সকল ফকিহই

এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার পর পনেরো বছর অতিক্রান্ত হলে কোনো মামলা দায়ের করার অবকাশ দেওয়া হবে না এবং এর ওপর শুনানিও হবে না। অবশ্য আল্লামা খাইরুদ্দিন রামালি রহ. ফাতাওয়া খাইরিয়্যাহ-এর মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে প্রত্যেক খলিফার পক্ষ থেকে নতুনভাবে প্রজ্ঞাপন জারি হওয়া মামলার শুনানিকাল সংক্রান্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য জরুরি।

অবশ্য বিভিন্ন যুগে মামলা গ্রহণ ও এর শুনানির জন্য বিভিন্ন সময় ধার্য করা হতো। ফিকহে হানাফির গ্রন্থসমূহে কোনো কোনো মামলার জন্য পনেরো বছর আবার কোনো কোনো মামলার জন্য তেত্রিশ বছর আবার কোনো কোনো মামলার জন্য ছত্রিশ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আদ্দুররুল মুখতার'-এ আছে—

> الْقَضَاءُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ حَتَّى لَوْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَسَمِعَهَا لَمْ يَنْفُذْ. قُلْتُ: فَلَا تُسْمَعُ الْآنَ بَعْدَهَا إِلَّا بِأَمْرٍ.
>
> 'বিচার-ব্যবস্থা মানুষের সুপ্ত অধিকারকে প্রকাশ করে মাত্র। তা নতুন কোনো অধিকারকে সৃষ্টি কিংবা সাব্যস্ত করে না। সুতরাং এটি কোনো স্থান, কাল ও মামলা-মোকাদ্দমার সঙ্গে বিশেষিত নয়। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি পনেরো বছর পর অভিযোগ শুনানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং আদালতে এর শুনানি করা হয়, তাহলে তা কার্যকর হবে না। এ ক্ষেত্রে আমার অভিমত হলো এখন এ ধরনের মামলার শুনানি করা হবে না, তবে রাষ্ট্রপ্রধান যদি নির্দেশ দেন, তাহলে ভিন্ন কথা।'[২২৮]

আলোচ্যাংশটুকুর অধীনে আল্লামা শামি রহ. এ মাসআলা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি লিখেছেন—

> وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا.

---

[২২৮] আদ্দুররুল মুখতার।

'ফতোয়া বিশেষজ্ঞ পরবর্তী যুগের ফকিহগণ বলেছেন—ছত্রিশ বছর পর কোনো মামলার শুনানি করা হবে না। তবে বাদী যদি অনুপস্থিত থাকে কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু হয়, তাহলে তার শুনানি সম্পাদন করা যেতে পারে।'[২২৯]

আল্লামা শামি রহ. আল্লামা শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. প্রণীত আল মাবসুত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

إذا ترك الدعوى ثلاثة وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لاتسمع دعوه.

'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও তেত্রিশ বছর পর্যন্ত মামলা দায়ের না করে, তাহলে পরবর্তী সময়ে মামলা দায়ের করা হলে তার মামলার শুনানি করা হবে না।'[২৩০]

আল্লামা শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. খিলাফতে আব্বাসিয়া যুগের মানুষ। তার বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মামলার শুনানিকাল সংক্রান্ত আইনের ধারণা খিলাফতে আব্বাসিয়াতেও ছিলো। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো আমি পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে শয্যাশায়ী রয়েছি এবং চলাফেরা করতে পারছি না। এজন্য অন্যান্য গ্রন্থাদি দেখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যথায় সম্ভবত এ বিষয়ে আরও প্রাচীনকালের উদ্ধৃতি পাওয়া যেতো। এতদসত্ত্বেও আল্লামা শামি রহ.-এর স্পষ্ট বিবরণসমূহের মাধ্যমে আমাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মামলা-মোকাদ্দমা দায়ের ও এর শুনানিকাল সংক্রান্ত আইনের ধারণা কেবল ইসলাম সম্মতই নয়, বরং প্রতিটি যুগেই ইসলামি আদালতসমূহের মধ্যে এটি যে-কোনো আকৃতিতে কার্যকর রয়েছে।

অবশ্য এখানে এই সংশয় হতে পারে যে, কেবল বিলম্ব করার কারণে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে? প্রচলিত আইনে এ প্রশ্নের উত্তর ওই ন্যায়ানুগ বাক্যের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে যে,

The law aids the diligent and not the inidolent

'আইন-আদালত কেবল চৌকস লোকদের সাহায্য করে থাকে। অসচেতন-গাফেল লোকদের নয়।'

---

[২২৯] রদ্দুল মুহতার।

[২৩০] রদ্দুল মুহতার।

There should bean end to litigation

'আদালতি মামলা-মোকাদ্দমাসমূহেরও একটি সমাপ্তিকাল থাকা উচিত।'

কিন্তু এই নীতিবাক্য প্রচলিত আইনের ব্যাপারে এজন্য পুরোপুরিভাবে চিত্তপ্রশান্তিকর নয় যে, এখানে দীন-ধার্মিকতা ও বিচারব্যবস্থায় কোনো পার্থক্য করা হয় না। বরং যে অধিকার আদালত থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় কার্যক্ষেত্রে তাকে আর অধিকারই মনে করা হয় না।[২৩১] এর পরিবর্তে ইসলামের বিধানে ধার্মিকতা ও বিচারব্যবস্থার বিধিবিধান একসঙ্গে সমান্তরালে সামনে অগ্রসর হয়। এজন্য আদালত যদি কোনো অধিকার নিষ্পত্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, এটি অধিকারই রয়নি। বরং এই অধিকার আগের মতোই এখনো বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তির দায়িত্বে কারও কোনো অধিকার পাওনা থাকে ধর্মীয়ভাবে তার ওপর ফরজ হলো এই অধিকার তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া; চাই যত সময়ই অতিক্রান্ত হয়ে যাক না কেনো। যদি সে প্রকৃত হকদারের কাছে তার অধিকার ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে আদালত যদি তাকে কিছু নাও বলে, তাহলেও সে গুনাহগার হবে। আর এজন্যই ফকিহগণের এই উক্তি আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর ও অন্যান্য ফিকহের গ্রন্থে আছে—

الحق لايسقط بتقادم الزمان.

'সময়ের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে কোনো অধিকার রহিত হয়ে যায় না।' এ বাক্যের উদ্দেশ্য এটিই যে, মামলার শুনানি অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই অধিকার আগের মতোই বহাল তবিয়তে থাকবে। এর পারলৌকিক প্রভাব এই যে, এই অধিকার খর্বকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে। আর ইহলৌকিক দ্বিতীয় প্রভাব এই যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে কারও অধিকার বিনষ্ট করার অভিযোগ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে সে ফাসেক বলে গণ্য হবে, যার ফলে সকল লেনদেন ও চুক্তির ওপর এর প্রভাব পড়বে। যদিও আদালত এই মামলার শুনানি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কিন্তু খলিফার কাছে যদি আপিল পৌঁছে এবং তিনি অনুভব করেন যে, মামলাটি সত্যাশ্রয়ী ও গ্রহণযোগ্য এবং তাতে বাহ্যিকভাবে চালবাজির কোনো সম্ভাবনা

[২৩১] কার্যক্ষেত্রে এজন্য বলা হয়েছে, মৌলিকভাবে প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যেও এ বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়েছে যে, মামলা-মোকাদ্দমার শুনানিকাল নির্ধারণ করার মাধ্যমে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ শেষ হয়ে যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত অধিকার (right) নিঃশেষ হয়ে যায় না।

নেই, তাহলে ওই অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান পুনর্বিবেচনার জন্য একে বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এ অবস্থায় বিচারক এর শুনানি গ্রহণ করবেন।[২৩২]

তাছাড়া এ অবস্থায় অধিকারের প্রাপক ব্যক্তি কাজিকে তৃতীয় পক্ষ (সালিশ) মেনেও ফায়সালা করে নিতে পারেন।

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কেবল মৌখিকভাবেই নয়, বরং ব্যবহারিকভাবেও মামলার শুনানিকাল রহিত হওয়ার কারণে কারও অধিকার রহিত হয় না। অবশ্য মামলা দায়ের করা এবং এর জন্য শুনানিকাল নির্ধারণ করার মৌলিক কারণ এই যে, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি মামলা করা এবং এর শুনানির অধিকার বহাল রাখা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে মামলা-মোকদ্দমায় ধোঁকা, প্রতারণা ও মিথ্যা সাক্ষীর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কেননা, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। আর কোনো সময় যদি প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়াও যায়, তাহলেও ঘটনাটি তার পুরোপুরিভাবে স্মরণে থাকে না। যার ফলে এ প্রকারের মামলা আদালতে দাখিল করার অর্থ এই হবে যে, মামলা-মোকাদ্দমাসমূহে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলি এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। মামলা ও এর শুনানির জন্য সময় নির্ধারণ করার এই কারণই আমাদের ফকিহগণ বর্ণনা করেছেন।

আলোচনার সারমর্ম হলো, মামলার শুনানি সংক্রান্ত আইনকে সরাসরি অনৈসলামিক বলা সঠিক নয়। বরং ইসলামের বিধানের মধ্যেও এর মৌলিকতা রয়েছে। আর যখন শরিয়তের মৌল বুনিয়াদের ওপর প্রচলিত আইনসমূহকে নতুনভাবে সংকলন করা হবে তখন এই আইন পুরোপুরিভাবেই প্রত্যাখ্যাত কিংবা রহিত হবে না। বরং এর ওপর আলোচ্য ফিকহি বুনিয়াদসমূহের নিরিখে দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণ করা হবে। আমি মনে করি, মামলার শুনানি সংক্রান্ত এই আইনে এতটুকু পরিমাণ সংশোধনী আনারও প্রয়োজন পড়বে না অন্য বহু আইনে যে সংশোধনী আনার প্রয়োজন দেখা দেবে।

ওয়াসসালাম

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

১২ রমজান, ১৩৯৭ হি.।

[২৩২] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৪৩।

কাক খাওয়া জায়েজ-নাজায়েজের ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর অঞ্চলের কতিপয় আলেম কাক খাওয়া নাজায়েজ হওয়ার ওপর একটি ফতোয়া দেন। তাদের ফতোয়া অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের মতের পরিপন্থি ছিলো। এজন্য জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি রহ.-এর কাছে একটি প্রশ্নপত্র পাঠান। এর সঙ্গে তিনি সেখানকার আলেমগণের অভিমত সম্বলিত ওই ফতোয়াও যুক্ত করে দেন। মুফতি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। এরপর মাওলানা বিস্তারিতভাবে যে জবাব প্রদান করেন তাই এখন পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো। সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর অঞ্চলের আলেমগণের জবাব ফার্সি ভাষায় ছিলো। আমরা প্রথমে এর উর্দু অনুবাদ প্রদান করেছি। এরপর শায়খুল ইসলাম মুফতি তকি উসমানি-এর জবাব তুলে ধরেছি।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

কাক খাওয়া জায়েজ-নাজায়েজের ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন

সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর অঞ্চলের আলেমগণ কাক ভক্ষণ করা হারাম মর্মে একটি ফতোয়া প্রদান করে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন। ফতোয়াটি যেহেতু অধিকাংশ আলেমের মতের পরিপন্থি তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এর জবাব লিপিবদ্ধ করে দেওয়ার আবেদন করছি। উল্লিখিত আলেমগণের প্রশ্ন এবং উত্তর আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি।

প্রশ্ন : দেশীয় কাক ভক্ষণ করা হালাল কি না জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : দেশীয় কাক ভক্ষণ করা হারাম। এটি অনিষ্টকর ও কষ্টদায়ক পক্ষীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ.-এর এক হাদিসে এসেছে—

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

‘নাফে রহ. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হজ ও ওমরায় গমনকারী মুহরিম ব্যক্তির জন্য পাঁচ প্রকার প্রাণীকে হত্যা করা গুনাহ নয়। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।’[২৩৩]

আর মুয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুসাফ্‌ফার টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লামা বাগাভি রহ. বলেছেন—

---

[২৩৩] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস : ৭৮৯।

اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان ولا شيئ عليه في قتلها في الاحرام والحرم لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع وبعضها هوام وبعضها لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام وإنما هو حيوان مستخبث اللحم وتحريم الأكل يجمع الكل وقالت الحنفية لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث وقاسوا عليه الذئب وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع مالا يوكل لحمه عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتديه شيئ فيدفعه عن نفسه فيقتله فلا شيئ عليه وفي البحر معنى الفسق فيهن خبثهن كثرة الغرر فيهن.

'আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, হজ কিংবা ওমরায় গমনকারী মুহরিম ব্যক্তির জন্য এসব প্রাণী হত্যা করা জায়েজ আছে। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হারামের সীমানায় থাকাকালে যদি এগুলোকে হত্যা করা হয়, তাহলে মুহরিম ব্যক্তিকে এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, আলোচ্য হাদিস এমন কতিপয় প্রাণীকে শামিল করে যেগুলোর কোনো কোনোটি চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর অন্তর্ভুক্ত। আবার কোনো কোনোটি কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর কোনোটি এমনও আছে যেগুলো চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুরও অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গও নয়, বরং এগুলো নিকৃষ্ট গোশত-বিশিষ্ট প্রাণী। আর এগুলোর সবকটিই ভক্ষণ করা হারাম। হানাফি আলেমগণ বলেন—হাদিসের মধ্যে যে'কটি প্রাণীর কথা এসেছে সেগুলোকে হত্যা করার কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। তারা নেকড়ে বাঘকে এসব প্রাণীর সমতুল্য মনে করেন। আর অন্যান্য প্রাণী তথা নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, শূকর এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে বলেছেন—যদি এগুলোকে হত্যা করা হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এই প্রাণীসমূহের কোনো একটি যদি নিজ থেকে তেড়ে আসে এবং আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি এগুলোকে হত্যা করে, তাহলে এজন্য কোনো কিছু বিনিময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থে আছে, এসব প্রাণীর মধ্যে ফিসক থাকার অর্থ হলো সেগুলোর মধ্যে অধিক পরিমাণে নোংরামি ও কদর্যতা থাকা।'

ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল হিদায়ায় এসেছে—

والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى وفى بعض النسخ أو يخلط كما نقل عبارتها فى البحر إذ يخلط الحب بالنجس معناه يأكل الحب تارة والنجس تارة كذا فى الحاشية للسيد الشامى على البحر نقلا عن النهر عن البدائع قال أبو يوسف الغراب المذكور فى الحديث الذى يأكل الجيف أو يخلط لأن هذا النوع هو الذى يبتدى بالأذى.

'কাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই কাক যা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে এবং হালাল-হারাম উভয়ই খায়। এটি হারাম হওয়ার কারণ হলো : তার কাজের সূচনাই হয় নোংরা জিনিসের মাধ্যমে। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে ويخلط শব্দের স্থলে أو يخلط শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ, 'হালাল-হারাম উভয় প্রকারই খায়' শব্দের স্থলে 'কিংবা হালাল-হারাম উভয় প্রকারই খায়' রয়েছে। আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ রয়েছে। কেননা, কাক শস্যদানা নাপাকির সঙ্গে মিশ্রিত করে তারপর খায়; কখনো শস্যদানা খায় আবার কখনো নাপাক বস্তু খায়। এমনটিই উল্লেখ আছে আল্লামা শামি রচিত আল বাহরুর রায়েকের টীকায়। এটি বর্ণনা করা হয়েছে আন নাহরুল ফায়েক থেকে বাদায়েউস সানায়ে-এর সূত্রে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন—যে কাকের কথা হাদিস শরিফে এসেছে তা হলো ওই কাক যা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে কিংবা হালাল-হারাম উভয়টি ভক্ষণ করে। কেননা, এ প্রকার কাক নোংরা বস্তুর মাধ্যমেই সূচনা করে থাকে।'

আর কানজুদ্দাকায়েকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিসকিনে (শরহু মুল্লা মিসকিন) ولا شيئ بقتل الغراب এর অধীনে উল্লেখ আছে যে,

والمراد به الابقع الذى يأكل الجيف ويخلط النجس مع الطاهر فى التناول.

'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাদা-কালো মিশ্রিত ধূসর রঙের ওই কাক যা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে এবং ভক্ষণ করার সময় নাপাক বস্তুকে পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সংমিশ্রিত করে নেয়।'

আর আল্লামা আবুস সাউদ কৃত টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে—

الواو بمعنى أو إذ لا حاجة بضم الخلط إلى أكلها أى أكل ما خالطه كما ذكره الحموى.

'الواو' অক্ষরটি অর্থগতভাবে أو অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কেননা, আহারের সঙ্গে সংমিশ্রিত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আল্লামা হামাবি রহ. এমনটিই উল্লেখ করেছেন।

হাদিস শরিফের মধ্যে যে কাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই কাক থেকে দুই প্রকার কাককে ফকিহগণ বাদ দিয়েছেন। এক হলো ওই কাক যা কৃষি খামারে পাওয়া যায়। আরেক প্রকার কাক হলো 'আকআক' বা কবুতর সদৃশ সাদা লেজ বিশিষ্ট কাকের মতো এক প্রকার প্রাণী। বিভিন্ন কিতাবে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। এ দুই প্রকার কাককে হত্যা করলে মুহরিমের ওপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব।

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে কৃষি খামারের কাকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

وهو الذى يلتقط الحب ولا يأكل الجيف ولا يأتى فى القرى والأمصار.

'এটি এমন কাক যা শস্যদানা কুড়িয়ে খায় মৃতপ্রাণী খায় না এবং জনপদ ও লোকালয়ে আসে না।' আর আকআক বা কাকের মতো প্রাণীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাতে বলা হয়েছে—

طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بصوت يشبه العين والقاف.

'এটি এমন পাখি যা কবুতরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি সাদা ও কালো রঙের হওয়ার সাথে সাথে লম্বা লেজ বিশিষ্ট। এটি এমন এক কাক লোকসমাজে যাকে অশুভ মনে করা হয়। তার ডাকের স্বর আরবি অক্ষর 'আইন' ও 'কাফ' এর ধ্বনির মতো।'

অতএব, উল্লিখিত দুই প্রকারের কাক ভক্ষণ করা হালাল। আর এখান থেকেই ফকিহগণ তাদের প্রণীত গ্রন্থে ما يحل أكله وما لا يحل أكله অধ্যায়ে এ দুই প্রকার কাক ভক্ষণ করা হালাল বলে উল্লেখ করেছেন। তানবিরুল আবসারে উল্লেখ করা হয়েছে—

وحل (غراب الزرع) الذي يأكل الحب (والأرنب والعقعق) هو غراب يجمع بين أكل جيف وحب ولا شك أن غراب ديارنا غير العقعق وغير غراب الزرع فيكون داخلا فى الغراب المذكور فى الحديث فيكون فاسقا وحراما كسائر نظائره.

'কৃষি খামারের কাক যা শস্যদানা আহার করে থাকে তা খাওয়া জায়েজ।

খরগোশ ও আকআক খাওয়া জায়েজ আছে। আর আকআক হলো এমন কাক যা মৃত জন্তু এবং শস্যদানা খাওয়ার মধ্যে মিশ্রণ ঘটায়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশের কাকসমূহ আকআক নয় এবং ক্ষেত-খামারের কাকও নয়। সুতরাং এসব কাক হাদিসে উল্লিখিত কাকের মধ্যে গণ্য হবে এবং সেগুলো অনিষ্টকর ও হারাম বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় সকল কাকের বিধানের মতো এগুলোর বিধানও এমনই হবে।'

অনেক বিজ্ঞজন দেশীয় কাককে হালাল মনে করেন। তারা তাদের এই দাবির স্বপক্ষে ফকিহগণের নিম্নোক্ত ভাষ্যকে দলিল হিসেবে পেশ করেন—

نوع يأكل الحب مرة والأخرى جيفة غير مكروه عند الإمام الأعظم فإنه يتوهم منه فى بادى الرأى أن الغراب المعروف فى ديارنا غير مكروه عند الإمام لأنه يخلط بين الحب والنجاسة نقول أن الفقهاء الكرام حصروا هذا النوع فى العقعق قال فى العناية شرح الهداية وأما الغراب الأسود والأبقع فهو أنواع ثلاثة : نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه ، ونوع منه لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع الذي يأكل الجيف وأنه مكروه ، ونوع يخلط بأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب وهو غير مكروه عند أبي حنيفة مكروه عند أبي يوسف وفى الحاشية السعدية للجلبي أقول قال الزيلعى ونوع يخلط بينهما وهو يوكل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وهو العقعق كما فى المنح وسيأتى وفى حاشية شرح الوقاية بين الحب والجيف وهو حلال عند عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وهو العقعق الذى يقال له بالفارسية عكه وفى تكملة البحر العلامة الطرطوسى فى شرح قوله : والغراب ثلاثة أنواع إلى قوله ونوع يخلط بينهما وهو أيضا يؤكل عند الإمام وهو العقعق.

'কাকের এমন একটি প্রকার রয়েছে যা কোনো কোনো সময় শস্যদানা আহার করে আবার কোনো কোনো সময় মৃত জন্তু ভক্ষণ করে। এ প্রকারের কাক খাওয়া ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর মত অনুযায়ী মাকরুহ নয়। এর মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে, আমাদের দেশে কাক বলে যে পাখি পরিচিত রয়েছে সেগুলো ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী খাওয়া মাকরুহ নয়। কেননা, এসব কাক শস্যদানা এবং নাপাকি

উভয়টিই খায়। আমরা বলি ফকিহগণ এ প্রকার কাককে আকআক নামক কাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। আল হিদায়া কিতাবের ভাষ্যগ্রন্থ আল ইনায়ার গ্রন্থকার বলেছেন—সাদা-কালো মিশ্রিত ধূসর রঙ্গের কাক এবং কালো কাক তিন ধরনের হয়ে থাকে।

এক. শস্যদানা কুড়িয়ে খায় কিন্তু মৃত জন্তু ভক্ষণ করে না। এটি খাওয়া মাকরুহ নয়। আরেক প্রকার রয়েছে যা কেবল মৃত জন্তু ভক্ষণ করে। এটি খাওয়া মাকরুহ।

দুই. অন্য আরেকটি প্রকার রয়েছে যা কখনো শস্যদানা খায় আবার কখনো মৃত জন্তু আহার করে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এটি খাওয়া মাকরুহ নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী এটি খাওয়া মাকরুহ। আর জালাবি রচিত হাশিয়ায়ে সাদিয়ায় এসেছে, আমার জানামতে ইমাম জাইলাই রহ. বলেছেন—

তিন. এক প্রকার কাক রয়েছে যা মৃত জন্তুও খায় আবার শস্যদানাও আহার করে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত অনুযায়ী এটি খাওয়া জায়েজ। একেই আকআক বলা হয়। আল মিনাহ গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে। এর আরও বিশদ বিবরণ সামনে আসবে।

চার.শরহু বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াতে আছে—এক প্রকার কাক এমন যে, তা শস্যদানা এবং মৃত জন্তু খায়। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এটি খাওয়া হালাল। এটিই হলো 'আকআক' নামক কাক যাকে ফার্সি ভাষায় আক্কাহ বলা হয়। তাকমিলাতুল বাহর নামক গ্রন্থে আল্লামা তারতুসি রহ. এ কথার (والغراب ثلاثة أنواع إلى قوله ونوع يخلط بينهما) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—এ প্রজাতির কাকও ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর মতে খাওয়া জায়েজ। এ প্রজাতির কাককে আকআক বলে অভিহিত করা হয়।'

সুতরাং উল্লিখিত উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো, ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর মত অনুযায়ী ওই কাক ভক্ষণ করা জায়েজ আছে যা মৃত জন্তু ও শস্যদানা উভয় প্রকারের আহার গ্রহণ করে থাকে। এটি হলো আকআক কাক। এটি কষ্টদায়ক নয়। আর যে প্রকার কাকের কথা আল হিদায়া এবং মিসকিন গ্রন্থে এসেছে, তা মৃত জন্তু ও শস্যদানা ভক্ষণ করে থাকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেটি কষ্টদায়ক। সুতরাং তা ভক্ষণ করা হারাম। অতএব, যেসব কাক শস্যদানা ও মৃত জন্তু আহার

করে সেগুলো দুই প্রকার। এক প্রকার কষ্টদায়ক নয়। একে ভক্ষণ করা হালাল। আর এটি হলো আকআক। আরেক প্রকার কাক এমন রয়েছে যা কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে তাকে ভক্ষণ করা হালাল নয়।

সহিহ বুখারির ভাষ্যগ্রন্থ তাইসিরুল বারিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অনিষ্টকর কাকের প্রতীক হলো সেটি জন্তুর ক্ষত পৃষ্ঠে ঠোকর দিয়ে থাকে এবং উটের চক্ষু উৎপাটিত করে ফেলে। আর সিন্ধি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—کانو کرکی کده کنی 'কাক যখন আওয়াজ দেয় তখন পালক-বিশিষ্ট প্রাণীগুলো ভীত-কম্পিত ও শিহরিত হয়ে ওঠে।' এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে থাকা কাকের ওপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কেননা, মন্দ গুণাবলির ক্ষেত্রে এটি একটি স্পষ্ট বিশেষণ।

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে এসেছে—

> ولا شيئ لقتل غراب إلا العقعق لأن الغراب دائما تقع على دبر الدابة كما في غاية البيان.
>
> 'কাক হত্যা করলে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। তবে আকআকের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, কাক সবসময় চতুষ্পদ জন্তুর মলদ্বারে পতিত হয়ে আহার করতে থাকে। যেমনটি গয়াতুল বয়ান গ্রন্থে এসেছে।'

আলোচ্য উদ্ধৃতি এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমাদের দেশে যেসব কাক রয়েছে সেগুলো পীড়াদায়ক। এগুলো চতুষ্পদ জন্তুর ওপর অকারণে আক্রমণ করে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মলদ্বারে আহার করার জন্য বসে। তাছাড়া উটের চক্ষু উৎপাটন করাও তাদের অভ্যাস। অবশ্য আকআক প্রজাতির কাক এর ব্যতিক্রম। সিন্ধি ভাষায় আকআক কাককে (متاه) মাতাহ বলা হয়। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

লিপিকার

—ফকির আবদুল হাকিম

সদর মুদাররিস : মাদরাসা আশরাফিয়া, শিকারপুর।

উল্লিখিত ফতোয়াটি যারা সত্যায়ন করেছেন

১. মুহাম্মাদ ফজলুল্লাহ,
   মুহতামিম : মাদরাসা আশরাফিয়া, শিকারপুর।

২. আবদুল কাদের, সানি মুদাররিস,

৩. আল ফকির আবদুল ফাত্তাহ,
৪. মৌলবি আবদুল হক,
৫. মৌলবি গোলাম মোস্তফা,
৬. মৌলবি আবদুল মালিক,
৭. মৌলবি তাজ মুহাম্মাদ,
৮. মৌলবি মুজাফফর দীন,
৯. মৌলবি আজিজুল্লাহ,
১০. আল ফকির মুহাম্মাদ আজিম,
১১. আবদুল হাই জাতুই,
১২. আবদুল করিম চিশতি,
১৩. মুহাম্মাদ আরিফ শিমুভি,
১৪. উমেদ আলি, (জেকব আবাদ),
১৫. মুহাম্মাদ ইসমাইল আওদাদি, (শিকারপুরি),
১৬. আবদুল আজিজ বান্দুভি,
১৭. আবদুল গনি,
১৮. হামিদুল্লাহ বেলুচিস্তানি আজমিরি,
১৯. আতাউল্লাহ ইনকিলাবি,
২০. মৌলবি মুজাফফরুদ্দিন, (মাদরাসা হাশিমিয়্যাহ),
২১. আবদুল আজিজ জাতুই।

উল্লিখিত মাসআলার প্রমাণে আরও কিছু উদ্ধৃতি

ফতোওয়ায়ে আলমগিরি-এর উর্দু সংস্করণের ৪৪০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, যেসব পাখি নাপাক এবং মৃত জন্তু খেতে অভ্যস্ত যেমন দেশি কাক; পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ব্যক্তিগণ তাকে অপবিত্র ও কদর্য মনে করে থাকেন। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে :

> عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل الغراب فقال: ومن يأكله بعد ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا يريد به الحديث المعروف خمس فواسق يقتلن فى الحل والحر م وفى الموعد: الأبقع هو الذى فى صدره بياض قال فى المحكم: غراب أبقع يخالط فيه سواد وبياص وهو أخبثها.

'হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কাক ভক্ষণ করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে দুষ্কৃতিকারী বলে নামকরণ করার পর কে তাকে খায়? তিনি এ কথা বলে মূলত ওই প্রসিদ্ধ হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, পাঁচ প্রজাতির প্রাণী দুষ্ট প্রকৃতির। এগুলোকে হারামের সীমানায় এবং এর বাইরে সবখানেই হত্যা করা যাবে। আল মাওইদ গ্রন্থে আছে, আবকা এমন প্রাণীকে বলা হয়, যার বুকে শুভ্রতা রয়েছে। আল মুহকাম গ্রন্থের রচয়িতা বলেন—আবকা এমন এক প্রাণীর নাম, যার রঙ সাদা-কালো মিশ্রিত হয়ে থাকে। আর এটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির কাক।'

আল হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়া এর উদ্ধৃতি টেনে রদ্দুল মুহতার রচয়িতা বলেন—

نوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذى سماه المصنف الأبقع وإنه مكروه.

'এমন এক প্রকার কাক রয়েছে যা কেবল মৃত জন্তুই আহার করে। একেই লেখক الأبقع বলে অভিহিত করেছেন। এটি ভক্ষণ করা মাকরুহ।'

প্রকৃত সত্য কথা হলো কাকের একটি প্রকারকে الأبقع বলে অভিহিত করা হয় যা মৃত জন্তু ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করে না। ইনায়াহ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই প্রকারের কাক। কিন্তু হাদিস শরিফে আবকা দ্বারা ওই প্রকার কাক উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে যা শস্যদানা ও মৃত জন্তু খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আহার করে থাকে।

تبيين الحقائق والمراد بالأبقع ما يأكل الجيف ويخلط كذا في الهداية كما.

'তাবয়িনুল হাকায়েক গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কাক যা মরাজন্তু ভক্ষণ করে থাকে। আল হিদায়া গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ রয়েছে।'

মুফতি তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর জবাব

বিজ্ঞ জবাব দানকারী দেশীয় কাক হারাম হওয়ার ব্যাপারে যেসব প্রমাণ পেশ করেছেন, সেগুলোর সারমর্ম হলো ফকিহগণ কাকের যে এক প্রকার বর্ণনা

করেছেন, যা পবিত্র ও অপবিত্র উভয় প্রকার বস্তু আহার করে থাকে। এ প্রজাতির কাকও দুই ধরনের। এক. আকআক যা পীড়াদায়ক নয়। দুই. এমন কাক যা পবিত্র ও অপবিত্র উভয় প্রকার বস্তু আহার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কষ্টদায়কও। এগুলোর মধ্য থেকে প্রথম প্রকার ভক্ষণ করা হালাল কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ভক্ষণ করা হারাম। আর দেশীয় কাক যেহেতু দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তাই তা ভক্ষণ করা জায়েজ হবে না। বিজ্ঞ জবাব প্রদানকারী কোনো প্রাণী কষ্টদায়ক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে তিনি এই প্রমাণ পেশ করেছেন, যে জায়গায় ফকিহগণ একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, ইহরাম অবস্থায় কাক হত্যা করা জায়েজ আছে এবং হত্যাকারীকে এজন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সেখানে তারা এ কাককে الأبقع বা সাদা-কালো মিশ্রিত ধূসর রঙের কাকের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে থাকেন যা অপবিত্র বস্তু ও ক্ষেতখামারের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত। এরপর তারা আকআক প্রজাতির কাককে এই বিধান থেকে বাদ দেন। তাদের এই বর্ণণাভঙ্গির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী কাক দুই প্রজাতির হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। একে হত্যা করার কারণে মুহরিম ব্যক্তিকে কোনো বিনিময় ও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। দ্বিতীয় প্রকারটি হলো আকআক। এটিও পবিত্র-অপবিত্র উভয় প্রকারের বস্তু আহার করে থাকে কিন্তু যেহেতু এটি কষ্টদায়ক নয় তাই একে হত্যা করার কারণে মুহরিম ব্যক্তির ওপর বিনিময় ও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

কষ্টদায়ক কাক হারাম হওয়ার সমর্থনে বিজ্ঞ জবাবপ্রদানকারী এই প্রমাণ পেশ করেছেন যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. তৎপ্রণীত মুসাওওয়া গ্রন্থে লিখেছেন, সাধারণ বিধান থেকে বের করে হাদিসে যে পাঁচ প্রাণীর ব্যাপারে বলা হয়েছে, এগুলো হত্যা করলে কোনো গুনাহ নেই সেগুলোর সবই হারাম। এগুলোকে খাওয়া জায়েজ নেই। আর ফকিহগণের অভিমতের মাধ্যমে যেহেতু এটি জানা গিয়েছে যে, এসব প্রাণীর মধ্যে সেই কষ্টদায়ক প্রাণীও অন্তর্ভুক্ত যা পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই আহার করে তাই মুসাওওয়া গ্রন্থের এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ প্রকার কাক হারাম হওয়াও আমরা জানতে পেরেছি। সংক্ষিপ্তভাবে তার উত্থাপিত প্রমাণগুলো তিনটি ভূমিকার ওপর ভিত্তিশীল—

১. পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু আহার করে এমন কাক দুই প্রজাতির হয়ে থাকে। প্রথমত, ওই কাক যা কষ্টদায়ক আর দ্বিতীয়ত, আকআক নামক কাক যা কষ্ট ও পীড়াদায়ক নয়।

২. কষ্টদায়ক কাক হত্যা করার কারণে মুহরিম ব্যক্তির ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে যে কাক পীড়াদায়ক নয় তাকে হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

৩. মুসাওওয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে জানা যায়, যে পাঁচ প্রকার অনিষ্টকর প্রাণীকে হত্যা করার কারণে মুহরিম ব্যক্তির ওপর বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না সেগুলোকে ভক্ষণ করা হারাম।

জবাব প্রদানকারীর প্রমাণপেশ বিশুদ্ধ হওয়া বা না হওয়া যেহেতু ভূমিকার ওপর ভিত্তিশীল, তাই আমরা প্রথমে প্রতিটি ভূমিকার ওপর পর্যালোচনা করবো।

প্রথম ভূমিকা

এই তিনটি ভূমিকার মধ্য থেকে প্রথমটি একেবারেই সঠিক নয়। কেননা, আকআক নামক কাকও কখনো কখনো কষ্ট ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। আল হিদায়া গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে এমনটিই বুঝা যায়।

> والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى أما العقعق فغير مستثنى لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى.
>
> 'কাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই কাক যা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে এবং হালাল-হারাম উভয় খায়। কেননা, এটি কষ্টদায়ক বস্তুর মাধ্যমে সূচনা করে থাকে। আর আকআক এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, একে কাক বলা হয় না। এটি পীড়া দিয়ে সূচনাও করে না।'

এই আলোচনার অধীনে আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রহ. লেখেন—

> وقيل فعلى هذا يكون في قوله : في العقعق ولا يبتدئ بالأذى لأنه يقع على دبر الدابة.
>
> 'একটি অভিমত রয়েছে যে, আলহিদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী বলা যায় যে, আকআক নামক কাক কষ্টদায়ক বিষয়ের অবতারণা করে না। কেননা, তা চতুষ্পদ জন্তুর মলদ্বারে পতিত হয়ে আহার করে থাকে।'

আর মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. বলেছেন—

إنه دائما يقع على دبر الدابة.

'এ প্রজাতির কাক সবসময় চতুষ্পদ জন্তুর মলদ্বারে পতিত হয়ে থাকে।'

অনুরূপভাবে আল্লামা জয়নুদ্দিন ইবনু নুজাইম রহ.-ও হিদায়ার এই উদ্ধৃতির ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে লেখেন—

فيه نظر لأنه يقع دائما على دبر الدابة كما في غاية البيان والبحر الرائق.

'তার উল্লিখিত এই কথায় প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটি সবসময় চতুষ্পদ জন্তুর মলদ্বারে পতিত হয়ে আহার গ্রহণ করে থাকে। যেমনটি গায়াতুল বয়ান এবং আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থেও রয়েছে।'

আল্লামা শামি রহ. বাহরুর রায়েকের টীকায় এবং রদ্দুল মুহতারে বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারের এই আপত্তিকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন—

أشار في المعراج إلى دفع ما في غاية البيان بأنه لا يفعل ذلك غالبا.

'আল মিরাজ গ্রন্থকার তাতে গায়াতুল বয়ানে যা আছে তা প্রত্যাখ্যান করে ইশারা করেছেন যে, অধিকাংশ সময়েই এটি এহেন কাজ (মলদ্বারে পতিত হয়ে আহার) করে না।' কিন্তু এর মাধ্যমেও আকআক নামক প্রাণী কষ্টদায়ক না হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, আল মিরাজ গ্রন্থকার 'অধিকাংশ সময়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, এটিও কখনো কখনো পীড়া দিয়ে থাকে। তাছাড়া কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আল্লামা শামি রহ. লেখেন—

ثم رأيته في الظهيرية قال وفي العقعق روايتان والظاهر إنه من الصيود وبه ظهر أن مافي الهداية هو ظاهر الرواية.

'এরপর আমি আজ্জাহিরিয়্যাহ গ্রন্থে দেখেছি তার গ্রন্থকার বলেছেন—আকআকের ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তবে স্পষ্টত এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এটি এমন প্রাণী যাকে লোকজন শিকার করে থাকে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো আল হিদায়াতে যা রয়েছে তা জাহিরুর রিওয়ায়াহর বর্ণনা।'[২৩৪]

শায়খ উসমানি রহ.-ও ফাতহুল মুলহিমে আজজাহিরিয়্যাহ গ্রন্থের এই উক্তি

---

[২৩৪] আল বাহরুর রায়েক সংযুক্ত আল মিনাহ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬।

বর্ণনা করেছেন। তার বিবরণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, একটি অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতে আকআকের ব্যাপারে এ কথাও রয়েছে যে, তাকে হত্যা করার কারণে মুহরিম ব্যক্তিকে কোনো বিনিময় প্রদান করতে হবে না। স্পষ্ট যে, এই রেওয়ায়েতের ভিত্তি এটিই যে, আকআক পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। কেননা, হানাফি ইমামগণের মতে পাঁচপ্রকার অনিষ্টকর প্রাণীকে হত্যা করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার সমন্বিত কারণ হলো কষ্ট ও পীড়াপ্রদান। আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে [২৩৫]এমনটিই উল্লেখ করেছেন। অচিরেই তার স্পষ্ট বিবরণ আমরা তুলে ধরবো।

সুতরাং এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেলো, আকআকও কোনো এক পর্যায়ে কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। যদি আপনার কথা অনুযায়ী কষ্টদায়ক কাক ভক্ষণ করা হারাম হয়ে থাকে তাহলে আকআকও হারাম হওয়া উচিত।

মোটকথা, প্রথম ভূমিকাটি সাধারণভাবেই সহিহ নয়। বরং এ ক্ষেত্রে কতিপয় আলেমের ভিন্নমত রয়েছে। আর যারা একে পীড়াদায়ক বলেন না তারাও কোনো কোনো সময় এটি পীড়া দিয়ে থাকে বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন।

দ্বিতীয় ভূমিকা

এই ভূমিকা অগ্রগণ্য অভিমত অনুযায়ী সহিহ। যদিও আল্লামা ইবনু নুজাইম এ ব্যাপারে সকল ফকিহের বিপরীত মত পোষণ করেন। আর এরই ধারাবাহিকতায় তিনি লিখেছেন—

إذا أطلق في الغراب فشمل الغراب بأنواعه الثلاثة.

> 'যেহেতু হাদিসে কেবল কাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাই তিন প্রকার কাকই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।'

কিন্তু এ অভিমতটিকে আননাহরুল ফায়েক গ্রন্থকার, আল্লামা হাসকাফি, আল্লামা শামি এবং মাওলানা উসমানি রহ. প্রত্যাখান করেছেন।[২৩৬]

---

[২৩৫] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭০।

[২৩৬] ফাতাওয়া শামি ২-৩০, মাতহুল মুলহিম ৩-২৩১।

তৃতীয় ভূমিকা

এই ভূমিকা কোনো অবস্থায়ই বিশুদ্ধ নয়। এটি বিশুদ্ধ না হওয়ার বিষয়টি মুসাওওয়া-এর মূল উদ্ধৃতি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিতাপের ও বিস্ময়কর যে, বিজ্ঞ জবাব প্রদানকারী মুসাওওয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এমন অপরাধমূলক কাটাছেঁড়ার অবতারণা করেছেন যা আলেমগণের মর্যাদার পরিপন্থি। আমরা বিষয়টির ব্যাপারে একটি সরল ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্তু কৃতকার্য হইনি। আসুন আমরা মুসাওওয়া-এর মূল উদ্ধৃতির প্রতি একটু লক্ষ করি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে—

قال البغوى اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة فى الخبر ولا شيئ عليه فى قتلها وقال الشافعى رحمه الله تعالى عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه فقال لا فدية على من قتلها فى الإحرام والحرم لأن الحديث يشتمل على أعيان بعضها سباع وبعضها هوام وبعضها لا يدخل فى معنى السباع ولا هى من جملة الهوام وإنما هو حيوان مستخبث اللحم وتحريم الأكل يجمع الكل فاعتبروه وقالت الحنفية لا جزاء بقتل ما ورد فى الحديث وقاسوا عليه الذئب وقالوا فى غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع مالا يؤكل لحمه عليه الجزاء بقتلها الا أن يبتديه شيئ فيدفعه عن نفسه فيقتله فلا شيئ عليه وفى البحر معنى الفسق فيهن خبثهن كثرة الغرر فيهن.

'আল্লামা বাগাভি রহ. বলেন—আলেমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, হজ কিংবা ওমরায় গমনকারী মুহরিম ব্যক্তির জন্য সেসব প্রাণী হত্যা করা জায়েজ আছে যেগুলোকে হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন—এগুলোর ওপর ভিত্তি করে যেসব জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা বৈধ নয় সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই তিনি বলেছেন—ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হারামের সীমানায় থাকাকালে যদি এগুলোকে হত্যা করা হয়, তাহলে মুহরিম ব্যক্তিকে এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, আলোচ্য হাদিসটি এমন কতিপয় প্রাণীকে শামিল করে যেগুলোর কোনো কোনোটি চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর অন্তর্ভুক্ত। আবার কোনো কোনোটি কীট-পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর কোনোটি এমনও আছে যেগুলো

চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুরও অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার কীট-পতঙ্গও নয়। বরং এগুলো নাপাক গোশত বিশিষ্ট প্রাণী। আর এগুলোর সবগুলোকেই ভক্ষণ করা হারাম। হানাফি আলেমগণ বলেন—হাদিসের মধ্যে যে কয়টি প্রাণীর কথা এসেছে সেগুলোকে হত্যা করার কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। তারা নেকড়ে বাঘকেও এসব প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। আর অন্যান্য প্রাণী তথা বাঘ, চিতা বাঘ, শুকর এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে বলেছেন—যদি এগুলোকে হত্যা করা হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এই প্রাণীসমূহের কোনো একটি যদি তার দিকে তেড়ে আসে এবং আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি এগুলোকে হত্যা করে, তাহলে এর জন্য কোনো কিছু বিনিময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থে আছে, এসব প্রাণীর মধ্যে ফিসক বা অপবিত্রতা থাকার অর্থ হলো সেগুলোর মধ্যে অধিক পরিমাণে নোংরামি ও কদর্যতা থাকা।'

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি বিজ্ঞ জবাবপ্রদানকারী অবিকল উল্লেখ করেননি। তার উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে মনে হয়, এগুলোর সবগুলোকে ভক্ষণ করা হারাম হবার বিধানটি হানাফি আলেমগণ দিয়েছেন। অথচ মূল উদ্ধৃতি দেখার মাধ্যমে যে-কোনো সমঝদার ব্যক্তিই এ কথা বুঝতে পারে, এসব কিছু ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী বর্ণনা করা হচ্ছে।

আমরা কোনো ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ওপর আক্রমণ করতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু এরপরও এতটুকু বর্ণনা করে দেওয়া জরুরি মনে করছি যে, সবসময় প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য হলো পরিণাম ও পরিণতির প্রতি লক্ষ রাখা। কিন্তু ফতোয়া দেওয়ার মতো নাজুক বিষয়ের ক্ষেত্রে এ ফরজটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফতোয়ার অন্য একটি স্থানেও সংকীর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে যে, বিজ্ঞ জবাব প্রদানকারী আল বাহরুর রায়েকের উদ্ধৃতি (معنى الفسق فيهن خبثهن وكثرة الغرر فيهن) উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আল হিদায়া গ্রন্থকারের আলোচ্য উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এটি আল বাহরুর রায়েকের উদ্ধৃতি। অথচ এটি এমনই হাস্যকর ও পরিতাপজনক অপপ্রয়াস যে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, খোদ আল বাহরুর রায়েকের পুরো বক্তব্য পাঠ করার দ্বারাও জবাব প্রদানকারীর ধারণার অপনোদন হয়ে যায়। আল

বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার লিখেছেন—

إذا أطلق فى الغراب فشمل الغراب بأنواعه الثلاثة.

'যেহেতু হাদিসে কেবল কাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাই তিন প্রকার কাকই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।' যেমনটি কিছুক্ষণ আগেও অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারের মতে সর্বপ্রকার কাকের বিধান একই। আর এটিও তার কাছে স্বীকৃত যে, আকআকও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। এজন্য যদি হারাম হওয়ার কারণ কষ্টপ্রদানই হতো, তাহলে তার অভিমত অনুযায়ী আকআকও হারাম হয়ে যেতো। অথচ আকআক ভক্ষণ করা হালাল হওয়ার ওপর সকল হানাফি ফকিহ্ ঐকমত্য পোষণ করেছেন (আবু ইউসুফ রহ. ছাড়া)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞ জবাবপ্রদানকারী তাদেরকে নিজের মতাবলম্বী বলে চালিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। سبحانك هذا بهتان عظيم 'এটি তো এক মহা অপবাদ!!' মহান আল্লাহ বলেছেন—

واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.

> 'যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়ানুগ কথা বলবে যদিও তা নিকটাত্মীয়ের বিষয়ে হয়।'

না জানি এই বাণী কাদের জন্য প্রযোজ্য! মোটকথা, মুসাওওয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিজ্ঞ জবাব প্রদানকারী যে প্রমাণ পেশ করেছিলেন তার মাধ্যমে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাব প্রমাণিত হয়েছে। এখন আমরা এ ব্যাপারে হানাফি মাজহাবে কী আছে তা দেখে নেবো। হানাফি মাজহাবের আলেমগণের মতে দুষ্ট প্রকৃতির পাঁচ প্রকার প্রাণীকে হত্যা করার কারণ হলো কষ্টদানের ক্ষেত্রে সূচনা করা; অপবিত্র কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র একসঙ্গে মিলিয়ে ঝুলিয়ে খাওয়া নয়। আর না হালাল-হারামের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে। যেমনটি মুসাওওয়া গ্রন্থের আলোচ্য উদ্ধৃতির শেষাংশের একটি বাক্যের মাধ্যমেও প্রতীয়মান হয়। তাতে রয়েছে—

وقالوا فى غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع مالا يوكل لحمه عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتديه شيئ فيدفعه عن نفسه فيقتله فلا شيئ عليه.

> 'আর অন্যান্য প্রাণী তথা বাঘ, চিতা বাঘ, শুকর এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা বলেছেন—যদি এগুলোকে হত্যা করা হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এই

প্রাণীসমূহের কোনো একটি যদি নিজে থেকে তেড়ে আসে আর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি এগুলোকে হত্যা করে, তাহলে এজন্য কোনো বিনিময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।'

আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, হত্যা করা বৈধ হওয়ার কারণ হলো কষ্টদানের ক্ষেত্রে সূচনা করা। আল্লামা ইবনু রুশদ রহ.-ও হানাফি এবং মালিকি মাজহাবের এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

وأما المسألة الثالثة: وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم وهي الخمس المنصوص عليها: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة، وهو مذهب الشافعي، وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما.

'আর তৃতীয় মাসআলাটি হলো ফকিহগণের সেই মতভেদ যা তারা হারামের মধ্যে থাকা অবস্থায় কোনো প্রাণীকে হত্যা করার ক্ষেত্রে করেছেন। যে পাঁচটি প্রাণীকে হত্যা করা যাবে সেগুলো হলো কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও ঘেউ ঘেউকারী পাগলা কুকুর। ভক্ষণ করা বৈধ এমন চতুষ্পদ জন্তুকে হত্যা করতে নিষেধাজ্ঞা আসা সত্ত্বেও এগুলোকে হত্যা করার আদেশ দানের মাধ্যমে একদল লোক অনুধাবন করেছেন যে, এগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলো খাওয়া হারাম। আর এটিই ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমত। আরেকদল লোক এর মাধ্যমে অনুধাবন করেছেন, হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো এগুলোর মধ্যে আক্রমণ করার অভ্যাস রয়েছে। ভক্ষণ করা হারাম হবার কারণে নয়। এটি ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা ও তাদের অধিকাংশ ছাত্রের অভিমত।

আলোচ্য উদ্ধৃতির মধ্যে স্পষ্টভাবে হানাফিদের মাজহাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, হাদিসের মধ্যে হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়ার বৈধতার কারণ হলো কষ্টদানের ক্ষেত্রে সূচনা করা। এই হাদিসের মাধ্যমে কোনো বিশেষ প্রাণী হারাম হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করা যায় না। এছাড়া সকল ফকিহের উদ্ধৃতির মাধ্যমেও আমরা এটিই জানতে পারি। কেননা, তারা বিশেষ কোনো জানোয়ারকে হত্যা করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কষ্টদানের সূচনাকেই

কারণ সাব্যস্ত করেন। যেমনটি আল হিদায়া, আল বাহরুর রায়েক ও আল ইনায়ার মধ্যে রয়েছে।

যখন এ বিষয়টি সাব্যস্ত হলো তখন সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কাক খাওয়া বৈধ হওয়া বা না হওয়ার মাসআলা কিতাবুল হজে অনুসন্ধান করা সমীচীন নয়। বরং একে অনুসন্ধান করতে হবে কিতাবুজ জাবায়েহ-এর ওই স্থানে যেখানে ফকিহগণ কাকের বিভিন্ন ধরন ও প্রকার নিয়ে আলোচনা করেন। জবাবদানকারীর মৌলিক ভুল এটিই যে, তিনি একটি মাসআলার সঠিক স্থানে না খুঁজে এর সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্য স্থানে এর উদ্ধৃতি অনুসন্ধান করেছেন। অথচ কিতাবুজ জাবায়েহের মধ্যে ফকিহগণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, দেশীয় কাক খাওয়া হালাল।

১. আল্লামা কাসানি রহ.-এর অভিমত

ওলামাগণের সম্রাট আল্লামা কাসানি রহ. লেখেন—

والغراب الذى يأكل الحب والزرع والعقعق ونحوها حلال بالإجماع

'যে কাক শস্যদানা ও ক্ষেত-খামারের ফসল খায়, যেমন : আকআক ও এ জাতীয় অন্যান্য কাক সেগুলোকে খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হালাল।'

২. শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ.-এর অভিমত

শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. তার রচিত 'আল মাবসুত' গ্রন্থে লেখেন—

خَمْسُ فَوَاسِقَ تُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ» وَذَكَرَ الْغُرَابَ مِنْ جُمْلَتِهَا، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ، وَأَمَّا الْغُرَابُ الزَّرْعِيُّ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْحَبَّ فَهُوَ طَيِّبٌ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْبَثٍ طَبْعًا، وَقَدْ يَأْلَفُ الْآدَمِيَّ كَالْحَمَامِ فَهُوَ وَالْعَقْعَقُ سَوَاءٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْعَقْعَقِ، فَإِنْ كَانَ الْغُرَابُ بِحَيْثُ يَخْلِطُ فَيَأْكُلُ الْجِيَفَ تَارَةً وَالْحَبَّ تَارَةً فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . أَنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُوجِبُ لِلْحِلِّ وَالْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ. (وَعَنْ) أَبِي حَنِيفَةَ . رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى قِيَاسِ الدَّجَاجَةِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، وَقَدْ أَكَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَهِيَ قَدْ

تَخْلِطُ أَيْضًا، وَهٰذَا لِأَنَّ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَلَحْمُهُ يَنْبُتُ مِنَ الْحَرَامِ فَيَكُونُ خَبِيثًا عَادَةً، وَهٰذَا لَا يُوجَدُ فِيمَا يَخْلِطُ.

'পাঁচ প্রকার দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণী রয়েছে যেগুলোকে মুহরিম ব্যক্তি হারামের সীমানায় থাকা অবস্থায় বা অন্যত্র থাকাকালে হত্যা করতে পারবে। এই পাঁচ প্রকার প্রাণীর মধ্যে কাকের উল্লেখও রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কাক যা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে। আর যে কাক ক্ষেত-খামারের ফসল খায় বা শস্যদানা কুড়োয় সেগুলো খাওয়া হালাল। কেননা, স্বভাবগতভাবে এগুলো নোংরা নয়। কোনো কোনো সময় এগুলো মানুষের পোষ মেনে থাকে এবং তাদেরকে ভালোবাসে। যেমন : কবুতর। সুতরাং কবুতর এবং আকআক উভয়ই সমান। আর আকআক খেতে কোনো সমস্যা নেই; যদিও সেটি এমন কাক হোক না কেনো, যা কখনো পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু মিলিয়ে মিশিয়ে খায়। আবার কখনো মৃত জন্তু খায় আবার কখনো শস্যদানা কুড়িয়ে খায়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, এ প্রকার কাক খাওয়া মাকরুহ। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন—এ প্রজাতির কাক খেতে কোনো অসুবিধা নেই। আর মোরগের প্রতি লক্ষ করে এ অভিমতটিকেই বিশুদ্ধ বলা যায়। আর মোরগ খেতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ভক্ষণ করেছেন। অথচ তাও কখনো কখনো অপবিত্র বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে পবিত্র বস্তু আহার করে। এ বিধানটি এ কারণে যে, যে প্রাণী মৃত জন্তু খায় তার গোশত হারাম থেকে উৎপন্ন হয়, ফলে স্বভাবগতভাবে তা নোংরা হয়ে থাকে। আর যেসব প্রাণী বৈধ ও অবৈধ সব মিলিয়ে আহার করে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কারণটি প্রায়শই পাওয়া যায় না।'[২৩৭]

৩. ফতোওয়ায়ে আলমগিরির বিবরণ

ফতোওয়ায়ে আলমগিরিতে কাজিখানের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ . رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ . رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . عَنْ الْعَقْعَقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَأْكُلُ النَّجَاسَاتِ،

[২৩৭] মাবসুত সারাখসি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২২৬।

فَقَالَ: إِنَّهُ يَخْلِطُ النَّجَاسَةَ بِشَيْءٍ آخَرَ، ثُمَّ يَأْكُلُ فَكَانَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ مَا يَخْلِطُ كَالدَّجَاجِ لَا بَأْسَ.

'আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—আমি ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জিজ্ঞেস করেছি আকআক খাওয়া বৈধ কি না? তিনি উত্তরে বলেছেন—তা খেতে কোনো সমস্যা নেই। তখন আমি বল্লাম, এটি তো নাপাক বস্তু ভক্ষণ করে থাকে? তিনি তখন উত্তরে বললেন, এটি যদিও নাপাক বস্তু ভক্ষণ করে কিন্তু তাকে সে প্রথমে পবিত্র বস্তুর সঙ্গে মিশায় এরপর ভক্ষণ করে। সুতরাং এ ব্যাপারে তার কাছে মূলনীতি ছিলো, যে প্রাণী মোরগের মতো অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে আহার করে তা খেতে কোনো সমস্যা নেই।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র বস্তুর সঙ্গে অপবিত্র বস্তু মিশিয়ে ভক্ষণ করে এমন প্রতিটি কাক হালাল। আর এই প্রজাতির কাককেই আকআক বলা হয়। রইলো এই প্রশ্ন যে, পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু একসঙ্গে মিশিয়ে আহার করে এমন প্রতিটি কাকের ব্যাপারে ফকিহগণ বৈধতার যে হুকুম দিয়েছেন তা কেবল আকআক কাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। বস্তুত, এর ভিত্তিটি সঠিক নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে এই প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, ফকিহগণ পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত করে খায় এমন কাকের প্রকার বর্ণনা করে একটু সামনে অগ্রসর হয়ে বলে দিয়ে থাকেন, সেটিই আকআক প্রজাতির কাক। এই প্রমাণপেশ বেশ কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। কারণগুলো হলো—

১. وهو العقعق (আর সেটিই আকআক) বাক্যটি মোটেও সীমাবদ্ধ করার জন্য আসেনি। যদি সীমাবদ্ধ করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলে দিতেন যে, এ প্রকারটি আকআকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা, এটি হালাল-হারাম হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা। এ কারণেই সকল ফকিহ এমনটি করেননি যে, তারা শেষাংশে আকআককে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন : ইনায়া, মাবসুত ও বাদায়েউস সানায়ে-এর মধ্যে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জানা গেলো এই বিশেষণটি এখানে ঘটনাচক্রে এসেছে। অন্যগুলো থেকে একে আলাদা করার জন্য আসেনি।

২. এর বিপরীতে মাবসুত, বাদায়েউস সানায়ে এবং ফতোওয়ায়ে আলমগিরির উদ্ধৃতিতে আকআক এবং অন্য কাকের বিশদ পরিচিতি স্পষ্ট নয়। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, প্রতিটি মিশ্র আহার গ্রহণকারী কাকই হালাল—চাই সেটা 'আকআক' হোক বা না হোক।

৩. মূলত 'আকআক' কাক কি না তা নিয়েই ফকিহগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ব্যক্তি একে কাক বলে অভিহিত করেন। আবার কোনো কোনো ব্যক্তি একে কাক বলতে নারাজ। যেমন লুইস মালুফ ইয়াসুই তার প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থে লেখেন—

العقعق طائر على شكل الغراب أو هو الغراب.

'আকআক' কাক প্রজাতির এক ধরনের পাখি বা সেটিই কাক।'[২৩৮]

অনুরূপভাবে আল হিদায়া গ্রন্থের লেখকের মতেও 'আকআক' কাক নয়। তিনি লিখেছেন—

أما العقعق فغير مستثنى لأنه لا يسمى غرابا.

'আর 'আকআক' কাকের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাকে কাক বলা হয় না।'[২৩৯]

আর অন্যান্য ফকিহগণের বিবরণের মাধ্যমে জানা যায়, 'আকআক' কাক। অতএব, যেসব ফকিহ আকআককে কাক বলে মানেন না তারা কাকের প্রকারসমূহ বর্ণনা করে চলে যান কিন্তু আকআক নিয়ে কোনো কথা বলেন না। এ ক্ষেত্রে তারা হয় তো আকআক নিয়ে কোনো কথাই বলেন না কিংবা وكذا العقعق ইত্যাদি বলেন। আর যেসব ফকিহ আকআককে কাকের মধ্যে গণ্য করেছেন তারা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু একসঙ্গে মিশিয়ে যে কাক আহার করে তাকেই আকআক বলে অভিহিত করেছেন। এজন্য এ ব্যাপারে ফকিহগণের বিবরণে কিছুটা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

মোটকথা, আমাদের আলোচনার মাধ্যমে জানা গেলো وهو العقعق বাক্যটি-পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু একসঙ্গে মিশিয়ে যে কাক আহার করে তার মধ্যে আকআককে সীমাবদ্ধ করার জন্য আসেনি।

---

[২৩৮] আলমুনজিদ : ৫৪৪

[২৩৯] আল হিদায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬২।

অতিরিক্ত উদ্ধৃতিসমূহের উত্তর

ফতোয়ার শেষাংশে যে অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে আল্লামা আন্দালুসি রচিত কিতাবুল মুখতাছা থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে আমাদের আলোচনার পর তা আর কোনো গুরুত্ব ও তাৎপর্য রাখে না। চক্ষুষ্মানদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্টও নয়। অবশ্য কয়েকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বিজ্ঞ জবাবপ্রদানকারী যে তাহকিক পেশ করেছেন তা আশ্চর্যকর! তিনি বলেছেন—'আবকা' কাকও দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো যা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর সংমিশ্রণে আহার করে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যা কেবল অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে। কেননা, তাবয়িনুল হাকাইক-এ আছে—

والمراد بالأبقع الذى يأكل الجيف ويخلط كذا فى الهداية.

'আবকা কাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কাক যা মরা জন্তু ভক্ষণ করে এবং পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু আহার করে। এমনটিই আল হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।' এরপর তিনি এই প্রমাণই পেশ করেছেন যে, আবকা কাক খাওয়া হারাম। কেননা, হাদিসের মধ্যে উল্লিখিত কাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবকা কাক। উরওয়া রহ. বর্ণনা করেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কাক ভক্ষণ করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

ومن يأكله بعد ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে দুষ্কৃতিকারী বলে নামকরণ করার পর কে একে খায়?'

এর উত্তর এই যে, অভিধানে ابقع ওই কাককে বলা হয়, যা সাদা-কালো মিশ্রিত ধূসর রঙের হয়ে থাকে। এজন্য এর প্রয়োগ কাকের তিন প্রকারের মধ্যেই প্রযোজ্য হয়। কেবল শস্যদানা ভক্ষণ করে এমন কাককেও ابقع বলা হয়। আবার যা পবিত্র ও অপবিত্র উভয় প্রকার বস্তু ভক্ষণ করে এবং যা কেবল নাপাকি ভক্ষণ করে তাকেও ابقع বলা হয়। যেমন : আল্লামা শামি রহ. ক্ষেত-খামারের কাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

قال القهستاني : وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغا ، وتمامه في الذخيرة.

'কুহিস্থানি রহ. বলেন—এর দ্বারা এমন কাক উদ্দেশ্য যা কেবল

শস্যদানাই ভক্ষণ করে। চাই সেটা ধূসর রঙের হোক, কিংবা কালো হোক অথবা অন্য কোনো স্বাভাবিক কাক হোক না কেন। এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজজাখিরাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।'[২৪০]

দ্বিতীয়ত, বিষয়টি যদি প্রকৃতই এমন হতো, তাহলে সকল ফকিহ্ই একে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। কেননা, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, কিতাবুজ জাবাইহ্-এর মধ্যে এটি বিশদভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিলো। অথচ ফকিহ্গণ আবকা বা ধূসর রঙের কাককে কেবল নাপাক খায় এমন কাকের সঙ্গে বিশেষিত করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফাতাওয়া আলমগিরির উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে—

هو الغراب الأبقع وهو ما يأكل الجيف.

'ধূসর রঙের কাক হলো ওই আবকা কাক যা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে থাকে।'[২৪১]

বাকি রইলো উরওয়া রা.-এর বিবরণ। এ ব্যাপারে আমরা কেবল এতটুকু আরজ করবো যে, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি রহ. কাকের ব্যাপারে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা তিনি ওই হাদিসটি উল্লেখ করার পরই লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পুরো আলোচনা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

عن هشام بن عروة عن أبيه انه سئل عن أكل الغراب فقال من يأكله بعد ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا يريد به الحديث المعروف خمس يقتلن فى الحرم، والمراد به ما يأكل الجيف أما الغراب الزرعي الذي يلتقط الحب الخ.

'হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কাক ভক্ষণ করা জায়েজ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে দুষ্কৃতিকারী বলে নামকরণ করার পর কে একে খায়? তিনি এ কথা বলে মূলত ওই প্রসিদ্ধ হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, পাঁচ প্রজাতির প্রাণী দুষ্ট প্রকৃতির। এগুলোকে হারামের সীমানায় এবং এর বাইরে সবখানেই হত্যা করা যাবে। এর

[২৪০] ফাতাওয়া শামি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

[২৪১] ফতোওয়ায়ে আলমগিরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই কাক যা মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করে। তবে ক্ষেতের কাক—যা শস্যদানা কুড়িয়ে খায়—(তা হত্যা করা যাবে না)।

এজন্য এখন এ ব্যাপারে আর কোনো আলোচনারই অবকাশ রইলো না। অবশ্য ফাতাওয়া আলমগিরির যে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, তা আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে স্পষ্ট হতে পারতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমাদের কাছে ফতোওয়ায়ে আলমগিরির উর্দু সংস্করণ নেই। আমরা আরবি ফতোওয়ায়ে আলমগিরিতে বহু অনুসন্ধান করেও এই অর্থ জ্ঞাপক কোনো আলোচনা পাইনি। বরং এর বিপরীত একটি উদ্ধৃতি আমরা পেয়েছি যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আসল উদ্ধৃতি না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবো না। যেহেতু ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে আমাদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে।

যদি ফতোওয়ায়ে আলমগিরির এই উদ্ধৃতি সঠিক বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও আমরা যতগুলো স্পষ্ট উদ্ধৃতি পেশ করেছি সেগুলোর মোকাবিলায় এর গ্রহণযোগ্য কোনো অবস্থান বাকি থাকে না। যেহেতু এর বিপরীতে খোদ আলমগিরিতেই স্পষ্টভাষ্য রয়েছে।

আলোচনার সারমর্ম

আমাদের আলোচনার সারমর্ম এটিই যে, বিজ্ঞ জবাব প্রদানকারী তার জবাবের সমর্থনে প্রমাণপেশ করার ক্ষেত্রে কিতাবুল হজের বিবরণ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অথচ এটি তার বুনিয়াদি ভুল। কেননা, হারামের ভিতরে কিংবা এর বাইরে হত্যা করা বৈধ হওয়ার কারণ হলো সেগুলো কষ্টদায়ক হওয়া। যেমনটি ইবনু রুশদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। একই বিষয় প্রমাণিত হয়ে থাকে ফিকহের সকল কিতাবের আলোকে। এগুলোকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার কারণ কখনো এটি নয় যে, এগুলো খাওয়া অবৈধ কিংবা এগুলো নাপাকি খায় অথবা এগুলো পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু মিশিয়ে একসঙ্গে আহার করে। পক্ষান্তরে কাক ভক্ষণ করা হালাল হওয়া না হওয়ার কারণ, কেবল সেটি নাপাকি খাওয়া বা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর মিশ্রণ ঘটিয়ে আহার করা। যেমনটি ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়ায় এবং আলমাবসুতে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। এজন্য একটি বিষয়কে অন্যটির

সঙ্গে মিলিয়ে কোনো বিধান আরোপ করা কোনোক্রমেই যথার্থ হতে পারে না।

কাক ভক্ষণ করা হালাল কি হারাম তা জানার জন্য ফিকহের গ্রন্থসমূহের 'কিতাবুজ জাবায়েহ'-এর ওই অংশ অধ্যয়ন করা উচিত যেখানে ফকিহগণ এই মাসআলাটি উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রজাতির কাক ও এগুলোর বিধিবিধান বর্ণনা করেন। তাদের আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু মিলিয়ে আহার গ্রহণকারী প্রতিটি কাকই হালাল, চাই তা কষ্টদায়ক হোক বা না হোক। আর এ সিদ্ধান্তই আমাদের আকাবিরগণ যেমন শায়খ মাওলানা গাংগুহি ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে।

هذا ما بدا لى بعد تحقيق وفوق كل ذى علم عليم.

তাহকিক করার পর আমার কাছে যা সঠিক মনে হয়েছে তাই এখানে উপস্থাপন করলাম। আর এ বিষয়টিও স্বীকৃত যে, প্রতিটি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানের ওপর আরও অধিক প্রজ্ঞাবান রয়েছেন।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি
দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান
৪ রবিউল আওয়াল ১৩৮০ হি.

মাওলানা রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি রহ.-এর অভিমত ও সত্যায়ন

আমি প্রথমেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং মহানবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করছি। হামদ ও সানার পর সমাচার এই যে, আল ইনায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَأَمَّا الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْقَعُ فَهُوَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ : يَلْتَقِطُ الْحَبَّ وَلَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ، وَنَوْعٌ مِنْهُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا الْجِيَفَ وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ الْأَبْقَعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَنَوْعٌ يَخْلِطُ بِأَكْلِ الْحَبِّ مَرَّةً وَالْجِيَفِ أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

'আবকা কাক ও কালো কাক তিন ধরনের হয়ে থাকে—

এক. শস্যদানা কুড়িয়ে খায় কিন্তু মৃত জন্তু ভক্ষণ করে না। এটি খাওয়া মাকরুহ নয়।

দুই. আরেক প্রকার রয়েছে যা কেবল মৃত জন্তু ভক্ষণ করে। এটি খাওয়া মাকরুহ।

তিন. অন্য আরেকটি প্রকার রয়েছে যা কখনো শস্যদানা খায় আবার কখনো মৃত জন্তু আহার করে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এটি খাওয়া মাকরুহ নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী এটি খাওয়া মাকরুহ।'[২৪২]

ونوع منه لا يأكل إلا الجيف এই উদ্ধৃতি এবং এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, কেবল ওই আবকা কাকই হারাম যা কেবল নাপাকি খেয়ে থাকে। তাছাড়া (ونوع يخلط) (যা মিশ্রিত করে কায়) হতে (ولم يذكره في الكتاب) পর্যন্ত বিবরণের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে, পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু মিলিয়ে আহার গ্রহণ করে এমন কাক ভক্ষণ করা হালাল। এর মধ্যে আকআককে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই উদ্ধৃতি কেবল আকআকের ব্যাপারে নিশ্চুপ এমন নয়, বরং আকআক বিশেষিত না হওয়ার প্রবক্তা। কেননা, আকআকের উল্লেখ আল হিদায়া গ্রন্থে এ স্থানেই করা হয়েছে। অতএব, 'একে তিনি কিতাবে উল্লেখ করেননি' বাক্যটি এ কথার স্পষ্ট দলিল যে, যে প্রজাতির কাক পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু মিলিয়ে আহার গ্রহণ করে তার দ্বারা আকআক উদ্দেশ্য নয়। মাবসুত এবং বাদায়েউস সানায়ে এর উদ্ধৃতির মাধ্যমেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আবদুল ওয়াহেদ সিওস্থানি রহ.-ও দেশীয় কাক হালাল হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও প্রতীয়মান হয়।

> السوال: ما حكم خرء الغراب الذى يطير فى الأمصار والقرى ويخلط بين التقاط الحب والعذرات وما حكم سوره؟
>
> প্রশ্ন : জনপদ ও লোকালয়ের উপরে উড়াউড়ি করে এমন কাকের বিষ্ঠার বিধান কী? এ প্রজাতির কাক শস্যদানা ও নাপাক বস্তু উভয়টিই আহার করে থাকে। এ প্রজাতির কাকের ঝুটা পানির বিধান কী?
>
> الجواب: الظاهر أن الغراب الأبقع الذي فيه سواد وبياض وهو مكروه عند الصاحبين وغير مكروه عند الإمام كما فى السراجية والأبقع الأسود

---

[২৪২] ফাতহুল কাদির সংযোজিত আল ইনায়াহ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬২।

ان كان يخلط فيأكل الجيف ويأكل الحب قال أبو حنيفة لا يكره وقال صاحباه يكره انتهى فيكون مأكول اللحم (إلى أن قال) وإن لم يكن لخرئه رائحة كريهة يكون طاهرا لكون خرئه خرء مأكول اللحم من الطيور التى ترزق فى الهواء.

উত্তর : বাহ্যত এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ধূসর রঙের কাক (যাতে সাদা-কালো রঙ থাকে) ভক্ষণ করা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী মাকরূহ। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতানুযায়ী মাকরূহ নয়। যেমনটি সিরাজিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি সাদা-কালো মিশ্রিত ধূসর রঙের 'আবকা' কাক পবিত্র ও অপবিত্র উভয় প্রকার বস্তু খায়, মৃত জন্তুও খায়, শস্যদানাও খায়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত অনুযায়ী তা ভক্ষণ করা মাকরূহ নয়; কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী মাকরূহ। অতএব, এগুলোর গোশত ভক্ষণ করা জায়েজ এবং বৈধ হবে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি আরও বলেন—যদি তার বিষ্ঠার মধ্যে দুর্গন্ধ না থাকে, তাহলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে। কেননা, তার বিষ্ঠা সেসব পাখির বিষ্ঠার মতো হয়ে গেছে যেগুলো খাওয়া যায় এবং আকাশে উড়ে বেড়ায়।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি ছাড়াও নিম্নোক্ত ভাষ্যসমূহের মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো প্রাণী ভক্ষণ করা বৈধ হওয়া না হওয়ার ভিত্তি হলো খাদ্যদ্রব্যের ওপর। আল ইনায়া গ্রন্থে এসেছে—

وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَلَحْمُهُ نَبَتَ مِنْ الْحَرَامِ فَيَكُونُ خَبِيثًا عَادَةً، وَمَا يَأْكُلُ الْحَبَّ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهِ، وَمَا خَلَطَ كَالدَّجَاجِ وَالْعَقْعَقِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَكَلَ الدَّجَاجَةَ وَهِيَ مِمَّا يَخْلِطُ.

'এর মূল কারণ হলো যে প্রাণী মৃত জন্তু আহার করে তার গোশত হারাম থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণে তা স্বভাবগতভাবে নোংরা ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। আর যা শস্যদানা আহার করে থাকে তার মধ্যে এমনটি পাওয়া যায় না। আর যেসব প্রাণী পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু উভয়টিই আহার করে, যেমন : মোরগ ও আকআক ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী তা ভক্ষণ করতে কোনো সমস্যা নেই। আর এটিই

বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোরগ খেয়েছেন। আর মোরগ পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু উভয়টিই আহার করে থাকে।'[২৪৩]

ফতোওয়ায়ে আলমগিরিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

فكان الأصل عنده ان ما يخلط كالدجاج لا بأس.

'এ ব্যাপারে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর মূলনীতি হলো, যে প্রাণী মোরগের মতো পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু উভয়টিই খায়, তা ভক্ষণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।'

পরিশেষে যুগের আবু হানিফা, ফকিহুন্ নফস মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ.-এর ফতোয়াও 'তাজকিরাতুর রাশিদ' থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন—যেহেতু এই ফায়সালা ফিকহের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো প্রাণী ভক্ষণ করা হালাল হওয়া বা না হওয়ার ভিত্তি তার খাদ্যদ্রব্যের ওপর। সুতরাং যে কাক জনবসতিতে পাওয়া যায়, যদি তা আকআক প্রজাতির নাও হয় তাহলেও তা ভক্ষণ করা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, এ প্রজাতির কাকও তার আহারে পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে। এগুলো শস্যদানা, নাপাকি ও ক্ষেত-খামারের ফসল খায়। অতএব, এগুলোও আকআকের মতোই খাওয়া হালাল হবে—চাই তাকে আকআক বলা হোক বা না হোক। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

—রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি,
(উফিয়া আনহু)

উল্লিখিত ফতোয়ার টীকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, যখন বিরুদ্ধবাদীরা আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা সমালোচনা শুরু করে দিলো তখন সত্তর জনেরও অধিক অভিজ্ঞ আলেমের স্বাক্ষর সম্বলিত ফাসলুল খিতাব নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

তাছাড়া জনৈক হাজি ব্যক্তি হারামাইন শরিফাইনের আলেমগণের কাছ থেকে এ প্রকার কাক ভক্ষণ করা বৈধ হওয়ার ওপর একটি ফতোয়া গ্রহণ করেন। ফতোয়াটি হলো—

[২৪৩] ফাতহুল কাদির সংযোজিত আল ইনায়া, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬২।

الحمد لله وحده رب زدني علما الغراب المذكور حلال من غير كراهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأصح وهو المسمى بالعقعق بتصريح فقهائنا رحمهم الله تعالى وأصاب من أفتى بحله وجواز أكله وكيف يلام الحنفي على أكل ما هو حلال عند إمامه من غير كراهة والأصل فى حل الغراب وحرمته الغذاء وكونه ذا مخلب لا بصوره ولونه كما يدل عليه تصريحات فقهائنا فى غالب معتبرات المذهب كما فى البحر الرائق والدر المختار والعناية وغيرها وفيما نصه جامع الرموز إشعار بأنه لو أكل كل من الثلاثة الجيف والحب جميعا حل ولم يكره وقالا يكره والأول أصح فثبت مما صرح به علمائنا أن الغراب بأنواعه سواء كان عقعقا أو غيره إذا كان يجمع بين جيف وحب يجوز أكله عند إمامنا الأعظم والله اعلم

(قاله بفمه وأمر برقمه عبد الله بن عباس بن صديق مفتي مكة المكرمة)

'প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহর জন্য। হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার ইলম ও প্রজ্ঞা বাড়িয়ে দিন। প্রশ্নে উল্লিখিত কাক ভক্ষণ করা বৈধ। ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী তা খাওয়া বিনা মাকরুহে জায়েজ। আর এ মতটিই অধিক সহিহ। ফকিহগণের স্পষ্ট অভিমত অনুযায়ী একেই আকআক নামে অভিহিত করা হয়। আর যে ব্যক্তি এ প্রজাতির কাক ভক্ষণ করা বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন তিনি সঠিক জবাবই দিয়েছেন। আর হানাফি মাজহাবের আলেমগণকে কীভাবেই বা এ ব্যাপারে তিরস্কার করা যাবে, যেহেতু তা ভক্ষণ করা তাদের ইমামের অভিমত অনুযায়ী বিনা মাকরুহে হালাল? কাক ভক্ষণ করা বৈধ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তার খাবার (কি ধরনের) ও সেটি হিংস্র কি না সেটা দেখা। তার আকৃতি ও রঙ দেখে এ বিষয়টি নির্ণিত হয় না। মাজহাবের গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী ফকিহগণের স্পষ্ট বিবরণ এর ওপরই ইঙ্গিত বহন করে। আল বাহরুর রায়েক, আদ্দুররুল মুখতার ও আল ইনায়াসহ অন্যান্য গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ আছে। আর জামিউর রুমুজ গ্রন্থ স্পষ্টভাবে যা উল্লেখ করেছে তাতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি কাকের এই তিন প্রজাতির প্রতিটি মৃত জন্তু ও শস্যদানা উভয়টিই ভক্ষণ করে, তাহলে এগুলো খাওয়া বিনা মাকরুহে হালাল। আর সাহেবাইন বলেন—এ জাতীয় কাক ভক্ষণ করা মাকরুহ হবে। প্রথম অভিমতটি অধিক সহিহ।

সুতরাং আমাদের আলেমগণ যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাকের সমুদয় প্রকার—চাই তা আকআক হোক অথবা অন্যকিছু হোক—যখন তা মরা জন্তু ও শস্যদানা উভয়টিই ভক্ষণ করবে তখন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী তা ভক্ষণ করা হালাল হবে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

এ কথাগুলো মৌখিকভাবে বলেছেন এবং তা লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মক্কা মুকাররমার মুফতি আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ইবনু সিদ্দিক।

এ বিষয়ে মদিনা মুনাওয়ারার আলেমগণেরও একটি ফতোয়া রয়েছে।[২৪৪]

আমাদের এই আলোচনার পর বিষয়টি এতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অস্বীকার করার কোনো অবকাশ আর নেই। এটিও যদি তারা বিশ্বাস না করে, তাহলে এরপর আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?

فقط والله الهادى إلى سبيل الرشاد.

'আলোচনা বহুদূর গড়িয়েছে এবং যথেষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।'

—রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি
দারুল উলুম করাচি, ১৫ রবিউল আওয়াল, ১৩৮০ হি.

মুফতি শফি রহ.-এর সত্যায়ন

لله در المجيب الأول وإرشاد الرشيد الثانى حيث أوضحوا الحق والصواب بحيث لا يبقى منه ريب مرتاب.

'আল্লাহর অনুকম্পা ও কৃপায় প্রথম জবাবপ্রদানকারী কতই না সুন্দর জবাব দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় জবাবদাতার সঠিক দিক-নির্দেশনার আলোকে সত্য এবং সঠিক বিষয়ই উদ্ভাসিত হয়েছে। এর ফলে কোনো সংশয়কারীর সংশয়-সন্দেহের আর কোনো অবকাশ বাকি নেই।'

—বান্দা মুহাম্মাদ শফি
দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান
১৬ রবিউল আওয়াল, ১৩৮০ হি.

[২৪৪] তাজকিরাতুর রাশিদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৮।

অনুবাদক পরিচিতি

তরুণ আলেম, লেখক-অনুবাদক, সম্পাদক ও ছড়াকার আবদুল কাইয়ুম শেখ। জন্মেছেন কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানার অন্তর্গত জাওয়ার ইউনিয়নের ছনাটি গ্রামে।

২০১০ সালে বাইতুল উলুম ঢালকানগর মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। ২০১১/১২ শিক্ষাবছরে মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া হাজিপাড়ায় গবেষণামূলক উচ্চতর ফতোয়া বিভাগে দুই বছরব্যাপী অধ্যয়ন করেন। ২০১৩ সালের আগস্টে কর্মজীবন শুরু করেন জামিয়া দারুল উলুম নুরিয়া মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকায় তাফসির, হাদিস, ইতিহাস এবং আরবি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত এখানেই কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামবাগ মাদরাসায় আধুনিক অর্থনীতি, উচ্চতর ফিকহ ও আরবি সাহিত্যের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

কিশোর বয়স থেকেই তার মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় মাসিক আদর্শ নারীতে। এরপর যথাক্রমে দৈনিক ইনকিলাব, ইত্তেফাক, আলোকিত বাংলাদেশ দৈনিক পত্রিকাসহ নিয়মিত লেখালেখি করেছেন আওয়ার ইসলাম, ইসলাম টাইমস, একুশে জার্নাল অনলাইন পত্রিকায়। মাকতাবাতুল ইসলাম ও অর্পণ প্রকাশনসহ বেশকিছু প্রকাশনীর মৌলিক, অনুবাদকর্ম ও সম্পাদনায় যুক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকেও অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেছেন ১০টি বই ও একটি সংকলন। এরমধ্যে 'ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল হারাম', 'ইসলামী শিষ্টাচার' ও 'বড়দের শৈশব' পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। আমরা প্রতিভাবান এই লেখকের উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।—সাইফুল ইসলাম রিয়াদ আলেম, সংগঠক ও সম্পাদক।

মাকতাবাতুল ইসলাম

ফিকহি মাকালাত দ্বিতীয় খণ্ডে যা আছে

- প্রচলিত মোজার ওপর মাসেহ করার শরয়ি বিধান
- এক রোকন বিলম্বিত করার পরিমাণ কতটুকু যার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?
- রমজানে জামাতের সাথে নফল নামাজ আদায়
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের জাকাত উসুল করার শরয়ি বিধান
- ইসলামে খুলা তালাকের বাস্তবতা
- ভবিষ্যৎ তারিখের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়
- হাউস ফাইন্যান্সিং-এর বৈধ পদ্ধতি
- সুদমুক্ত কাউন্টার-পিএলএস অ্যাকাউন্টের বাস্তবতা
- ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান
- নির্বাচন ও ভোটের শরয়ি অবস্থান
- মামলার শুনানিকাল আইনের শরয়ি অবস্থান
- কাক খাওয়া জায়েজ-নাজায়েজের ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন

মাকতাবাতুল ইসলাম
ISBN 978-984-91049-1-9
www.maktabatul-islam.com